লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

ঈদুল ফিতর সংখ্যা

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

নব পর্যায় ৭৮ বর্ষ | ২৪তম ও ১ম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ৩১ আষাঢ়, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ | ১০ শাওয়াল, ১৪৩৭ হিজরি | ১৫ ওফা, ১৩৯৫ হি. শা. | ১৫ জুলাই, ২০১৬ ঈসাব্দ

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো ‘পরে
Love for All
Hatred for None

‘তোমরা যা ভালোবাস তা থেকে (আল্লাহ্‌র পথে) খরচ না করা পর্যন্ত তোমরা কখনও প্রকৃত পুণ্য অর্জন করতে পারবে না। আর তোমরা যা-ই খরচ কর আল্লাহ্ নিশ্চয় সে বিষয়ে পুরোপুরি অবগত।’

(সূরা ঃ আলে ইমরান : ৯৩)

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন- “যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করে, নিশ্চয় সে আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্য করে। যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করে, নিশ্চয় সে আল্লাহ্ তাআলার অবাধ্যতা করে। যে ব্যক্তি আমার আমীরের আনুগত্য করে, নিশ্চয় সে আমার আনুগত্য করে। যে ব্যক্তি আমার আমীরের অবাধ্যতা করে, নিশ্চয় সে আমার অবাধ্যতা করে।”

(বুখারী, মুসলিম ও মেশকাত)।

“যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের শত শত আদেশের মধ্যে একটি ছোট আদেশকেও লংঘন করে, সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে।”

–হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা **হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)** রচিত **‘আল্ ইস্তিফতা’** পুস্তিকাটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, আলহাদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **মাওলানা ফিরোজ আলম**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি সংগ্রহ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৭১৬-২৫৩২১৬

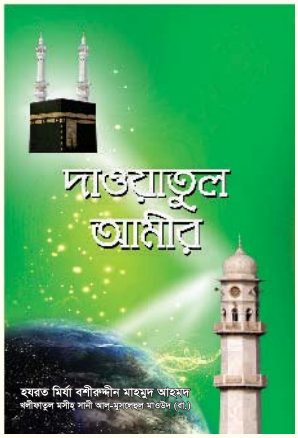

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্-মুসলেহুল মাওউদ (রা.) রচিত **‘দাওয়াতুল আমীর’**-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **মাওলানা ফিরোজ আলম**।

৩১৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত বইটির **মূল্য ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ টাকা)**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৭১৬-২৫৩২১৬

"Love For All, Hatred For None."

Hakim Watertechnology

“Best Water, Best Life”

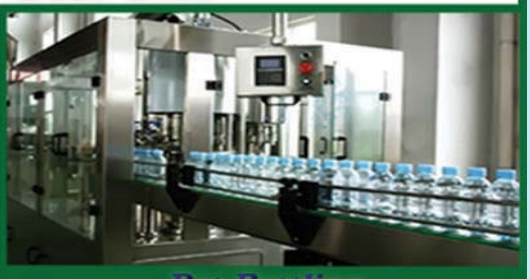

House hold/Official

Commercial/Industrial

Pet Bottling

46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000, Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

সম্পাদকীয়

লাইলাতুল ক্বদর

ঘোর অমানিশা কাটিয়ে সিয়াম সাধনায় খোদা-মিলনে সার্থক হোক মানবজীবন

মহান খোদা তা'লার অশেষ কৃপায় আমরা আরো কতক দিন রোযা প্রতিপালন করে নাযাতের দশকে প্রবেশ করতে যাচ্ছি, ইনশাআল্লাহ্। রমযানের এই শেষ দশকে মহান আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য এক মহাসৌভাগ্যের রাত নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। যার নাম লাইলাতুল ক্বদর। এই সৌভাগ্য রজনীকে পাওয়া বোধ করি মু'মিনের সবচে' বড় পাওয়া। সারা জীবন কঠোর সাধনা, ত্যাগ ও তিতিক্ষার মাধ্যমে শয়তানী প্রবৃত্তিরূপ দানবকে পরাভূত করার পর মু'মিনের নিকট আসে সেই মুহূর্তটি-সেই পাওয়ার মুহূর্তটি যাকে আল্ কুরআনে বলা হয়েছে 'লাইলাতুল ক্বদর' যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম এক মুহূর্ত।

সুতরাং এ রাতটি আমাদের জন্য সারা জীবনের সাধনার ফল লাভের মুহূর্ত যা আমাদের গোটা জীবনের চাইতেও ক্বদরের তথা কল্যাণের ও মর্যাদার। লাইলাতুল ক্বদর বলতে সাধারণভাবে একটা রাতকে মনে করা হয়। ভৌগলিক কারণে সারা দুনিয়ায় যেহেতু একই সময়ে রাত্রি বিরাজ করে না সেজন্যে লাইলাতুল ক্বদর আমাদের গণনার এমন একটি সময়, যা মু'মিনের ব্যক্তিগত জীবন বা জাতীয় তথা মিল্লাতী জীবনে রাতের ন্যায় কাজ করে। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এ মুহূর্তটি অবশ্যই মু'মিনের জীবনে আসে রমযানের কঠোর সাধনার শেষ দশকে। রোযার সাধনা দ্বারা মু'মিন খানা-পিনা ত্যাগ করে, নিদ্রাকে কম করে দিয়ে এবং নিজের স্থূল চাহিদাকে সাময়িকভাবে হলেও অস্বীকার করে সে আল্লাহ্‌র রঙ্গে রঙ্গীন হয়। তাই আল্লাহ্‌র সাথে বাক্যালাপ করার সৌভাগ্য লাভ হয় তার, যার ইঙ্গিত আমরা কুরআন মজিদের সূরা বাকারার ১৮৬ আয়াতে পেয়ে থাকি। সুতরাং সেই মুহূর্তটি প্রত্যেক মু'মিনের জীবনের জন্য অতি কদরের-অতি কাঙ্খিত।

হযরত রাসূল করীম (সা.) এ মুহূর্তটি লাভে উৎসাহিত করে তাঁর উম্মতকে এটা অনুসন্ধানের জন্য বিভিন্ন সময়-কালের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন বলেছেন–এটা রমযান মাসে, রমযানের শেষ দশকের বিজোড় রাতে, রমযানের ২৭ তারিখে ইত্যাদি। হাদীস পাঠে জানা যায় হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত-হযরত রাসূল করীম (সা.) কদরের রাত্রি সম্বন্ধে বলেছেন 'রমযান মাসের শেষের দশ রাত্রিসমূহে লাইলাতুল ক্বদরের অনুসন্ধান কর' (বুখারী)। তিনি (সা.) আরো বলেছেন 'তোমাদের কাছে রমযান এসেছে। রমযান মুবারাক মাস। এর রোযা আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি ফরজ করেছেন। এ মাসে বেহেশ্‌তের দ্বার সমূহ উন্মুক্ত করা হয়েছে আর দোযখের দ্বারসমূহ বন্ধ করা হয়েছে এবং দুষ্কৃতকারী শয়তানকে শৃঙ্খল পরানো হয়েছে। এ মাসে এমন একটি রাত্রি রয়েছে যা হাজার মাস থেকে উত্তম। যে এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত, সে সকল প্রকার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত' (বুখারী)। সেই শুভ মুহূর্তটি পাওয়ার জন্য আমরা যেন আজীবন চেষ্টা করি, কেননা নিষ্ঠাবান সাধনাকারীকে তিনি আল্লাহ্, কখনও নিরাশ করেন না।

রমযানের শেষ দশক নাজাত বা মুক্তির দশক আর এতে দোয়া কবুলিয়তের বিশেষ মুহূর্ত সৃষ্টি হয়। এই শেষ দশকে ই'তিকাফকারীরা কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করার উদ্দেশ্যে এবং তাঁরই ভালবাসায় আত্মমগ্ন হয়ে ই'তিকাফে বসেন আর এই দশদিন গভীর ভাবে দোয়াতে রত থাকেন।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত একটি হাদীস হচ্ছে, যখন রমযান শেষ দশকে প্রবেশ করতো বা শেষ দশক শুরু হতো, তখন হযরত রাসূল করীম (সা.) কোমর বেঁধে তাতে আত্মনিয়োগ করতেন, তাঁর রাতগুলোকে জীবিত করতেন এবং তাঁর পরিবার-পরিজনকেও ইবাদতের জন্য জাগাতেন। পরিবার-পরিজনকে জাগানো তো হযরত রাসূল করীম (সা.) এর সব সময়ের সাধারণ রীতি ছিল এবং তাঁর রাত্রিগুলোও ইবাদতে জীবিত-ই থাকতো, তবে রমযানে তা এক বিশেষ মাত্রায় উন্নীত হতো।

অতএব, রমযানের এই শেষ দশকে, সিয়াম সাধনায় অধিকতর চেষ্টা-প্রয়াস এবং অধিকতর মনোনিবেশ করা আবশ্যক। যারা আগে থেকে তাহাজ্জুদগুজার রয়েছেন তাদের স্মরণ রাখা উচিত, এই দশ রাতের তাহাজ্জুদের মধ্যে নতুন কোন বৈশিষ্টের সৃষ্টি হওয়া চাই, যা আমাদের পূর্বে আদায়কৃত তাহাজ্জুদের স্বাদে ভিন্নমাত্রা যোগ করবে।

রমযানের এই শেষ দশকে আমরা অবশ্যই বেশী বেশী ইবাদত-বন্দেগিতে রত থেকে, আমাদের দোষ-ত্রুটির ক্ষমা চেয়ে আল্লাহ্‌র নৈকট্য যাচনা করব। এই দশকে যেহেতু এমন একটি রাত পাওয়ার সৌভাগ্য রয়েছে যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম তাই আমাদের সবাইকে সেই মহামহিমান্বিত রাতকে পাওয়ার জন্য কঠোর সাধনায় ব্রতী থাকতে হবে।

মহান খোদা তা'লা আমাদেরকে লাইলাতুল ক্বদরের বরকত লাভ করার সৌভাগ্য দান করুন, সেই সাথে সকলকে জানাই আগত পবিত্র ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা–

ঈদ মুবারাক

সূচিপত্র

৩০ জুন ও ১৫ জুলাই, ২০১৬

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

'বারাহীনে আহমদীয়া' ৬
হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১১
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
১৯শে জুলাই, ২০১৫ তারিখে প্রদত্ত **ঈদুল ফিতরের খুতবা**

ইযালা-এ-আওহাম (সন্দেহ-সংশয় নিরসন) প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১ ১৭
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২১
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
৩ জুন, ২০১৬ তারিখের **জুমুআর খুতবা**

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ৩১
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখের **জুমুআর খুতবা**

বয়আতের শর্তসমূহ এবং একজন আহমদীর দায়িত্ব ও কর্তব্য ৩৯
হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)

যাকাত ও আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় ৪৩
অনুবাদ– মরহুম মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

ই'তিকাফ নিজেকে উৎসর্গ করতে এক নির্জনবাস মু'মিন আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে হয় ধন্য মমত্ববোধের চেতনায় হয় উজ্জীবিত ৪৭
মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্

কলমের জিহাদ ৫০
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

ইসলামে যাকাত প্রদানের গুরুত্ব ৫৩
মাহমুদ আহমদ সুমন

সূরা ফাতিহার ফযীলত প্রত্যেক প্রকারের রোগ আরোগ্য দানকারী সূরা ফতিহা ৫৬
মওলানা সৈয়্যদ মোজাফফর আহমদ

পবিত্র এ রমযানে মুছে যাক সমস্ত পাপ ৫৯
মৌ. মোজাফ্‌ফর আহমদ রাজু

এ কেমন ঈদ? ৬২
মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী (কৃষিবিদ)

মহান স্রষ্টাকে লাভ করাই আসল ঈদ ৬৪
মৌ. এনামুল হক রনি

হযরত শ্রীকৃষ্ণ (আ.)-এর ধর্ম প্রচার ৬৬
সংকলন: মোহাম্মদ হেলালউদ্দিন প্রধান

পাঠক কলাম– "পবিত্র ঈদুল ফিতরে আমাদের করণীয়" ৭১
আনোয়ারা বেগম, মোহাম্মদ আব্দুস সামাদ, মোহাম্মদ নূরুজ্জামান

সংবাদ ৭৪

একজন একনিষ্ঠ ধর্মসেবকের প্রয়াণ ৮০

দৈনন্দিন জীবনের টুকিটাকী ৮১

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ ৮৩

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হুযূর (আই.)-এর বিশেষ দোয়ার তাহরীক ৮৬

মানব জাতির সুরক্ষায় এক সতর্কবাণী ৮৭

পর্দা সম্পর্কে খলীফাতুল মসীহ্-র দিক নির্দেশনা ৮৮

কুরআন শরীফ

সূরা আল্ বাকারা-২

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ
هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۗ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ
الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا
هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٨٦﴾

১৮৬। রমযান[২০৭ক] সেই মাস যাতে (বা যার সম্পর্কে) কুরআন অবতীর্ণ[২০৭খ] করা হয়েছে। (এ কুরআন) মানবজাতির জন্য[২০৮] এক মহান হেদায়াতরূপে এবং হেদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে (অবতীর্ণ করা হয়েছে) অতএব তোমাদের মাঝে যে এ মাসকে পাবে সে যেন এতে রোযা রাখে। কিন্তু যে অসুস্থ অথবা সফরে থাকে তাকে অন্যান্য দিনে[২০৯] (রোযার এ) সংখ্যাপূর্ণ করতে হবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চান এবং তোমাদের জন্য কাঠিন্য চান না। আর তিনি চান তোমরা যেন (রোযার নির্ধারিত) সংখ্যা পূর্ণ কর। আর তিনি যে তোমাদের হেদায়াত দান করেছেন সেজন্য তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর, যেন তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

২০৭-ক। 'রমযান' চান্দ্রমাসগুলোর নবম মাস। শব্দটি 'রামাযা' ধাতু থেকে উৎপন্ন। 'রামাযাস্ সায়িমু' অর্থ রোযা রাখার দরুন রোযাদারের ভিতরটা তৃষ্ণায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে (লেইন)। মাসটির নামকরণ এ কারণে হয়েছে : (১) রোযার কারণে এ মাসটিতে মানুষের তৃষ্ণা ও ক্ষুধার জ্বালা বৃদ্ধি পায়, (২) এ মাসের ইবাদত-বন্দেগী মানুষের পাপকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নি:শেষ করে দেয়, (আসাকির ও মারদাওয়াই), (৩) এ মাসে মানুষের তপস্যা ও সাধনা তার মনে স্রষ্টার প্রতি ভালবাসার উত্তাপ সৃষ্টি করে এবং মানবের প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক করে। 'রমযান' নামটি ইসলামের অবদান। এ মাসটির পূর্বনাম ছিল 'নাতিক' (কাসীর)।

২০৭-খ। রমযান মাসের ২৪ তারিখে হযরত রাসূল করীম (সা.) প্রথম আল্লাহ্‌র বাণী পেয়েছিলেন (জরীর)। এ রমযান মাসেই জিবরাঈল প্রতি বছরে পূর্বে অবতীর্ণ হওয়া সমস্ত বাণী রাসূল করীম (সা.)-এর কাছে পুনরাবৃত্তি করতেন। এ ব্যবস্থা মহানবী (সা.) এর জীবনের শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তাঁর জীবনের শেষ বছরের রমযান মাসে জিবরাঈল পূর্ণ কুরআনকে মহানবী (সা.) এর কাছে দু'বার পাঠ করে শুনান (বুখারী)। এ হিসাবে বলা যেতে পারে, সমগ্র কুরআনই রমযান মাসে অবতীর্ণ হয়েছে।

২০৮। 'আল কুরআন' শব্দটি 'কারায়া' হতে উৎপন্ন। 'কারায়া' অর্থ সে পাঠ করেছিল, সে বাণী পৌঁছিয়েছিল, সে সংগ্রহ করেছিল। 'কুরআন' অর্থ : (১) পঠনের উপযোগী পুস্তক, যা বার বার পাঠ করা যায়। কুরআন বিশ্বের সর্বাধিক পঠিত পুস্তক (এনসাইক্লো-বৃট.), (২) একটি পুস্তক কিংবা বাণী যা পৃথিবীর সর্বত্র নিয়ে যাওয়া ও পৌঁছানো প্রয়োজন। কুরআনই একমাত্র পুস্তক যার বাণী সারা বিশ্বের জন্য সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত। কেননা যেখানে অন্যান্য অবতীর্ণ ধর্মগ্রন্থাদি স্থান, কাল ও পাত্রে সীমাবদ্ধ, সেখানে কুরআনই একমাত্র অবতীর্ণ ধর্মগ্রন্থ যা সকল দেশ, সকল জাতি ও সকল সময়ের জন্য এসেছে (৩৪ : ২৯), (৩) এমন গ্রন্থ যা সকল সত্যকে ধারণ করে। কুরআনই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যা যাবতীয় জ্ঞানের এক অফুরন্ত ভান্ডার। এতে অন্যান্য অবতীর্ণ গ্রন্থাবলীর শাশ্বত সত্যগুলো তো স্থান লাভ করেছেই, উপরন্তু সকল অবস্থায় সকল মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় অনেক নতুন নতুন শিক্ষা ও সত্য এতে সংযোজিত হয়ে এটা সর্বকালের জন্য পূর্ণতম গ্রন্থে পরিণত হয়েছে (৯৮ : ৪; ১৮ : ৫০)।

২০৯। এ বাক্যটি অপ্রয়োজনীয় পুনরুক্তি নয়। কেননা পূর্ববর্তী আয়াতে মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতির ক্ষেত্র গঠনের জন্য এ বাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছে যাতে রোযা রাখার নির্দেশ তারা সহজে গ্রহণ করতে পারে। এ আয়াতে সেই নির্দেশেরই বাস্তবায়নকে উপলক্ষ্য করে এ বাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে বাক্যটি নির্দেশেরই অঙ্গ-বিশেষ। 'অসুস্থতা' 'সফর' শব্দগুলোকে সংজ্ঞায়িত না করে কুরআন মানুষের সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনা ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে শব্দগুলোর অর্থ করার ভার ছেড়ে দিয়ে বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা দেখিয়েছে।

হাদীস শরীফ

রমযানের শেষ দশকের বিশেষ গুরুত্ব

রমযানের শেষ দশ দিন শুরু হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সারা রাত জাগতেন, নিজের পরিবারবর্গকেও জাগাতেন এবং (আল্লাহ্‌র ইবাদতে) খুব বেশী সাধনা ও পরিশ্রম করতেন।

* হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রমযানের শেষ দশ দিন শুরু হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সারা রাত জাগতেন, নিজের পরিবারবর্গকেও জাগাতেন এবং (আল্লাহ্‌র ইবাদতে) খুব বেশী সাধনা ও পরিশ্রম করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)।

* হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রমযানে (আল্লাহ্‌র ইবাদতের ক্ষেত্রে) এমন প্রচেষ্টা ও সাধনা করতেন যা অন্য কোন মাসে করতেন না। আর শেষ দশ দিনে এমন প্রচেষ্টা ও সাধনা করতেন যা অন্য সময় করতেন না (মুসলিম)।

* হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমি যদি জানতে পারি কোন রাতটি কদরের রাত তাহলে আমি তাতে কি বলবো?

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন ঃ তুমি বলবে **"আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন তুহিব্বুল আফওয়া ফাআ'ফু আন্নি"** (অর্থাৎ –হে আল্লাহ্! তুমি অবশ্য ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা পছন্দ করো, কাজেই আমাকে ক্ষমা করো)। (তিরমিযী)

* হযরত রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের নিকট রমযান এসেছে। রমযান মুবারক মাস। এর রোযা আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি ফরয করেছেন। এ মাসে আকাশের দ্বার সমূহ উন্মুক্ত করা হয়েছে, দোযখের দ্বার সমূহ বন্ধ করা হয়েছে এবং দুষ্কৃতকারী শয়তানকে শিকলে আবদ্ধ করা হয়েছে। এ মাসের একটি রাত্রি যা হাজার মাস থেকে উত্তম। এর কল্যাণ থেকে যে বঞ্চিত, সে সকল প্রকার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত" (বুখারী, আহমদ)।

* হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি কদরের রাত্রে ঈমান সহকারে সওয়াবের আশায় ইবাদত করে, তার পূর্বের গোনাহ্ ক্ষমা করা হয়" (বুখারী)।

* হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রমযান মাসের শেষ দশ দিন মসজিদে ইতেকাফে বসতেন, এবং বলতেন, রমযান মাসের শেষ দশ রাত্রির ভিতর লাইলাতুল কদরের অনুসন্ধান করো" (বুখারী, মুসলিম)।

* হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "রমযানের শেষ দশ রাতের বেজোড় রাতগুলোতে শবে কদরের সন্ধান করো" (বুখারী)।

অনুবাদ ও সংকলন:
আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

প্রত্যেক পুণ্য কর্মের মূল তাক্‌ওয়া

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

জগদ্বাসী তাদের সম্পদ ও বন্ধু-বান্ধবদের উপর খোদাকে প্রধান্য দেয় না, কিন্তু তোমরা তাঁকে প্রাধান্য দাও, যাতে আকাশে তোমরা তাঁর জামা'তভুক্ত বলে গণ্য হতে পার। রহমতের নিদর্শন দেখানো আদিকাল থেকেই খোদা তা'লার রীতি, কিন্তু তোমরা এই রীতির দ্বারা তখনই উপকৃত হতে পারবে, যখন তাঁর এবং তোমাদের মধ্যে কোন দূরত্ব না থাকে এবং তোমাদের সন্তুষ্টি তাঁর সন্তুষ্টি ও তোমাদের ইচ্ছা তাঁর ইচ্ছাতে পরিণত হয় এবং প্রত্যেক সফলতা ও বিফলতার সময় তোমাদের মস্তক তাঁর দ্বারে অবনত থাকবে যেন তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হয়। যদি তোমরা এইরূপ কর, তাহলে সেই খোদা তোমাদের মধ্যে প্রকাশিত হবেন, যিনি দীর্ঘকাল যাবৎ আপন চেহারা লুক্কায়িত রেখেছেন। তোমাদের মধ্যে কি কেউ আছে, যে এই উপদেশ মত কার্য করতে ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্ক্ষী হতে এবং তাঁর 'কাযা' ও 'কদরে' (ফয়সালা ও নিয়তিতে) অসন্তুষ্ট না হতে প্রস্তুত?

কেউ কখনো তাঁর নিকট গ্রহণীয় হবে না, যে পর্যন্ত তোমাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা এক না হয়। বড় হয়ে ছোটকে অবজ্ঞা করবে না, তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে।

অতএব বিপদ দেখলে তোমরা আরও সম্মুখে অগ্রসর হবে, কারণ, এটাই তোমাদের উন্নতির উপায়। তাঁর তৌহীদ জগতে প্রচার করতে নিজেরা সমস্ত শক্তি প্রয়োগ কর। তাঁর বান্দাগণের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর ও তাদেরকে নিজ জিহ্বা বা হস্ত দ্বারা বা অন্য কোনও উপায়ে উৎপীড়ন করো না এবং সৃষ্ট জীবের উপকার সাধনে সচেষ্ট থাক। কারো প্রতি, সে তোমার অধীনস্থ হলেও, অহঙ্কার দেখাবে না এবং কেউ গালি দিলেও তুমি গালি দিও না। বিনয়ী, সহিষ্ণু, সদুদ্দেশ্যপরায়ণ ও সৃষ্ট জীবের প্রতি সহানভূতিশীল হও, যেন খোদা তা'লার নিকট গ্রহণীয় হতে পার। অনেকে এইরূপ আছে, যারা বাহ্যত: সরল, কিন্তু অভ্যন্তরে সর্প-বিশেষ। সুতরাং কেউ কখনো তাঁর নিকট গ্রহণীয় হবে না, যে পর্যন্ত তোমাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা এক না হয়। বড় হয়ে ছোটকে অবজ্ঞা করবে না, তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে। বিদ্বান হলে, বিদ্যাহীনকে আত্মগরিমাবশত: অবমাননা না করে তাকে সুদপদেশ দিবে। ধনী হলে আত্মাভিমানে দরিদ্রের প্রতি গর্ব না করে তাদের সেবা করবে। ধ্বংসের পথ হতে সাবধান থাকবে। সর্বদা আল্লাহকে ভয় করবে এবং তাক্‌ওয়া অবলম্বন করবে। কোন সৃষ্ট জীবের উপাসনা করবে না। নিজ প্রভুর প্রতি একনিষ্ঠ হও। সংসার হতে মনকে নির্লিপ্ত রাখ এবং তাঁর জন্য সকল প্রকার অপবিত্রতা ও পাপকে ঘৃণা কর; কেননা তিনি পবিত্র। প্রত্যেক প্রভাত যেন সাক্ষ্য দেয় যে, তুমি তাক্‌ওয়ার সাথে রাত্রি যাপন করেছ এবং প্রত্যেক সন্ধ্যা যেন সাক্ষ্য দেয় যে, তুমি ভীতির সাথে দিন অতিবাহিত করেছো।

সুতরাং যে-ব্যক্তি আমার নিকট সত্যিকার বয়আত গ্রহণ করে সরল অন্ত:করণে আমার অনুগামী হয় এবং আমার আনুগত্যে বিলীন হয়ে স্বীয় কামনা-বাসনাকে পরিত্যাগ করে, সেই ব্যক্তির জন্যই এই বিপদসঙ্কুল দিনে আমার রূহ শাফায়াত (সুপারিশ) করবে। সুতরাং, হে লোক সকল! যারা নিজেকে আমার জামা'তভুক্ত বলে গণ্য করে থাক, আকাশে কেবল তখনই তোমরা আমার জামা'তভুক্ত বলে পরিগণিত হবে, যখন তোমরা সত্যিকারভাবে তাক্‌ওয়ার (খোদাভীরুতার) পথে অগ্রসর হবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের নামায এরূপ ভীতিসহকারে এবং নিবিষ্ট-চিত্তে আদায় করবে, যেন তোমরা আল্লাহ্ তা'লাকে সাক্ষাৎভাবে দেখতে পাচ্ছো। নিজেদের রোযাও তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নিষ্ঠার সাথে পালন করবে। যারা যাকাত দিবার উপযুক্ত, তারা যাকাত দিবে। যাদের জন্য হজ্জ ফরজ হয়েছে এবং তা পালনে কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকলে তারা হজ্জ করবে, সকল পুণ্যকর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন এবং পাপকে ঘৃণার সাথে বর্জন করবে। নিশ্চয় স্মরণ রেখো, যে কোন কর্মই আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না যাতে তাক্‌ওয়া নেই। প্রত্যেক পুণ্য-কর্মের মূল তাক্‌ওয়া (কিশতিয়ে নূহ্ পুস্তকের বাংলা সংস্করণের ২২-২৩ ও ২৬-২৭ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত)।

‘বারাহীনে আহমদীয়া’

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

তৃতীয় খণ্ড

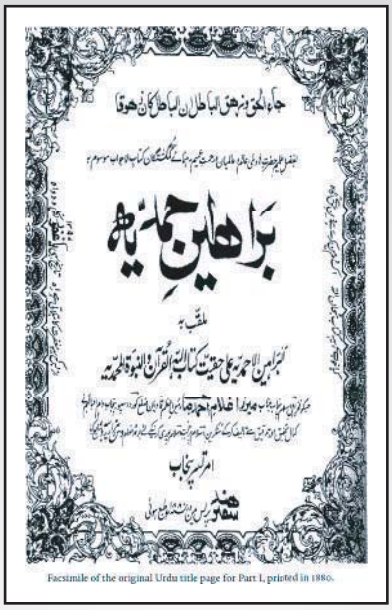

Facsimile of the original Urdu title page for Part I, printed in 1880.

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

(১৯তম কিস্তি)

প্রথম সংস্করণের টাইটেল

جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ؕ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا

(সূরা বনী ইসরাঈল: ৮২)

এ পৃথিবী ও সমগ্র বিশ্বজগতের পথ-প্রদর্শকের মহান কৃপায় এবং পথহারাদের সঠিক পথপ্রদর্শনকারী খোদার সার্বজনীন করুনায়, এ অখণ্ডনযোগ্য গ্রন্থের নাম রাখা হয়েছে ‘বারাহীনে আহমদীয়া’।

এ গ্রন্থের পুরো নাম হলো: ‘আল-বারাহীনুল আহমদীয়া আলা হাক্কীয়্যতে কিতাবিল্লাহিল কুরআন ওয়ান্ নবুয়্যতীল মুহাম্মদীয়াহ’।

চূড়ান্ত গবেষণা ও বিচার-বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে এটি রচনা করেছেন গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত কাদিয়ান গ্রামের সম্মানিত রইস এবং পাঞ্জাবের মুসলমানদের গর্ব, জনাব মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব (খোদা তাঁর সম্মান স্থায়ী করুন)।

বিরোধীদের সামনে ইসলামের পূর্ণ সত্যতা প্রতীয়মান করার জন্য ১০ হাজার রুপি (পুরস্কার) প্রদানের প্রতিশ্রুতির সাথে এটি প্রকাশ করেছেন।

সফীরে হিন্দ ছাপা খানা, অমৃতসর
পাঞ্জাব
১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দ

**হে আল্লাহ্*

মুসলমানদের দুর্দশা, ইসলামের দৈন্যদশা এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-সংক্রান্ত একটি ঘোষণা

বর্তমানে ইসলামের দৈন্যদশার লক্ষণাবলী আর খাঁটি ও সুদৃঢ় মুহাম্মদী ধর্ম ইসলামের ওপর নিপতিত সমস্যাবলী এতটা প্রকটরূপ ধারণ করছে যে, আমাদের জানামতে, মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবের পর থেকে অন্য কোন শতাব্দীতে এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া ভার। এর চেয়ে বড় বিপর্যয় আর কী হবে যে, যখন বিরোধীরা নিজেদের বিশ্বাসের দৃঢ়তা এবং এর প্রচার ও প্রসারে অত্যন্ত সোচ্চার ও সক্রিয়, তখন মুসলমানরা তাদের ধর্মের প্রতি মমত্ববোধ প্রদর্শনে চরম উদাসীন। এর ফলে ধর্মত্যাগ ও ভ্রান্তবিশ্বাসের দ্বার প্রতিদিন- প্রতিনিয়ত প্রশস্ত হয়ে চলেছে। মানুষ দলে দলে ধর্মত্যাগ করে অপবিত্র বিশ্বাস ধারণ করছে।

কতই না পরিতাপের বিষয়! আমাদের বিরোধীরা তাদের রুগ্ন ও নৈরাজ্যকর বিশ্বাস স্পষ্টতই মিথ্যা ও ভ্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও অহোরাত্র স্ব-স্ব ধর্মের কাজে সোচ্চার ও সক্রিয়। এমনকি ইউরোপ ও আমেরিকায় খ্রিষ্টধর্ম প্রসারের জন্য বিধবারাও চাঁদা প্রদান করে থাকে আর বেশীরভাগ মানুষ মৃত্যুর সময় ওসিয়্যত করে যায় যে, তাদের রেখে যাওয়া

সম্পত্তির 'এতো ভাগ' পুরোটাই খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু মুসলমানদের শোচনীয় অবস্থার কথা কী বলব আর কী-ই বা লিখব! তাদের উদাসীনতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ধর্মের অবস্থা দেখে তারা নিজেরাও ব্যথিত হয় না, আর যারা ধর্মের জন্য মর্মযাতনায় ভোগে তাদেরও সুনযরে দেখে না। অথচ ধর্মের সেবায় ব্যথিত হবার কতইনা মোক্ষম সময় এটি। 'বারাহীনে আহমদীয়া' ধর্মের সেবায় এক অনুপম সুযোগ এনে দিয়েছে! যাতে তিনশ' শক্তিশালী দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে ইসলামের সত্যতার প্রমাণাদি উপস্থাপন করা হয়েছে। অধিকন্তু এমনভাবে সকল বিরোধীর মিথ্যা বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করা হয়েছে যা সেসবের জীবন শিরা কেটে দেয়ারই নামান্তর যার ফলে তা আর কখনও প্রাণ ফিরে পাওয়ার নয়। কিছু সংখ্যক দৃঢ়চেতা মুসলমানের মনোযোগের সুবাদে এ গ্রন্থের পুরো দু'টি খণ্ড এবং তৃতীয় খণ্ডের কিছুটা ইতোমধ্যে ছেপে গেছে। তাছাড়া অন্যরা এক্ষেত্রে যে পরিমাণ সাহায্য-সহযোগিতা করেছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু না বলে কেবল

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

(সূরা বাকারা: ১৫৭) পড়াই যথোপযুক্ত হবে।

হে মু'মিন ভাইয়েরা! তোমরা কেন মনোযোগ দিচ্ছ না? আমরা তোমাদের মাঝে আগ্রহ সৃষ্টির চেষ্টা করেছি কিন্তু তোমরা আগ্রহ দেখালে না। আমরা তোমাদের সতর্ক করেছি কিন্তু তোমরা সাবধান হও নি। হে আল্লাহ্‌র বান্দারা, কর্ণপাত কর! মনোযোগ দিয়ে শোন! এ কাজের সহযোগিতায় এগিয়ে আস, তোমাদের পুরস্কৃত করা হবে এবং তোমরা সাহায্যকারীদের মাঝে উত্থিত হবে। উভয় জগতে তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করা হবে আর তোমাদের সম্মানজনক আসন প্রদান করা হবে। খোদা তোমাদের ও আমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করুন। তিনি কতই না উত্তম বন্ধু ও উত্তম সাহায্যকারী! এখনও যদি কেউ মনোযোগ না দেয় তাহলে আমাদের আকুতি-মিনতি কেবল পরম দয়ালু খোদার কাছেই থাকবে। তাঁর পবিত্র প্রতিশ্রুতিই আমরা অসহায়দের একমাত্র সান্তনা ও প্রবোধ। এখানে একথাও জানিয়ে রাখা আবশ্যক যে, প্রথমে এ গ্রন্থ কেবল ৩০-৩৫ জুয বা অধ্যায় পর্যন্ত লেখা হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীতে তা ১০০ অধ্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়েছে। এর মূল্য সাধারণ মুসলমানদের জন্য ১০ রুপি এবং অন্যান্য জাতি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্য ২৫ রুপি নির্ধারণ করা হয়েছে।

কিন্তু গবেষণা ও সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ এবং পর্যাপ্ত যুক্তি-প্রমাণাদি উপস্থাপনের সকল দাবি দৃষ্টিতে রাখতে গিয়ে এ গ্রন্থটি এখন তিনশ অধ্যায় পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। মুদ্রণ-ব্যয়ের কথা দৃষ্টিতে রেখে ভবিষ্যতে এর মূল্য ১০০ রুপি নির্ধারণ করা আবশ্যক বলে মনে হচ্ছিল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষের আন্তরিকতার ঘাটতির কারণে পূর্ব-নির্ধারিত মূল্যকেই চূড়ান্ত মূল্য নির্ধারণ করা যথাযথ বলে মনে হলো যা আসলে তেমন কিছুই নয়। সাধ্য ও ইচ্ছার বাইরে মানুষের ওপর বোঝা না চাপানোই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু আবশ্যকীয় প্রাপ্য হিসেবে সবক'টি খণ্ড দাবি করার কোন অধিকার ক্রেতাদের থাকবে না বরং অধিকারের বাইরে যেসব খণ্ড (অধ্যায়) তারা পাবে তা সম্পূর্ণভাবে খোদার খাতিরে এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই দেয়া হবে।

এর প্রতিদান বা পুণ্য তাঁরা লাভ করবেন, যারা বিশুদ্ধ চিত্তে খোদার সন্তুষ্টির জন্য এ কাজ সমাধার লক্ষ্যে সাহায্য করবেন। স্মর্তব্য যে, এখন এ কাজ কেবল সেসব মানুষের সদিচ্ছায় সম্পন্ন হতে পারে না যারা ক্রেতা হিসেবে সাময়িক উদ্যম বা উচ্ছ্বাস প্রদর্শন করে বরং এখন এমন অনেক দৃঢ়চেতা মানুষের মনোযোগ প্রয়োজন যাদের হৃদয়ে ঈমানী আত্মাভিমানের কল্যাণে সত্যিকার ও বাস্তব উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনা বিদ্যমান, আর যাদের অসাধারণ ও অমূল্য ঈমান কেবল ক্রয়-বিক্রয়ের সংকীর্ণ গন্ডিতেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না, বরং তাঁরা নিজেদের সম্পদের বিনিময়ে চিরস্থায়ী জান্নাত ক্রয় করতে চান

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَّشَآءُ

(সূরা হাদীদ : ২২)। পরিশেষে আমরা বিষয়টি এই দোয়ার মাধ্যমে সমাপ্ত করবো যে, হে মহাসম্মানিত খোদা! তুমি তোমার খাঁটি বান্দাদের এদিকে পুরোপুরি মনোযোগী কর। হে দয়া ও কৃপার আধার! তুমি স্বয়ং তাদের স্মরণ করাও। হে সর্বশক্তিমান! তুমি স্বয়ং তাদের হৃদয়ে ইলহাম কর, আমীন, সুম্মা আমীন। আমরা আমাদের প্রভুর ওপর নির্ভর করি যিনি আকাশ মন্ডলি ও ভূমন্ডলের প্রভু এবং বিশ্বপ্রতিপালক। জ্ঞাতব্য: যারা গ্রন্থ ক্রয় করে অগ্রীম মূল্য পাঠিয়েছেন এবং কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির সন্ধানে সাহায্য করেছেন তাদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, স্থান সংকুলানের অভাবে তাদের নাম উল্লেখ করা সম্ভব হয় নি, অবশ্য কোন কোন বন্ধুর মতে এটা আবশ্যকও নয়। যাহোক, চতুর্থ খণ্ডে সে পন্থাই অনুসৃত হবে যা বেশীর ভাগ মানুষের মতে যুক্তিযুক্ত।

মির্যা গোলাম আহমদ

কৈফিয়ত:

এবার তৃতীয় খণ্ড প্রকাশে দু'বছরের মত যে বিলম্ব ঘটলো, অধিকাংশ ক্রেতা ও পাঠক হয়ত এ কারণে যারপরনাই আশ্চর্য হবেন; কিন্তু স্পষ্ট হওয়া দরকার, এই পুরো বিলম্ব ঘটেছে সফীরে হিন্দ ছাপা খানার (যেখানে এ বই ছাপা হয়) ব্যবস্থাপকের ব্যক্তিগত কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে।

অধম গোলাম আহমদ (খোদা তাঁকে মার্জনা করুন)

গুরুত্বপূর্ণ নিবেদন:

যেহেতু গ্রন্থের কলেবর তিনশ অধ্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে তাই যেসব ক্রেতা এখন পর্যন্ত আংশিক বা পুরো ক্রয় মূল্য পাঠান নি তাঁদের সমীপে নিবেদন হলো, আর কিছু না হলেও নিদেনপক্ষে অনুগ্রহপূর্বক অবশিষ্ট মূল্য অনতিবিলম্বে পাঠিয়ে দিন। কেননা যেখানে গ্রন্থের প্রকৃত মূল্য একশ রুপি, সেখানে মূল্য নির্ধারিত হয়েছে দশ বা পঁচিশ রুপি। যদি এই যৎসামান্য মূল্যও মুসলমানরা অগ্রিম প্রদান না করেন তাহলে তাঁরাই এ কাজ সম্পাদনের পথে বাধ সাধছেন বলে বলে

গণ্য হবে। এই কথাটি আমরা লিখেছি কেবল বাহ্যিক উপায়-উপকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে। সত্য কথা হলো, যদি কেউ সাহায্য না করে বা উদাসীন থাকে তাহলে সে নিজেই এক মহা সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকবে।

উপরন্ত আল্লাহ্‌র কাজ বন্ধ থাকতে পারে না আর কোন সময় বন্ধও হয় নি।

সর্বশক্তিমান খোদা যেসব কাজ করতে চান, তা কারও অমনোযোগিতার কারণে থেমে থাকতে পারে না। ওয়াস্‌সালামো আলা মানীত্ তাবাআল হুদা

বিনীত

মির্যা গোলাম আহমদ

ইসলামিক সংগঠনগুলোর সমীপে গুরুত্বপূর্ণ নিবেদনঃ

'আঞ্জুমানে ইসলামীয়া লাহোর'-এর সেক্রেটারি এবং আঞ্জুমানে হামদরদীয়ে ইসলামী'-এর সেক্রেটারি মৌলভী আবু সাঈদ মুহাম্মদ হুসাইন বাটালভীর পক্ষ থেকে একটি করে পত্র আসে এবং এ অধমের গোচরীভূত হয়। মুসলমানদের শিক্ষা ও চাকুরীক্ষেত্রে উন্নতি- অগ্রগতি এবং স্কুলের পাঠ্যসূচীতে যাতে উর্দূ ভাষা অন্তর্ভুক্ত থাকে, এই সরকারের কাছে উপস্থাপন করার জন্য সেসব আবেদনে সম্মানিত মুসলমান ভাই ও ন্যায়পরায়ণ হিন্দুদের স্বাক্ষর নেয়াই ছিল এ পত্রগুলোর উদ্দেশ্য। পরিতাপের বিষয় হলো, আমি প্রধানত নিজের অসুস্থতা ও গুরুত্বপূর্ণ কাজে অমৃতসরে অবস্থানের কারণে এই দায়িত্ব পালনে অপারগ ছিলাম। কিন্তু 'ধর্ম হিতাকাঙ্খারই নামান্তর'–এই শিক্ষানুসারে এতটুকু বলা আমার ভাইদের ইহলোকও পারলৌকিক কল্যাণের কারণ বলে মনে করি, 'যে সরকার স্বীয় আইনে গবাদিপশু ও চতুষ্পদ জন্তুর প্রতিও সহানুভূতির পরিচয় দিয়েছে, মানুষের এমন একটি বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রতি সে সরকার কী করে সহানুভূতি প্রদর্শন থেকে বিরত ও উদাসীন থাকতে পারে যারা কী-না তাদের প্রজা ও অধিনস্ত, অধিকন্তু দারিদ্র্য ও সমস্যায় জর্জরিত'?

কিন্তু আমাদের সম্মানিত ভাইদের আবশ্যকীয় দায়িত্ব কেবল এতটুকুই নয় যে, মুসলমানদের দারিদ্র্য, অধঃপতন ও শিক্ষা-দীক্ষাহীনতার মাঝে পেয়ে কোন স্মারকলিপি প্রস্তুত করে তাতে বেশ কিছু দস্তখত নিয়ে সরকারকে পাঠানোর ওপরই সর্বদা জোর দিতে থাকবে। জাগতিক হোক বা ধর্মীয়, সকল কাজে সাহায্য চাওয়ার পূর্বে নিজের খোদা-প্রদত্ত শক্তি ও সামর্থ্য কাজে লাগানো আবশ্যক, এরপরই সে কাজের সুষ্ঠু সমাধানের জন্য সাহায্য চাওয়ার বিষয় আসবে। আমাদের প্রাত্যহিক ইবাদতের ক্ষেত্রেও খোদা আমাদের এ শিক্ষাই দিয়েছেন এবং বলেছেন যে আমরা যেন

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝ বলি।

নিজেদের অবস্থার সংশোধনের জন্য মুসলমানদের যেসব বিষয় উদ্যম ও আন্তরিক প্রচেষ্টার সাথে সম্পাদন আবশ্যক তা ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না, বরং চিন্তা-ভাবনা ও প্রণিধানে তারা নিজেরাই তা জানতে পারবে। কিন্তু এখানে সেসব বিষয়ের মধ্য হতে উল্লেখযোগ্য একটি বিষয়– যার ওপর ইংরেজ সরকারের অনুকম্পা ও স্নেহদৃষ্টি নির্ভর করে, তা হলো, সরকারকে এটা ভালভাবে উপলব্ধি করানো যে, ভারতের মুসলমানরা বিশ্বস্ত প্রজা। কেননা কতিপয় ইংরেজ না জেনেই, বিশেষ করে শিক্ষা কমিশনের বর্তমান সভাপতি ড. হান্টার সাহেব তার এক প্রসিদ্ধ রচনায় এই দাবীর ওপর অনেক জোর দিয়েছেন যে, মুসলমানরা ইংরেজ সরকারের আন্তরিক শুভাকাঙ্খী নয় বরং ইংরেজদের সাথে জিহাদ করা আবশ্যক বলে মনে করে। যদিও ইসলামী শরীয়তে দৃষ্টিপাত করলে ড. সাহেবের এ ধারণা সবার সামনে ভিত্তিহীন ও অবাস্তব প্রমাণিত হবে কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, কিছু পাহাড়ী ও সভ্যতা-ভব্যতাবিবর্জিত নির্বোধের অনভিপ্রেত আচরণ এ ধারণাকে সত্যায়িত করে। খুব সম্ভব ঘটনাচক্রে এসব দেখে ড. সাহেবের এমন ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে।

কেননা, কোন কোন সময় অজ্ঞদের হাতে এমন অপকর্ম ঘটেই থাকে; কিন্তু এ বিষয়টি একজন গবেষকের দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারে না যে, এধরনের মানুষ ইসলামী রীতিনীতি থেকে যোজন যোজন দূরে। অধিকন্তু ম্যাকলিন যে মানের খ্রিষ্টান, মুসলমান হিসেবে তারাও তেমনই। অতএব, এটি জানা কথা যে, এসব তাদের ব্যক্তিগত আচরণ, শরীয়তের চাপানো কোন বিধি-বিধান নয়। পক্ষান্তরে, তাদের বিপরীতে সহস্র সহস্র সেসব মুসলমানের কথা ভাবা উচিত যারা জীবনবাজি রেখে ইংরেজ সাম্রাজ্যের মঙ্গল কামনা করে আসছে এবং করছে। ১৮৫৭ সনে যে বিদ্রোহ হয়েছে, অজ্ঞ এবং নোংরা চাল-চলনের মানুষ ছাড়া জ্ঞান ও মাত্রাজ্ঞানের অধিকারী কোন ভদ্র ও পুণ্যবান মুসলমান আদৌ এই বিদ্রোহে অংশ নেয়নি। বরং পাঞ্জাবেও অতীব দরিদ্র মুসলমানরা ইংরেজ সরকারকে সাধ্যাতীত সাহায্য করেছে। যেমন আমাদের মরহুম পিতাজী, পর্যাপ্ত সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও নিষ্ঠা ও হিতাকাঙ্খার আতিশয্যে নিজের অর্থে ৫০টি ঘোড়া ক্রয় করে ৫০ জন সুঠাম ও সুদক্ষ সিপাহী সাহায্যস্বরূপ সরকারের হাতে তুলে দিয়েছেন এবং নিজের সীমিত সাধ্যের বাইরেও সরকারের শুভানুধ্যায়ী হওয়ার স্বাক্ষর রেখেছেন।

এছাড়া যেসব মুসলমান সম্পদশালী ও ধনবান ছিলেন তাঁরা অনেক বড় ও উল্লেখযোগ্য সেবা প্রদান করেছেন। এখন আমরা পুনরায় এই কথার দিকে ফিরে যাচ্ছি যে, যদিও মুসলমানদের পক্ষ থেকে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার বড় বড় দৃষ্টান্ত প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্য যে, ড. সাহেব এসব বিশ্বস্ততাকে সম্পূর্ণভাবে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করেছেন,এবং উপসংহারে এসব আন্তরিক সেবার কথা আদৌ বিবেচনা করেননি। যাহোক আমাদের মুসলমান ভাইদের জন্য আবশ্যক হবে, এদের প্রতারণার ফাঁদে পা দেয়ার পূর্বেই নতুনভাবে ও নবোদ্যমে সরকারের হিতাকাঙ্খী হওয়ার প্রমাণ দেয়া। যে সরকারের ছায়ায় মুসলমানরা শান্তি, নিরাপত্তা ও স্বাধীন পরিবেশে জীবন যাপন করে, যার দানে তারা ধন্য, যার অনুগ্রহের কাছে তারা ঋণী এবং যার রাজত্ব সত্যিকার অর্থে পুণ্য ও হিদায়াতের প্রসারে সার্বিকভাবে অনুকূল ও সহায়ক, সেই রাজত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা (তথাকথিত) জিহাদ সম্পূর্ণভাবে অবৈধ–

যে সরকারের ছায়ায় মুসলমানরা শান্তি, নিরাপত্তা ও স্বাধীন পরিবেশে জীবন যাপন করে, যার দানে তারা ধন্য, যার অনুগ্রহের কাছে তারা ঋণী এবং যার রাজত্ব সত্যিকার অর্থে পুণ্য ও হিদায়াতের প্রসারে সার্বিকভাবে অনুকূল ও সহায়ক, সেই রাজত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা (তথাকথিত) জিহাদ সম্পূর্ণভাবে অবৈধ–এ হলো মুসলমানদের সর্বসম্মত ইসলামী শরীয়তের সুস্পষ্ট শিক্ষা।

এ হলো মুসলমানদের সর্বসম্মত ইসলামী শরীয়তের সুস্পষ্ট শিক্ষা।

অতএব বড়ই পরিতাপের বিষয় হলো, মুসলমান আলেমরা এ বিষয়টি সর্বসম্মতিক্রমে প্রচার না করে অজ্ঞদের কথা ও কলমের খোঁচা খেয়ে আসছে; যে আপত্তির মাধ্যমে তাদের ধর্মের দুর্বলতা প্রকাশ পায় আর অকারণে তাদের বৈষয়িক স্বার্থেরও হানি ঘটে। অতএব, এই অধমের মতে এ লক্ষ্যে লাহোর, কলিকাতা ও মোম্বাইয়ের আঞ্জুমানে ইসলামীয়ার জন্য সমীচীন হবে কয়েকজন বিখ্যাত মৌলভী সাহেবানকে নির্বাচন করা–যাদের শ্রেষ্ঠত্ব, জ্ঞান, যগতের প্রতি অনিহা ও তাকৃওয়া বেশিরভাগ মানুষের কাছে স্বীকৃত। নির্বাচিত এসব লোকের কাছে বিভিন্ন অঞ্চলের জ্ঞানীগুণী মানুষ যারা নিজ নিজ এলাকায় কিছুটা খ্যাতি রাখেন, মোহরাঙ্কিত করে জ্ঞানগর্ভ রচনা ও সন্দর্ভ পাঠাবেন যাতে অন্তর্নিহিত থাকবে সত্য শরীয়ত ইসলাম অনুসারে ভারতীয় মুসলমানদের ওপর অনুগ্রহকারী ও তত্ত্বাবধায়ক ইংরেজ রাজত্বের বিরুদ্ধে জিহাদের স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা। সব পত্র একত্রিত হওয়ার পর এর সংকলন 'মকতুবাতে ওলামায়ে হিন্দ' (ভারতীয় আলেমদের পত্র) নামে সঠিক ও মার্জিত ভাবে লিখে উন্নতমানের কোন ছাপাখানায় ছাপানো দরকার।

এরপর এর দশ থেকে বিশটি অনুলিপি সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে এবং বাকীগুলো পাঞ্জাবসহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে সীমান্তবর্তী প্রদেশগুলোতে বিতরণ করা সঙ্গত হবে। এটি সত্য কথা যে, কয়েকজন সমব্যথী মুসলমান ড. হান্টারের ধ্যান–ধারণা খন্ডণ করেছেন। কিন্তু দু'চারজন মুসলমানের এই খন্ডন সমষ্টির খন্ডনের বিকল্প হতে পারে না। নিঃসন্দেহে গোটা জনগোষ্ঠীর খন্ডনের ফলাফল এত শক্তিশালী এবং জোরালো হবে যে, এর ফলে ড. সাহেবের সব ভ্রান্ত রচনা ধূলায় মিশে যাবে। কিছু অজ্ঞ মুসলমান নিজেদের সত্য ও পবিত্র নীতি সম্পর্কে যথাবিহিত অবহিত হবে আর ইংরেজ সরকারের সকাসে মুসলমানদের স্বচ্ছতা ও সরকারের জন্য প্রজাদের হিতাকাঙ্খা স্পষ্ট হয়ে যাবে। অধিকন্তু এ গ্রন্থে বর্ণিত পরামর্শ ও উপদেশাবলীর মাধ্যমে কিছু অজ্ঞ পাহাড়ীর ধ্যান-ধারণারও সংশোধন হতে থাকবে। শেষের দিকে একথা স্পষ্ট করা আমরা নিজেদের আবশ্যকীয় দায়িত্ব মনে করি যে, যদিও সমগ্র ভারতের আবশ্যকীয় দায়িত্ব হলো, ইংরেজ সরকারের পক্ষ থেকে তাদের সুশাসন ও অনুপম প্রজ্ঞার ভিত্তিতে জনসাধারণের প্রতি যেসব অনুগ্রহ ও অনুকম্পা বিদ্যমান রয়েছে সেসবের জন্য এ সাম্রাজ্যকে খোদার নিয়ামত মনে করা এবং অন্যান্য ঐশী পুরস্কারের মত এর জন্যও খোদার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কিন্তু এই প্রশংসনীয় সাম্রাজ্যকে যদি তারা খোদার মহান নিয়ামত হিসেবে দৃঢ় বিশ্বাস না রাখে যা সত্যিকার অর্থে তাদের জন্য খোদার অনেক বড় আশীর্বাদ, তাহলে পাঞ্জাবের মুসলমানরা অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ হবে। এ সাম্রাজ্যের পূর্বে তারা কত তিরস্কৃত-ধিকৃত অবস্থার মাঝে দিনাতিপাত করছিল এবং পরে কীভাবে তারা শান্তি ও নিরাপত্তার বেষ্টনিতে এসে গেছে–তা তাদের ভেবে দেখা উচিত। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে এই সাম্রাজ্য তাদের জন্য স্বর্গীয় আশীর্বাদতুল্য যার ফলশ্রুতিতে তাদের সকল কষ্ট দূরীভূত হয়েছে এবং সকল প্রকার অত্যাচার ও নির্যাতন থেকে তারা পরিত্রাণ লাভ করেছে এবং সর্বপ্রকার অন্যায়, বাধা-বিপত্তি ও কষ্ট থেকে মুক্তি পেয়েছে। এখন এমন কোন প্রতিবন্ধকতা নেই যা আমাদের সৎকর্মে বাধ সাধতে পারে বা আমাদের স্বাচ্ছন্দ্যে হস্তক্ষেপ করতে পারে।

অতএব দয়া ও কৃপার আধার খোদা এই সাম্রাজ্যকে মুসলমানদের জন্য করুণাবারি স্বরূপ প্রেরণ করেছেন; যার কল্যাণে পুনরায় ইসলামের চারা গাছ এদেশে অর্থাৎ পাঞ্জাবে সতেজতা ফিরে পেয়েছে। তাই এর কল্যাণরাজির কথা স্বীকার করা সত্যিকার অর্থে খোদার অনুগ্রহরাজি স্বীকারেরই নামান্তর। এই সাম্রাজ্য-প্রদত্ত স্বাধীনতা এত দেদিপ্যমান এবং তার স্বীকৃতি এতটাই ব্যাপক যে,অন্য কোন দেশ থেকেও নির্যাতিত মুসলমানরা হিজরত করে এদেশে আসতে মনে-প্রাণে পছন্দ করে। মুসলমানদের সংশোধন ও তাদের মাঝে বিরাজমান কুসংস্কার দূরীভূত করার মানসে যত সহজে ও স্বচ্ছন্দে এই সরকারের ছত্রছায়ায় নসিহত করা সম্ভব, আমাদের মতে তা এখন অন্য কোন দেশে করা সম্ভব নয়।

অধিকন্তু যেসব বিদাত তাদের ধর্মের অংশ

হয়ে গেছে তা দূরীভূত করার জন্য উপদেশ দেয়াা এবং যেসব কার্যক্রমের কল্যাণে মুসলমান আলেমরা এ সরকারের ছত্রছায়ায় ধর্মের প্রচার ও প্রসারে প্রেরণা পায়, যেখানে নিজেদের যুক্তি ও অন্তদৃষ্টির উন্নত ব্যবহার করে ব্যাপক গবেষণার মাধ্যমে সুদৃঢ় ধর্ম ইসলামের সমর্থনে বই-পুস্তক প্রকাশ করে বিরোধীদের সামনে ইসলামের সত্যতা স্পষ্টভাবে তুলে ধরা যায়, তা এখন আর অন্য কোন দেশে সম্ভব নয়। এটিই সেই শাসনব্যবস্থা যার ন্যায়নিষ্ঠ সমর্থনের সুবাদে দীর্ঘকাল তথা শত শত বছর পর নির্ভয়ে কুসংস্কারের নোংরামি, শির্‌কের অপবিত্রতা ও সৃষ্টিপূজার কলুষ সম্পর্কে নির্বোধদের অবগত করা এবং স্বীয় প্রিয় রসূলের সরল-সুদৃঢ় পথ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে অবহিত করার সুযোগ আলেমদের হাতে এসেছে। সেই শাসন ব্যবস্থা যার অধীনে সব মুসলমান নিরাপদে ও শান্তিতে জীবন যাপন করে, ধর্মীয় আবশ্যকীয় আচার-অনুষ্ঠান যথাযথভাবে পালনে সক্ষম, ধর্মের প্রচারে ও প্রসারে সবচেয়ে বেশি নিবেদিত থাকার সুযোগ পায়, এমন সরকারের অমঙ্গল কামনা কোনভাবে বৈধ হতে পারে কি? না, কখনোই নয়, কোন পুণ্যবান ও ধার্মিক মানুষ এমন কথা ভাবতেও পারে না।

আমরা একেবারেই সত্য বলছি, পৃথিবীতে আজ একমাত্র রাজত্ব এটিই যার স্নেহের ছায়ায় এমন কোন কোন ইসলামী আচার-অনুষ্ঠানের বাস্তবায়ন করা সম্ভব, যা অন্যান্য দেশে কোনভাবেই অর্জিত হতে পারে না। শিয়াদের দেশে গেলে দেখবে, তারা সুন্নীদের বক্তৃতায় ক্ষেপে যায় আর সুন্নীদের দেশে শিয়ারা নিজেদের মতামত প্রকাশে ভয় পায়। অনুরূপভাবে মুকাল্লিদীন (চার মাযহাবের অনুসারী) মুয়াহ্‌হেদদের (একত্ববাদী) শহরে যাওয়ার বা চার মাযহাবের অনুসারীরা প্রথম মতবাদের (মুয়াহ্‌হীদীন) অনুসারীদের শহরে যাওয়ার সাহসটুকুও দেখায় না। কোন বিদাত স্বচক্ষে দেখলেও মুখে তা উচ্চারণের সুযোগ পায় না। অতএব এটিই সেই রাজত্ব যার ছত্র-ছায়ায় সকল ফির্কা নিরাপদে ও স্বাচ্ছন্দ্যে নিজেদের মতামত প্রকাশ করে এবং এটি সত্যের অনুসারীদের জন্য খুবই কল্যাণকর। কেননা যে দেশে বাক-স্বাধীনতা নেই, উপদেশ দেয়ার সৎসাহস দেখানে যায় না সে দেশে কীভাবে সত্যতার প্রসার ঘটতে পারে? সততার প্রসারের জন্য সেই দেশ অনুকূল যেখানে সত্যের অনুসারীরা স্বাধীনভাবে সদুপদেশ দিতে পারে। এ বিষয়টিও অনুধাবন করা উচিত, ধর্মীয় জিহাদের আসল উদ্দেশ্য হলো ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং অন্যায়ের অবসান। ধর্মীয় যুদ্ধ কেবল সেসব দেশের বিরুদ্ধে হয়েছিল যেখানে ধর্মীয় উপদেশ দেয়ার সময় উপদেশদাতাদের জীবন হুমকির মুখে ছিল, যেখানে নির্ভয়ে বক্তব্য প্রদান করা ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব আর যেখানে কেউ সত্যপথ অবলম্বন করে স্বজাতির অত্যাচার হতে নিরাপদ থাকতে পারতো না। কিন্তু ইংরেজ রাজত্বের স্বাধীনতা যে কেবল এসব ব্যাধি হতে মুক্ত তাই নয়, বরং ইসলামের উন্নতির ক্ষেত্রে তা পরম সাহায্যকারী এবং সহায়কও বটে। মুসলমানদের জন্য আবশ্যক হবে খোদা-প্রদত্ত এই নেয়ামতের মূল্যায়ন করা আর একে লুফে নিয়ে ধর্মীয় উন্নতির ময়দানে এগিয়ে যাওয়া। এই তত্ত্বাবধানকারী সরকারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিমেত্তে তাদের পার্থিব রাজত্বের মঙ্গল কামনার পাশাপাশি নিজেদের বক্তৃতা-বিবৃতি ও উন্নত রচনাবলীর মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের কল্যাণরাজি যাতে কোনভাবে তারাও লাভ করতে পারে সে চেষ্টাও অব্যহত রাখা। আর এ কাজ নম্রতা, ভদ্রতা, ভালোবাসা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করা ছাড়া সম্ভব নয়। খোদার বান্দাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা আর একই স্রষ্টাকে আরব ও ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশের স্রষ্টা জ্ঞান করা এবং তাঁর দুর্বল সৃষ্টির জন্য আন্তরিক মমত্ববোধ প্রকাশ করাই হলো সত্যিকার অর্থে ধর্ম ও ঈমান।

তাই সর্বপ্রথম এমন অজ্ঞ ইংরেজদের সন্দেহের নিরসন করা আবশ্যক, যারা জ্ঞানের অভাবে ভাবছে যে, মুসলমানরা এমন এক জাতি যারা উপকারীর অপকার করে আর অনুগ্রহকারীদের সাথে পীড়াদায়ক ব্যবহার করে এবং নিজেদের তত্ত্বাবধানকারী সরকারের অমঙ্গল চায়; অথচ অনুগ্রহকারীর প্রতি সদাচরণের তাগাদা পবিত্র কুরআনে যতটা রয়েছে অন্য কোন গ্রন্থে তার কণামাত্রও পাওয়া যায় না। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَآئِ ذِي الْقُرْبٰى

(সূরা আন নাহল:৯১)

অধম গোলাম আহমদ
খোদা তাকে মার্জনা করুন

ভাষান্তর: **মওলানা ফিরোজ আলম**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

(চলবে)

পবিত্র কুরআনের সেজদার দোয়া

"সাজাদা ওয়াজহী লিল্লাযি খালাকাহু ওয়া শাক্কা সাম্‌আহু ওয়া বাছারাহু বিহাওলিহী ওয়া কুওয়াতিহী"

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) রাতে সেজদায়ে তেলওয়াতে এই দোয়া পড়তেন, "আমার চেহারা সেজদা করল তাঁরই জন্য যিনি একে সৃষ্টি করেছেন এবং এতে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন (সেজদা করল) তাঁরই প্রদত্ত শক্তি ও সামর্থ্যবলে" (আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী)।

ঈদুল ফিতরের খুতবা

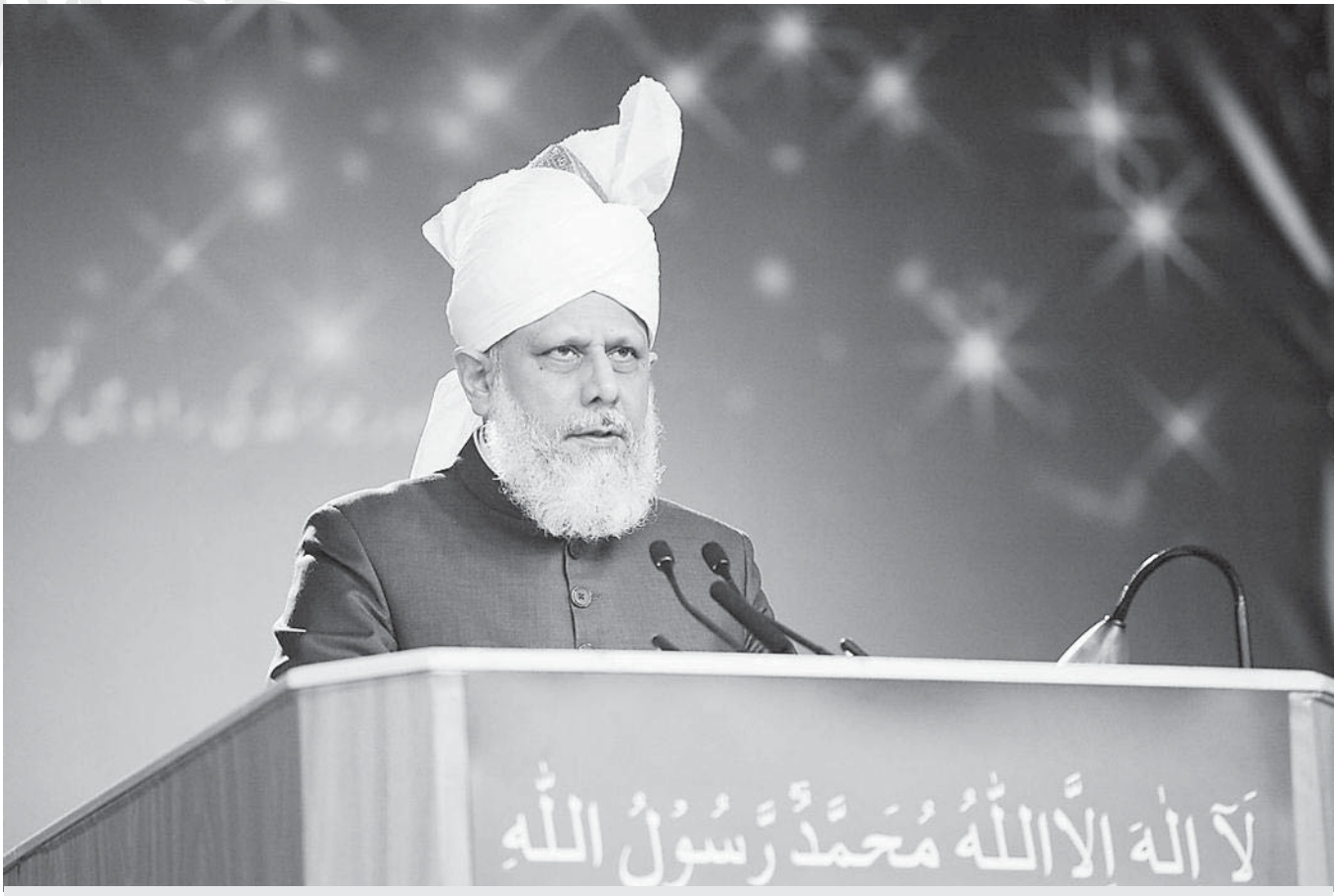

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৯শে জুলাই, ২০১৫ তারিখে প্রদত্ত ঈদুল ফিতরের খুতবা

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজ আমরা ছোট, বড়, নারী-পুরুষ সবাই এখানে এ উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছি যে, আজকের দিন একটি বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। আর সেই বিশেষত্ব হচ্ছে ইসলামে আমাদের অর্থাৎ মুসলমানদের জন্য মানব প্রকৃতিকে দৃষ্টিপটে রেখে যে, মানুষ যেন সজাতি এবং নিকট আত্মীয়দের সাথে মিলেমিশে কোন আনন্দের দিন উদযাপন করে, ঈদের দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। আর যারা ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যারা ইসলামের অনুসারী, ইসলামের মান্যকারী এবং যারা এই অঙ্গীকার করে যে, আমরা ধর্মকে পার্থিবতার ওপর অগ্রাধিকার দিব বা প্রাধান্য দিব, তাদের জন্য এই দিন আরও অনেক বেশি আনন্দের কারণ হয়ে থাকে যখন তারা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ অনুসারে এক মাস আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে বৈধ কাজ কর্ম থেকেও বিরত থাকে, নিজেদের ওপর কঠোরতা আরোপ করে, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজেদের ওপর বিভিন্ন বিধি-নিষেধ আরোপ করে এবং আল্লাহ্ তা'লারই নির্দেশে আজকের দিনে ঈদ উদযাপন করে।

অতএব এমন অবস্থায় আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা আরও বেড়ে যায় যে, আল্লাহ্ তা'লা শুধুমাত্র বিধি-নিষেধই আরোপ করেন নি, শুধুমাত্র বিধি-নিষেধের মাঝেই বান্দাকে আটকে রাখেন নি বরং প্রকৃতির চাহিদাকে দৃষ্টিপটে রেখে পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে আনন্দের উদযাপনের জন্য আমাদেরকে ঈদের দিন

একজন সত্যিকার মুসলমান যখন ঈদ উদযাপন করে তখন তার এই বিষয়টিকেও দৃষ্টিতে রাখা চাই, আমার এই ঈদ কেবল পানাহার এবং ক্রীড়া-কৌতুক বা খেলা তামাশার ঈদ নয়, বরং এই ঈদ যেখানে আমাকে অন্যদের সাথে মিলিতভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করার বা আনন্দ উদযাপনের অনুমতি দেয় সেখানে এই বিষয়ের প্রতিও আমার মনোযোগ বা দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে, এখন আমার খোদা তা'লার প্রাপ্য অধিকার পূর্বের তুলনায় আরও সুন্দরভাবে প্রদান করতে হবে, যিকরে ইলাহির প্রতি পূর্বের চেয়ে অধিক মনোযোগ দিতে হবে।

দান করেছেন।

কিন্তু এই আনন্দের দিনে এই বিষয়টিও আমাদের দৃষ্টিপটে রাখা চাই যে, আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদেরকে যেখানে মানব প্রকৃতি অনুসারে আনন্দ উদযাপনের উপকরণ সরবরাহ করেছেন, সেখানে সেই আনন্দ উদযাপনের কিছু সীমারেখাও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এক দিকে তিনি প্রকৃতির দাবি অনুসারে পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে আনন্দ উদযাপনের ব্যবস্থা করেন আর অপর দিকে বান্দার যে দায়িত্ব রয়েছে সেই দায়িত্ব পালনের জন্যও কিছু সীমা এবং জীবনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে দেন। অন্যান্য জাতির লোক যারা রয়েছে তারাও নিজ নিজ আনন্দ উদযাপনের জন্য দিন নির্ধারণ করেছে কিন্তু তাদের দিন এইভাবে শরীয়তের নির্দেশ অনুসারে নয় যেভাবে মুসলমানরা শরীয়তের শিক্ষা অনুসারে উদযাপন করে থাকে। আর তাতে এমন সম্মিলিত রূপও দেখতে পাওয়া যায় না যেমনটি ইসলাম ঈদের দিনে একটি সম্মিলিত রূপের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। আর শুধু এটিই নয় যে, মুসলমানদের ঈদ শুধু শরীয়তের শিক্ষা সম্মত বা শরীয়তের নির্দেশ অনুসারে বরং যেমনটি আমি বলেছি যে, এটি বিভিন্ন বিধি নিষেধও আরোপ করে থাকে। আর মানব জীবনের মূল উদ্দেশ্যকেও দৃষ্টিপটে রেখে আমাদেরকে এই আনন্দ উদযাপনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

অতএব আমাদের এই আনন্দের বিশেষত্ব হচ্ছে এতে ঈদের নামায এবং ঈদের খুতবায় অংশ গ্রহণ করারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আর নামায ও ঈদের খুতবার মূল উদ্দেশ্য হলো, যেখানে মানুষ ঈদ উদযাপনের জন্য, ঈদের আনন্দ উদযাপনের জন্য সমবেত হবে, সম্মিলিতভাবে আনন্দ করার জন্য কোন প্রোগ্রাম বানাবে, সেখানে খোদা তা'লার ইবাদত করার জন্য এবং খোদার কথা শুনার জন্যও যেন তারা সমবেত হয়। অতএব অন্যান্য জাতির যে ঈদ এগুলো পানাহার এবং ক্রীড়া কৌতুকের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে কিন্তু আমাদের ঈদগুলোতে অন্যান্য দিনের চেয়েও বেশী যিকরে ইলাহির নির্দেশ রয়েছে। ঈদের দিন পাঁচ বেলার নামায পড়াও ফরয এছাড়া ঈদের নামায পড়া এবং ঈদের খুতবা শুনাও আবশ্যক।

অতএব একজন সত্যিকার মুসলমান যখন ঈদ উদযাপন করে তখন তার এই বিষয়টিকেও দৃষ্টিতে রাখা চাই বা রাখা উচিত যে, আমার এই ঈদ কেবল পানাহার এবং ক্রীড়া-কৌতুক বা খেলা তামাশার ঈদ নয়, বরং এই ঈদ যেখানে আমাকে অন্যদের সাথে মিলিতভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করার বা আনন্দ উদযাপনের অনুমতি দেয় সেখানে এই বিষয়ের প্রতিও আমার মনোযোগ বা দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে, এখন আমার খোদা তা'লার প্রাপ্য অধিকার পূর্বের তুলনায় আরও সুন্দরভাবে প্রদান করতে হবে, যিকরে ইলাহির প্রতি পূর্বের চেয়ে অধিক মনোযোগ দিতে হবে। এমনটি যেন না হয় যে, ঈদের নামায পড়ার পর ঈদের অন্যান্য যে ব্যস্ততা রয়েছে তার কারণে এবং পরস্পরের সাথে দেখা সাক্ষাতের জন্য যোহর-আসরের নামাযের প্রতি কোন দৃষ্টি থাকবে না। মানব সৃষ্টির যে মূল উদ্দেশ্য তা-ই মানুষ ভুলে বসবে, এমনটি যেন না হয়। আর আমাদের আহমদীদের সাধারণ মুসলমানদের চেয়ে আরো বেশী এই বিষয়টি দৃষ্টিতে রাখা উচিত যে, ঈদের আনন্দে খোদার যে প্রাপ্য অধিকার তাও আমরা ভুলবো না আর খোদার সৃষ্টির যে প্রাপ্য অধিকার রয়েছে তা প্রদানের ক্ষেত্রেও আমরা আলস্য প্রদর্শন করবো না।

আমাদের এই ঈদ শুধুমাত্র বাহ্যিক ক্রীড়া কৌতুকের ঈদ নয়, বরং সেই সত্যিকার এবং প্রকৃত ঈদ যা আমাদেরকে খোদা তা'লার সঙ্গে মিলিত করবে, এক নিবিড় সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ করবে। এটি আমাদের প্রতি খোদা তা'লার কত বড় এহসান বা অনুগ্রহ যে, তিনি যুগ ইমামকে আমাদের সংশোধনের জন্য প্রেরণ

করেছেন। সেই ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছেন যার আগমন এবং তাঁকে দেখা ও তাঁকে গ্রহণ করার বাসনা নিয়ে অনেক পুণ্যবান মানুষ এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি অনেক কৃপা করেছেন যে, তিনি আমাদেরকে শুধু তাঁর যুগে সৃষ্টিই করেন নি বরং আমাদেরকে তাঁকে মানার তৌফিকও দিয়েছেন। অতএব আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যে এই তৌফিক এবং সুযোগ দিয়েছেন যে, আমরা যুগ ইমামকে মেনেছি, তো যুগ ইমামকে মান্য করার এই বিষয়টি আমাদের কাছে কিছু দাবি করে, এবং এই বিষয়গুলো আমাদের দৃষ্টিতে রাখা চাই। আমাদের জন্য শুধু এই কথা বলাই যথেষ্ট নয় যে, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ অনুসারে তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরীত মহাপুরুষকে আমরা মেনেছি বা তাঁর মনোনীত ব্যক্তিকে আমরা মেনেছি এটিই যথেষ্ট নয়।

বরং আমাদের ঈমানকে আরও সুন্দর করার জন্য আর সত্যিকার ঈদ উদযাপন করার জন্য সেসব প্রত্যাশাও আমাদেরকে পূরণ করতে হবে যা যুগ ইমাম, প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং ইমাম মাহ্দী (আ.) আমাদের কাছে রেখেছেন, তখনই আমাদের ঈদ সত্যিকার ঈদে পরিণত হবে, তখনই আমরা আল্লাহ্ তা'লার ফযল এবং কৃপারাজি অর্জনকারী হতে পারবো, তবেই আমরা মহানবী (সা.)-এর এই নির্দেশ মান্যকারী হবো যে, আমার মাহ্দীকে তোমরা মেনো। শুধু মৌখিকভাবে মানার অঙ্গীকার করা, এটি যথাযথভাবে মানার দায়িত্ব পালন করা নয় যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কার্যকরভাবে বা ব্যবহারিক দিক থেকেও এতায়াত বা আনুগত্যের দৃষ্টান্ত না দেখাবো। এতায়াতের দৃষ্টান্ত প্রদর্শনও আবশ্যক কেননা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর বয়াতে আমাদের কাছে এই অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, আমরা সারা জীবন বা আমৃত্যু তাঁর আনুগত্য করতে থাকবো, তাঁর নির্দেশ পালন করার জন্য নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করব।

এ সম্পর্কে আমি কিছু কথা বলছি যার প্রত্যাশা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের কাছে রেখেছেন। তিনি (আ.) এক স্থানে বলেন, আমাদের জামাত যদি সত্যিকার জামাতে পরিণত হতে চায় তাহলে তাদের উচিত তারা যেন নিজেদের ওপর এক মৃত্যু আনয়ন করে, প্রবৃত্তির তাড়না এবং প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা থেকে যেন মুক্ত থাকে, আর আল্লাহ্ তা'লাকে যেন সবকিছুর ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করে। তিনি বলেন, বাজে কাজ-কর্মে লিপ্ত হলে মানুষ ধ্বংস হয়ে যায়।

সুতরাং বাজে কাজ-কর্ম এড়িয়ে চললে খোদা তা'লা অগ্রাধিকার পান। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেকের জন্য তার নিজেরও কিছু অধিকার নির্ধারণ করেছেন, স্ত্রী-সন্তানেরও কিছু প্রাপ্য নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা এই কথা বলেন না যে, নিজের অধিকার নিজেকে দেবে না বা নিজের ওপর যুলুম করবে এ কথা আল্লাহ্ তা'লা বলেন না। বরং আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তাঁর প্রতি সত্যিকার কৃতজ্ঞতা হলো, যে সমস্ত নিয়ামতরাজি তিনি নাযেল করেছেন সেগুলো যথাযথভাবে ব্যবহার করা। এখানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন যে, প্রবৃত্তির কামনা বাসনা এড়িয়ে চল এর অর্থ হলো নফস বা প্রবৃত্তির পিপাসা নিবারণের জন সত্যকে বিসর্জন দিবে এটি যেন না হয় বা হারামকে হালাল জ্ঞান করবে এমনটি যেন না হয় বরং, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা যেসব সীমারেখা নির্ধারণ করেছেন সেগুলোর ব্যাপারে সাবধান থাকবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এক ধনবান ব্যক্তির জন্য একটি জিনিস হস্তগত করা সহজ, যাকে আল্লাহ্ তা'লা আর্থিক সাচ্ছন্দ্য দিয়েছেন তার জন্য সেটি হস্তগত করা সহজ আর সেটি বৈধও, সে ব্যক্তি সহজেই এটি হস্তগত করতে পারে বা অর্জন করতে পারে।

কিন্তু যার সাধ্য নেই বা যার আয়ের ভিতর থেকে তা লাভ করা তার জন্য সম্ভব নয় কিন্তু তার লিপ্সা অন্যায় আয়ের মাধ্যমে সেটি হস্তগত করতে তাকে প্রবৃত্ত করে বা কামনা বাসনা চরিতার্থ করার জন্য সে ঋণ নিয়ে নিজেকে ঋণের বোঝায় জর্জরিত করে, সে যদি এটি হস্তগত করতে চায় তাহলে এটি আসলে প্রবৃত্তির কামনা বাসানারই রাজত্ব যা তার ওপর প্রতিষ্ঠিত হলো বা এরই শাসন সে শিরোধার্য করছে। তো বড় পাপ হোক বা ছোট পাপ আল্লাহ্ তা'লাকে বিসর্জন দিয়ে যখন মানুষ সেগুলো করে তখন সেটি আসলে প্রবৃত্তি বা কামনা বাসনারই দাসত্বের নামান্তর, আর আল্লাহ্ তা'লাকে প্রাধান্য না দেয়ারই প্রমাণ। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এ কথা বলা যে, আমাদের জামাত যদি জামাত হতে চায় তাহলে জামাতের উচিত হবে নিজেদের ওপর এক মৃত্যু আনয়ন করা। সদস্যের সমন্বয় বা সমষ্টির নাম হলো জামাত। যতক্ষন পর্যন্ত ব্যক্তিগত সংশোধন না হবে সমষ্টিগতভাবে জামাত সংশোধিত বলে আখ্যায়িত হতে পারে না, বরং বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতি চোখে পড়বে।

তাই আমরা এটি নিয়ে আনন্দিত হতে পারি না যে, আমাদের অধিকাংশ নিজেদের জাগতিক উদ্দেশ্যের ওপর খোদা তা'লাকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। একটি প্রবাদ আছে যে, দু'একটা নোংরা মাছও পুরো পুকুরকে নোংরা করে ফেলে। তাই কয়েক ব্যক্তির নোংরা আচরণ পুরো জামাতকে দুর্নাম করতে পারে, বরং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজেই বলেছেন, আমাদের সাথে সম্পর্কের দাবি করে আমাদেরকে দুর্নাম করো না বা আমাদের দুর্নামের কারণ হয়ো না।

এখন কারও মাঝে যদি ব্যক্তিগত কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা তাকে তাহলে মসীহ্ মাওউদ (আ.) কিভাবে বদনাম বা দুর্নাম হতে পারেন, কিন্তু আপনারা যদি চিন্তা করেন তাহলে দেখবেন যে, আমাদের ব্যক্তিগত দুর্বলতাই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দুর্নামের কারণ হয়। আমাদের বিরোধীরা তখন আমাদের প্রতি আঙ্গুলি নির্দেশ করবে, তারা বলবে, দাবি তো তোমরা এটি করছো যে, যুগ ইমামকে মেনে তোমরা ঈমানদার হয়ে গেছ বা ঈমানের বহিঃপ্রকাশ করছো কিন্তু এই এই মৌলিক রোগ-ব্যাধি আমরা তোমাদের মাঝে দেখতে পাচ্ছি, মিথ্যা, প্রতারণা, ধোঁকা এসব তোমাদের মাঝে রয়েছে। মাহ্দী (আ.)-এর তো পৃথিবীতে এসে বিপ্লব আনার কথা ছিল, মানব প্রকৃতিকে পাক-পবিত্র করার কথা ছিল, এখন আমাদেরকে বল যে, এই বয়আত তোমাদের জীবনে কি বিপ্লব এনেছে?

আজ আমরা আহমদীরা যদি সত্যিকার ঈদ উদযাপন করতে চাই তাহলে আত্মজিজ্ঞাসা এবং আত্মবিশ্লেষণের চেতনা নিয়ে নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন এনে সত্যিকার ঈদের কল্যাণে কল্যাণমন্ডিত হওয়ার পাশাপাশি পৃথিবীকে যুলুম এবং অন্যায়ের গন্ডি থেকে বের করার জন্য দোয়ার গন্ডিকে যত বিস্তৃত করা যায় তা করা উচিত, যুলুম, অত্যাচার এবং নিষ্পেষনের শিকার উম্মতে মুসলেমাহ্‌কে সাহায্য করা উচিত এবং হৃদয়ের ব্যাকুলতা নিয়ে তাদের জন্য দোয়া করে আমাদের সত্যিকার ঈদ উদযাপন করা উচিত।

সুতরাং জামাতের কোন এক ব্যক্তির অপকর্ম শুধু জামাতের মূলকেই নাড়া দেয় না বা দোদুল্যমান করে না বরং এমন ব্যক্তি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর শিক্ষাকে আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত করে। পূর্বেও আমি দু'একবার বলেছি, অনেকেই প্রকাশ্যে কিছু আহমদীর বিরুদ্ধে আপত্তি করে যে, তাদের অমুক অমুক দুর্বলতা আমাদের জামাতভুক্ত হওয়ার পথে বাঁধা। সুতরাং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যে জামাত গঠন করতে চান তা তো খোদা প্রেমীকদের জামাত, খোদা তা'লাকে অগ্রাধিকার প্রদানের জন্যই এই জামাত, বৈষয়িকতাকে ধর্মের ওপর প্রাধান্য দেয়ার জন্য নয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একবার কোন এক বৈঠকে বলেন যে, শুধু মৌখিকভাবে বয়আতের অঙ্গীকার করা কোন অর্থ রাখে না বরং চেষ্টা কর আর আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া কর তিনি যেন তোমাদেরকে সত্যবাদী প্রমাণ করেন। আর এ ক্ষেত্রে আলস্য বা ত্রুটি বিচ্যুতির শিকার হবে না বরং সোচ্চার হও। তিনি (আ.) হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ শহীদ সাহেবের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে বলেন যে, আব্দুল লতীফের যে আদর্শ তা সবসময় দৃষ্টিতে রাখ যে, তার সত্তা থেকে কিভাবে সত্যবাদী এবং বিশ্বস্তদের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। তার সত্যতা এবং বিশ্বস্ততার দাবি হলো, প্রাণ বা জীবন গেলেও আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি যেন সবসময় প্রাধান্য পায়। শুধু ঈমানের দাবি করা আর কিছু শত্রুর সামনে দাঁড়িয়ে যাওয়া বা বুলেট বুকে নেয়াই সব নয়, ঠিক আছে, এটিও কুরবানী, এভাবেও মানুষ সত্যের জন্য জীবন দেয়, কিন্তু আসল কুরবানী হলো স্থায়ীভাবে নিজের কামনা বাসনাকে কুরবান কর আর খোদার সাথে যে বিশ্বস্ততার অঙ্গীকার করেছ সেটি রক্ষা কর।

যারা অন্যদের সামনে নোংরা দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তারা কখনও বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী হিসেবে আখ্যায়িত হতে পারে না বরং, তিনি বলেন, যারা অন্যদেরকে নসীহত করে কিন্তু নিজে কোন আমল করে না এমন মানুষ বেঈমান হয়ে থাকে। এটি সত্যিই ভয়ের বিষয়। যারা নোংরা দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তাদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন যে, এমন দৃষ্টান্ত বা এমন আচরণের ফলে পৃথিবীর অনেক বড় ক্ষতি হয়েছে। আমাদের জামাতের এমন কাজ-কর্ম এড়িয়ে চলা উচিত। তোমরা এমন হইও না। তোমরা নিজেদের সর্ব প্রকার কামনা বাসনা এড়িয়ে চল। প্রত্যেক আগন্তুক বা অপরিচিত ব্যক্তি যে তোমাকে দেখে, সে তোমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে, সে তোমার অভ্যাস, দৃঢ়চিত্ততা, অবিচলতা এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশ মানার যে মান সেগুলোকে দেখে যে, তা কেমন। যদি এই ক্ষেত্রে মান উন্নত না হয় তাহলে তোমাদেরকে দেখে এমন মানুষ হোঁচট খায়।

সুতরাং তিনি আমাদেরকে উন্নত মানে দেখতে চেয়েছেন। আর উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য যেভাবে পূর্ববর্তী বিভিন্ন খুতবায়ও আমি বলেছি যে, খোদা তা'লাকে আমরা তখনই প্রাধান্য দিতে পারব বা অগ্রাধিকার দিতে পারব যদি সবসময় আমাদের মাঝে এই সচেতনতা থাকে যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দেখছেন, আমাদের ওপর আল্লাহ্‌র দৃষ্টি রয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) স্বীয় জামাতের যেই মানে আমাদেরকে দেখতে চান তার উল্লেখ করতে গিয়ে এক জায়গায় বলেন, আল্লাহ্ তা'লা এখন এক সত্যবাদীকে পাঠিয়ে এমন জামাত গঠন করার ইচ্ছ রাখেন যারা খোদা তা'লাকে ভালোবাসবে।

সুতরাং খোদা-প্রেম বা খোদাকে ভালোবাসা কোন সামান্য কথা নয়। এর জন্য অবিরত এবং অবিরাম প্রচেষ্টা ও দোয়া আর নিজের আমল বা কর্মকে খোদার ইচ্ছার অধীনস্ত রাখা প্রয়োজন যা মানুষকে আল্লাহ্ তা'লার সত্যিকার ভালোবাসার দিকে নিয়ে যায়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যে কোন উক্তি এই কথাতে গিয়েই তিনি ইতি টানেন যে, খোদার প্রতি সত্যিকার ভালোবাসা চাই। খোদার আদেশ-নিষেধ মেনে চলা উচিত। আর তিনি বলেন যে, আমার আগমনের উদ্দেশ্য এটিই। যে এই উদ্দেশ্যকে বোঝে এবং এটিকে বাস্তবায়নের চেষ্টা করে সে-ই আমার অংশ, সে-ই আমার সাথে সম্পর্ক রাখে। আর এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, স্মরণ রেখ, এই জামাত এই উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি যে, ধন-সম্পদ বা জাগতিকতার ক্ষেত্রে উন্নতি করবে আর সাচ্ছন্দের মাঝে জীবন অতিবাহিত হবে, এমন ব্যক্তির প্রতি তো খোদা অসন্তুষ্ট। তাই সাহাবাদের জীবনকে দেখ, তাদের জীবনের প্রতি দৃষ্টি রাখ।

তাদের জীবন কেমন ছিল? তারা ইবাদতের সেই উন্নত মানে উপনীত ছিলেন যা ছিল আমাদের জন্য আদর্শ। শুধু ফরয বা আবশ্যক ইবাদত নয় বরং পুরো প্রস্তুতির সাথে তারা নফলও পড়তেন। আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতার ক্ষেত্রে তারা এমন উন্নত মানে ছিলেন যা দেখে আশ্চর্য হতে হয়।

হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ সম্পর্কে হাদীসে আছে যে, তিনি ব্যবসা বাণিজ্য আরম্ভ করেন, আর তার ব্যবসা এত লাভজনক প্রমাণিত হয় যে, তিনি নিজেই বলতেন, আমি যে বস্তুতেই হাত দিতাম আল্লাহ্ তা'লা তাতে এত বরকত রেখে দিতেন যা ছিল কল্পনাতীত। আমার স্পর্শে মাটি সোনা হয়ে যেত। তাকে আল্লাহ্ তা'লা অশেষ ধন ভান্ডার দিয়েছেন, কিন্তু সেই সম্পদ পাওয়ার পরও তার আচরণ কেমন ছিল? তা কি বস্তুবাদি মানুষের ন্যায় ছিল? একদিন তিনি রোযা রেখেছিলেন। ইফতারির সময় যখন তার জন্য দস্তরখান অর্থাৎ খাবারের বিছানা বিছানো হয় তখন সেখানে বিভিন্ন প্রকার খাবার দেখে তিনি কাঁদা আরম্ভ করেন এবং কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন, আর ইসলামের প্রথম যুগের কথা স্মরণ করেন যখন দিনের পর দিন মানুষকে অনাহারে কাটাতে হতো। তার নিজের অবস্থাও তেমনই ছিল কিন্তু সেদিন তার দস্তরখানে হরেক রকম খাবার দেখে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তখন সেই সমস্ত সাহাবীদের কুরবানীর কথা স্মরণ হয় যখন যুদ্ধের ময়দানে তারা শহীদ হতেন তখন তাদের জন্য পর্যাপ্ত কাফন ছিল না। আর যে চাদর ছিল তা এত ছোট যে, মাথা ঢাকলে পায়ে কোন সতর থাকতো না আর পা ঢাকলে মাথা খোলা পড়ে থাকতো।

তো এই হলো সেই নমুনা। আমাদের মাঝে এমন কয়জন আছে যারা সাচ্ছন্দ আসার পর নিজেদের পূর্বের সময়কে এভাবে সচেতনতার সাথে স্মরণ করে। কয়জন আছে যারা খোদার প্রতি কৃতজ্ঞতার চেতনা নিয়ে সাচ্ছন্দ লাভের পর সত্যিকার অর্থে তাঁর ইবাদতের প্রতি মনোযোগ দেয় এবং পূর্বের চেয়ে বেশি মনোযোগ নিবদ্ধ করে। যদি আমাদের জীবনের মান উন্নত হওয়া, আর্থিক সচ্ছলতা আসা আমাদেরকে খোদার কৃতজ্ঞ বান্দা এবং তাঁর প্রকৃত ইবাদতকারী বান্দায় পরিণত না করে তাহলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন যে, আমার হাতে বয়আত করে সেই লক্ষ্য তোমার অর্জন হয়নি, তুমি সেই লক্ষ্য অর্জন কর নি যার আশা তোমার কাছে ছিল।

হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ এর দৃষ্টান্ত আমি দিয়েছি। ধন-সম্পদ এবং খোদা তা'লার নিয়ামতরাজির কারণে তিনি কেবল মৌখিকভাবেই কৃতজ্ঞ হন নি বরং খোদা তা'লার পথে সম্পদ খরচের কত বড় মন ছিল তার এবং কিভাবে নিজের ব্যবহারিক আচরণে তিনি এটি প্রমাণ করেছেন তার একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে। আসলে অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে কিন্তু যাহোক, একবার সাত শত উট ভর্তি খাদ্য শস্য এবং অন্যান্য সাজ সরঞ্জামে সজ্জিত কাফেলা মদিনায় আসে। তিনি সেই পুরো খাদ্য শস্য উটসহ আল্লাহ্ তা'লার পথে উৎসর্গ করেন। প্রশ্ন হলো এই কুরবানী এবং এই ত্যাগের ফলে তার সম্পদে কোন ঘাটতি এসেছে কি? বা তিনি কি কখনও এটি ভেবেছেন যে, আমি আল্লাহ্ তা'লার পথে অনেক কিছু করে ফেলেছি? না বরং এরপরও তিনি কুরবানী অব্যাহত রাখেন। আর খোদা তা'লা তাকে এত সম্পদ দিয়েছিলেন যে, বলা হয় মৃত্যুর সময় তার কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি ছিল এবং অঢেল ধন সম্পদের মালিক ছিলেন তিনি।

সুতরাং তারা এই পৃথিবীতেই থাকতেন, এই সমাজেই ব্যবসা বাণিজ্য করতেন, কিন্তু তাদের দৃষ্টিতে খোদা ছিলেন সবার আগে, তাদের আচার আচরণে খোদা তা'লাই অগ্রাধিকার পেতেন। তার নামাযে তার ইবাদতে বিশেষ পরিস্থিতি বিরাজ করতো। বলা হয় যে, যোহরের পূর্বেও তিনি নফল পড়তেন এবং আযানের ধ্বনি শুনে মসজিদের দিকে অগ্রসর হতেন। এক ব্যবসায়ী মানুষের জন্য এটি সত্যিই কঠিন কাজ। কেননা দিনের এই অংশেই বেশির ভাগ ব্যবসা বাণিজ্য হয়ে থাকে। কিন্তু তিনি তার রাতের নফল এবং দিনের নফল ইবাদতকে তার জাগতিক চাওয়া পাওয়া এবং ব্যবসা বাণিজ্যের ওপর কখনো রাজত্ব বা কর্তৃত্ব করতে দেননি।

আজ এই মানের সম্পদশালী জামাতে থাকলেও বরং অনেক কম মানের সম্পদশালীও যদি হয়ে থাকে তাহলে নফল পড়া তো দূরের কথা, যোহরের নামাযের জন্যও তারা বড় কষ্টে সময় বের করে। আর নামায পড়লেও এমনভাবে পড়ে যেন কোন বোঝা মাথায় ছিল যা ছুড়ে ফেলেছে। সুতরাং আমাদের যারা সম্পদশালী, যারা সচ্ছল, যারা ধনী ব্যবসায়ী এবং জাগতিক ব্যস্ততায় যারা নিমজ্জিত এমন লোকদের স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদের সব কাজে প্রাধান্য পান। আমাদের সামনে যেন সাহাবাদের নমুনা থাকে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের কাছে এটিই দেখতে চেয়েছেন। আর এ কথার ওপর জোর দিতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন যে, আমাদের জামাতের শুধু কথার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না, এটি আসল উদ্দেশ্য নয় বরং আত্মশুদ্ধি এবং সংশোধন আবশ্যক যে উদ্দেশ্যে বা যার জন্য খোদা তা'লা আমাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তিনি বলেন, ইসলাম একটি বৃক্ষ আর তোমরা সেই বৃক্ষের শাখা প্রশাখা। তোমরা দৃঢ়চিত্ততা, অবিচলতা এবং নিজেদের আদর্শের মাধ্যমে এই বৃক্ষের সংরক্ষণ বা রক্ষনাবেক্ষণ কর। আরেক জায়গায় তিনি বলেন, ইসলামের হিফাযত এবং সত্য প্রকাশের জন্য সর্বপ্রথম এই দিকটি সামনে রাখা চাই যে, তোমরা সত্যিকার এবং প্রকৃত মুসলমানের দৃষ্টান্ত হয়ে যাও।

এরপর দ্বিতীয় দিক হলো এর সৌন্দর্য্য এবং এর গুণাবলীকে পৃথিবীতে প্রচার এবং প্রসার কর। অতএব এটি অনেক বড় এক দায়িত্ব যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের কাঁধে ন্যাস্ত করেছেন। প্রথমত আত্মশুদ্ধি বা নিজেকে পবিত্র করা, এটি এক সংগ্রাম চায়। এর জন্য এক চেষ্টা প্রচেষ্টার প্রয়োজন। বর্তমানে পৃথিবীর মানুষের চাওয়া পাওয়া এত নোংরা এবং এত বাজে যে খোদার ফযল ছাড়া এগুলো থেকে বাঁচা সম্ভব নয়। তাই

আত্মশুদ্ধির জন্য, নিজেকে পাক করার জন্য চেষ্টা এবং খোদার সাহায্যের প্রয়োজন। আমরা যখন নিজেদের প্রবৃত্তির নোংরামির বলয় থেকে বেরিয়ে আসব, আমরা যখন নিজেদের জন্য নমুনা বা রোল মডেল হিসেবে দুনিয়ার কোন কীটকে নয় বরং সাহাবাদেরকে নিব তখনই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সেই লক্ষ্য আমরা অর্জন করতে পারব যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন। তিনি বলেন, ইসলাম একটি বৃক্ষ। কিন্তু এই বৃক্ষের সৌন্দর্য্য তখনই প্রকাশ পায় যখন বৃক্ষের শাখাগুলো সবুজ এবং সুন্দর হয়ে থাকে।

সুতরাং প্রত্যেক আহমদীর নিজের মাঝে এই সচেতনতা সৃষ্টি করা উচিত যে, তাকে ইসলাম রূপী বৃক্ষের সবুজ এবং জীবন্ত শাখায় পরিণত হতে হবে, আর এটি তখনই সম্ভব যখন সেই বিশেষত্ব সৃষ্টি হবে যা কোন বৃক্ষের সতেজ সবুজ শাখার জন্য আবশ্যক। ইসলামী বৃক্ষের সতেজতা হলো সেই শিক্ষা যা আল্লাহ্ তা'লা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি নাযেল করেছেন। সুতরাং এই শিক্ষা শিরোধার্য করে, এই শিক্ষাকে অবলম্বন করে এবং এমন উন্নত মান অর্জন করে তা পৃথিবীকে দেখানো প্রত্যেক আহমদীর জন্য আবশ্যক। এই নমুনা বা দৃষ্টান্ত যদি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, এই বৃক্ষের সতেজতা এবং সৌন্দর্য যদি স্বীয় আকর্ষণ এবং সেই সৌন্দর্য ছড়াতে থাকে তাহলে এই শিক্ষার অন্যদেরও লাভবান কর, কল্যাণমন্ডিত কর। পৃথিবী আজ এর জন্য ব্যাকুল। যেভাবে পূর্বেও বলা হয়েছে যে, কোন মডেল বা নমুনা ছাড়া, কোন দৃষ্টান্ত বা আদর্শ হওয়া ছাড়া আমরা পৃথিবীর কোন উপকার করতে পারবো না। আজ মুসলমান বিশ্বেরও এই নমুনার প্রয়োজন রয়েছে। তাদের পারস্পরিক যুলুম এবং অত্যাচার শুধু ইসলামকেই দুর্নাম করেনি বরং মৌলিক মানবিক মূল্যবোধকেও পদদলিত করেছে।

আজ মুসলিম বিশ্বে মানবতা সংহারী সেই যুলুম এবং অত্যাচার হচ্ছে যা দেখে মানুষের লোম শিউরে উঠে। এমনকি এই ঈদের দিনেও, যে দিনটিকে আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের সমবেত হয়ে আনন্দ উৎসবের জন্য নির্ধারণ করেছেন, মুসলমান মুসলমানকে হত্যা করে, শিশু এবং নিষ্পাপ লোকদের প্রাণ নিয়ে এই দিনটিকেও তারা শোকের দিনে পরিণত করেছে। আর এটি নিয়ে তারা উল্লাস করছে যে, অনেক ভাল কাজ করেছি। তাদের কোন চেতনাই নেই। শুধু এই জন্য লোকদের হত্যা করা হচ্ছে যে, তোমরা আমার ফিরকার সাথে সম্পর্ক রাখ না, আমার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে তুমি একমত নও। বা বিভিন্ন সরকার নিজেদের ক্ষমতার আসনকে দৃঢ় করার জন্য যুলুম এবং অত্যাচার করছে। আর সরকার বিরোধীরা যুলুম করছে এজন্য যে, আমরা সরকারের পতন ডেকে আনতে চাই, তাই নিরীহ মানুষকে হত্যা করলে কোন অসুবিধা নেই। আর এর চেয়েও বড় যুলুম এবং অন্যায় হলো আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের নামে আর ইসলামের শিক্ষার নামে এসব অত্যাচার হচ্ছে। এহেন পরিস্থিতিতে ইন্না লিল্লাহ্ ছাড়া মানুষ আর কি বলতে পারে। আমরা আহমদীরা নিজেদের সীমিত পরিবেশে আদর্শ দেখালেও এ সমস্ত স্বার্থপরদের পক্ষ থেকে অগণিত যুলুম এবং অত্যাচার ইসলামের সুন্দর চেহারাকে কুৎসিত করে তুলে ধরে।

যদিও আমাদের জন্য তবলীগ আবশ্যক, দৃষ্টান্ত স্থাপন আবশ্যক, নমুনা দেখানো আবশ্যক, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে খোদার সাহায্য লাভের জন্যও অনেক দোয়া করার প্রয়োজন রয়েছে। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্থায়ী নমুনা বা দৃষ্টান্ত স্থাপন তখনই কাজে আসে যদি একই সাথে দোয়াও করা হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যেখানে এটি বলেছেন যে, ইসলামী শিক্ষার উৎকর্ষ দিকগুলোর প্রচার এবং প্রসার কর, সেখানে একই সাথে তিনি এটিও বলেছেন যে, ইসলামের উন্নতি এবং ইসলামের বিজয়ের জন্য দোয়াও একান্ত আবশ্যক। সুতরাং দোয়ার প্রতি সমধিক দৃষ্টি দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। আজ আমরা আহমদীরা যদি সত্যিকার ঈদ উদযাপন করতে চাই তাহলে আত্মজিজ্ঞাসা এবং আত্মবিশ্লেষণের চেতনা নিয়ে নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন এনে সত্যিকার ঈদের কল্যাণে কল্যাণমন্ডিত হওয়ার পাশাপাশি পৃথিবীকে যুলুম এবং অন্যায়ের গন্ডি থেকে বের করার জন্য দোয়ার গন্ডিকে যত বিস্তৃত করা যায় তা করা উচিত, যুলুম, অত্যাচার এবং নিষ্পেষনের শিকার উম্মতে মুসলেমাহ্কে সাহায্য করা উচিত এবং হৃদয়ের ব্যাকুলতা নিয়ে তাদের জন্য দোয়া করে আমাদের সত্যিকার ঈদ উদযাপন করা উচিত।

এছাড়া মোটের ওপর নির্লজ্জতা এবং স্বাধীনতার নামে পৃথিবী যেই পাপে নিমজ্জিত হচ্ছে এর ফলে তারা খোদার আযাবকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। তাদের জন্য সহানুভূতির পূর্ণ চেতনা নিয়ে অনেক দোয়া করুন। আজ আমরাই মানবতাকে সত্যিকার আনন্দের ভাগী করতে পারি, সত্যিকার সুখ দিতে পারি। সুতরাং আমাদের সুগভীর ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠার সাথে মুসলিম অমুসলিম সবার জন্য দোয়া করা উচিত। যারা যুলুম-অত্যাচার এবং দুঃখ-বেদনায় জর্জরিত এই ঈদের দিনে আমরা যদি তাদেরকে এই দুঃখ বেদনা থেকে বের করার জন্য যদি দোয়া করি তাহলে সেটিই প্রকৃত ঈদ হবে।

খোদা তা'লা আজও এবং কালও আমাদেরকে আমাদের এই দায়িত্ব পালনের তৌফিক দিন, আর এই দায়িত্ব পালন আমরা যেন অব্যাহত রাখি। পাকিস্তানের নির্যাতিত আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্‌র পথে যারা বন্দী রয়েছেন তাদের মুক্তির জন্য দোয়া করুন। সমস্যা কবলিত ও যুদ্ধ কবলিত অঞ্চলে বসবাসকারী আহমদীদের জন্য দোয়া করুন। যেকোনভাবে যারা সমস্যা কবলিত এমন আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এ সমস্ত দুশ্চিন্তা এবং উৎকণ্ঠা থেকে মুক্তি দান করুন। তারাও যেন সত্যিকার ঈদের আনন্দ উদযাপন করতে পারে।

সারা পৃথিবীর আহমদীদেরকে আমি ঈদ মোবারক জানাচ্ছি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে স্থায়ীভাবে সত্যিকার আনন্দের ভাগী করুন। (আমীন)

ভাষান্তর: **মওলানা মোবারিজ আহমদ সানী**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী

ইযালা-এ-আওহাম

(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(২২তম কিস্তি)

ইবনে-সাইয়াদের কপালে যখন 'কাফ-ফে-রে' (অক্ষরগুলো) লেখা ছিল না তখন তার সম্বন্ধে সন্দেহ করার কী কারণ ছিল? আর যদি লেখা- ছিল তাহলে তাকে প্রতিশ্রুত দাজ্জাল বলে বিশ্বাস না করারই-বা কী কারণ ছিল? কিন্তু অন্যান্য হাদীস থেকে এটা সুস্পষ্ট যে তার সম্পর্কে বিশ্বাস পোষণ করা হয় যে সে-ই প্রতিশ্রুত দাজ্জাল। অতএব সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) খোদার কসম খেয়ে বলেন, এখন এ বিষয়ে তাদের কোনো সন্দেহ নেই যে এ ব্যক্তিই হলো প্রতিশ্রুত দাজ্জাল। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামও পরিশেষে বিশ্বাস করলেন। কিন্তু চিন্তা করার ব্যাপার হলো, দাজ্জালের কপালে কাফ-ফে-রে অক্ষরগুলো লেখা সংবলিত হাদীস সহীহ্ হয়ে থাকলে প্রারম্ভিককালে ইবনে-সাইয়াদ সম্পর্কে স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কেন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে থাকলেন এবং কেন এ কথা বললেন যে, সম্ভবত এ ব্যক্তিই প্রতিশ্রুত দাজ্জাল বা অন্য কেউ হবে?

ধারণা করা হয় যে হয়তো তখন পর্যন্ত 'কাফ-ফে-রে' অক্ষরগুলো তার কপালে লেখা ছিল না। আমি অত্যন্ত বিস্মিত ও আশ্চর্যান্বিত যে সত্যি-সত্যি প্রতিশ্রুত দাজ্জালের আখেরী যুগে সৃষ্টি হওয়া নির্ধারিত হয়ে থাকলে অর্থাৎ সেই যুগে যখন মসীহ্ ইবনে-মরিয়ম স্বয়ং আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবেন, তখন আবার ঐ সময় আসার আগেই এ সন্দেহ-সংশয় কেনই-বা সৃষ্টি হলো? আর অধিকতর বিস্ময়কর হচ্ছে, ইবনে-সাইয়াদ এমন কোনো কাজও করে দেখায় নি যা প্রতিশ্রুত দাজ্জালের চিহ্নাবলীর মধ্যকার বলে বোঝা যেত। অর্থাৎ এই যেমন, বেহেশ্‌ত ও দোযখ তার সঙ্গে-সঙ্গে থাকা, ধন-সম্পদ ও রত্ন-ভান্ডার তার পেছনে-পেছনে ছুটে চলা, মৃতদের জীবিত করা, তার আদেশে মুষলধারে বারিবর্ষণ এবং বিরাণ ভূমি থেকে তার আদেশে শস্যোৎপাদন এবং সত্তর গজব্যাপী বিস্তৃত গাধায় তার আরোহণ।

এখন বড়ই কঠিন এ সমস্যা এসে দাঁড়ায় যে, আমরা যদি বুখারী ও মুসলিমের উল্লিখিত ওই সব হাদীসকে সহীহ্ বলে মেনে নেই যা দাজ্জালকে আখেরী যুগে নামায় (অর্থাৎ শেষ যুগে তার জাহির হওয়া নির্ধারণ করে –অনুবাদক), তাহলে এ উভয় সহীহ্ হাদীস-গ্রন্থে পরিবেশিত এই সব হাদীস মুওযূ' বা কৃত্রিম বলে সাব্যস্ত হয়। আর এই হাদীসগুলোকে সহীহ্ বলে নির্ধারণ করলে (এ সংক্রান্ত) অন্যগুলোকে 'মওয' বা কৃত্রিম বলে মানতে হয়। যদি এই পরস্পর বিরোধী ও সাংঘর্ষিক হাদীসসমূহ 'সহীহাইন' তথা বুখারী ও মুসলিমে না হয়ে বরং কেবল অন্য সব সহীহ্ (বলে গৃহীত) হাদীস-গ্রন্থে সংকলিত হতো, তা হলে হয়তো আমরা উক্ত গ্রন্থদ্বয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে অন্য গ্রন্থগুলোর হাদীসকে 'মুওযূ' ও কৃত্রিম বলে নির্ধারণ করতাম। কিন্তু এখন মুশকিল তো এই দাঁড়িয়েছে যে, হাদীসের এ প্রধান দু'টি গ্রন্থে উক্ত উভয় প্রকারের হাদীসসমূহ মওজুদ রয়েছে।

উভয় প্রকার এ হাদীসগুলোর দিকে দৃষ্টিপাতে আমরা যখন বিস্ময়ের ঘুর্ণিপাকে পড়ে যাই–এগুলোর কোন্‌টিকে সহীহ্ ও সঠিক এবং কোন্‌টি সহীহ্ ও সঠিক নয় বলে জ্ঞান করবো। তখন খোদা প্রদত্ত যুক্তি ও বিচার-বুদ্ধি আমাদের এই বিচার-নিষ্পত্তির পন্থা বাতলিয়ে দেয়, যে-সব হাদীসের ওপর যুক্তি এবং শরীয়তের (দিক থেকে) কোনো আপত্তি নেই সেগুলোকে সহীহ্ ও সঠিক বলে মেনে নেয়া উচিত। অতএব বিচার-নিষ্পত্তির এ পন্থা অনুযায়ী ইবনে-সাইয়াদের সপক্ষে বর্ণিত হাদীসসমূহ যুক্তিসম্মত বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা ইবনে সাইয়াদ

তার জীবনের প্রথম ভাগে নিঃসন্দেহে একটা দাজ্জালই ছিল। কিছু শয়তানী ক্রিয়াচক্রের সাথে সম্পর্কের দরুন তার মধ্যে কিছু অদ্ভুত ধরনের বিষয় প্রকাশিত হতো। এগুলোর দরুন অধিকাংশ মানুষ 'ফেৎনা' বা পরীক্ষামূলক বিভ্রান্তির কবলে পড়তো, কিন্তু পরবর্তীকালে ইবনে সাইয়াদ খোদাপ্রদত্ত হেদায়াত বা ঐশী পথনির্দেশনায় ইসলাম গ্রহণে সৌভাগ্যমন্ডিত হয় এবং শয়তানী পন্থা থেকে পরিত্রাণ পায়। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যেভাবে (স্বপ্নে) তাকে খানা-কা'বার তোওয়াফ করতে দেখেছিলেন সেভাবেই সে তোওয়াফও করলো। আর তার ব্যাপারে এমন কোনো বিষয় নেই যা প্রকৃতির নিয়ম ও যুক্তি বহির্ভূত। আর তার প্রশংসায় এমন কোনো অতিশয়োক্তিও করা হয়নি যা শিরকের মধ্যে পড়ে। কিন্তু আমরা যখন অন্য সব হাদীসে দৃষ্টিপাত করি, যা প্রতিশ্রুত দাজ্জালের জাহির হওয়ার সময়কাল এ পৃথিবীর শেষকাল বলে জানায়, তখন সে হাদীসগুলো এমন বিষয়বস্তুতে ভরা বলে প্রতীয়মান হয়, যা যুক্তির দিক দিয়েও সঠিক ও সহীহ্ সাব্যস্ত হতে পারে না এবং শরীয়তের দিক দিয়েও ইসলামী তৌহীদ বা একত্ববাদ সম্মতও নয়। সুতরাং আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত তথা দাজ্জাল জাহির হওয়ার সম্পর্ক মুসলিম শরীফ বর্ণিত একটি সুদীর্ঘ হাদীস এর অনুবাদসহ দর্শকদের সামনে তুলে ধরেছি। দর্শক নিজেরাই তা পাঠ করে অনুধাবন করতে পারেন, প্রতিশ্রুত দাজ্জাল সম্পর্কে যে-সব গুণ ও বৈশিষ্ট এতে উল্লিখিত আছে এগুলো যুক্তি ও শরীয়তের কতো পরিপন্থী।

এ বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কার যে আমরা যদি দামেস্ক সংশ্লিষ্ট হাদীসটিকে এর বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থে ধরে নিয়ে সহীহ্ এবং খোদা ও রসূলের মুখনিঃসৃত বাণী বলে মেনে নেই তাহলে এ কথার ওপর আমাদের ঈমান আনতে হবে যে, প্রকৃতপক্ষেই দাজ্জালকে এক রকম খোদায়ী বা ঐশ্বরিক শক্তি ও মর্যাদা দেয়া হবে এবং পৃথিবী ও আকাশ তার আজ্ঞা মেনে চলবে এবং খোদা তা'লার মতো কেবল তার ইচ্ছায় সবকিছু সংঘটিত হতে থাকবে। বৃষ্টিকে বলবে, 'বর্ষিত হও'-তাই বর্ষিত হবে। মেঘমালাকে আদেশ দেবে, 'অমুক দেশের দিকে যাও', তৎক্ষণাৎ চলে যাবে। পৃথিবীর বাষ্পসমূহ তার আদেশে আকাশের দিকে উত্থিত হবে। ভূমি যতোই লোনা ও খারযুক্ত হোক না কেন কেবল তার ইঙ্গিতেই উত্তম ও প্রথম শ্রেণীর ফসল উৎপন্ন করবে। মোটকথা, খোদা তা'লার যেমন এ মর্যাদা বর্ণিত আছে, "ইন্নামা আম্‌রুহু ইযা আরাদা শাইয়ান আঁ-ইয়াকুলা লাহু কুন্ ফা-ইয়াকুন।" [অর্থঃ 'নিশ্চয় তাঁর ব্যাপার এমনই যে যখন কোনো কিছুর ইচ্ছা করেন সে বিষয়ে বলেন 'হয়ে যা'। অতএব সেটি হয়েই যায়।' –অনুবাদক (সূরা ইয়াসীন ঃ ৮৩)]।

অনুরূপভাবে দাজ্জালও কি-না 'কুন ফা-ইয়াকুন' দ্বারা সব কিছু করে দেখাবে। কাউকে মৃত্যু দেওয়া এবং আবার জীবিত করা সবই তার ইখতিয়ারভুক্ত ও আয়ত্তে হবে। বেহেশ্‌ত ও দোযাখ তার সঙ্গে থাকবে। মোটকথা, পৃথিবী ও আকাশমন্ডলী তার মুঠোয় এসে যাবে এবং এক সময়কাল পর্যন্ত যা চল্লিশ বছর বা চল্লিশ দিন হবে সে সুষ্ঠুভাবে তার ইশ্বরত্বের কাজ চালাতে থাকবে। ঐশ্বরিক সব ক্ষমতা তার দ্বারা প্রকাশ পাবে। এখন আমি জিজ্ঞেস করি, এ হাদীসটির বাহ্যিক শব্দাবলী থেকে যে বিষয়বস্তু নির্ণিত ও প্রতিভাত হয় তা কি সেই তৌহিদ বা একত্ববাদের শিক্ষাসম্মত যা কুরআন করীম আমাদের দান করে? কুরআন মজীদের শত শত আয়াত কি সর্বদার জন্য চূড়ান্ত ও স্বতঃসিদ্ধ এ সিদ্ধান্তটি আমাদের শোনায় না যে, ধ্বংসশীল ও মৌলিকত্বে অন্তঃসারশূণ্য মানব কখনও ইশ্বরত্বের (খোদাসূলভ) এখতিয়ার ও ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে না? অতএব হাদীসটির শব্দাবলীকে যদি (আবশ্যকীয় ভাবে) বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থে ধরা হয় তবে তাতে করে কি কুরআন ঘোষিত তৌহিদের ওপর এক কলঙ্কের টিকা লেপন করা হয় না?!

আশ্চর্যের বিষয় যে, আমাদের তৌহিদবাদী ভাইয়েরা একদিকে বুক ফুলিয়ে বলে থাকেন যে তারা সর্বতোভাবে শির্ক থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। অংশীবাদিতাকে সম্পূর্ণ পরিহার করেছেন। অন্যেরা সবাই মুশরিক ও বেদা'তি। তারাই কেবল তৌহিদে প্রতিষ্ঠিত ও সুন্নতানুসারী। সবার সামনে তারা সগর্বে তাদের এই তৌহিদবাদী পন্থার সবিশেষ প্রশংসাও করে থাকেন। কিন্তু একই সাথে এমন সব শির্কপূর্ণ আকিদা-বিশ্বাস তাদের হৃদয়পটে জমে রয়েছে যে তারা একজন তুচ্ছ (খোদা ও রসূলের অস্বীকারকারী) কাফিরকে তথা দাজ্জালকে খোদার 'উলুহিয়াত' বা ইশ্বরত্বের গোটা সিংহাসন সমর্পন করে দিয়েছেন! একজন স্বভাবতঃ দুর্বল কাঠামোয় সৃষ্ট মানুষকে তার মাহাত্মে ও ক্ষমতায় খোদা তা'লার সমকক্ষ বলে ধরে নিয়েছেন! আওলিয়াদের 'কিরামত' সমূহের অস্বীকারকারী হয়ে বসেছেন! কোনো ব্যক্তি যদি তাদের বলে যে সৈয়্যদ আব্দুল ক্বাদের জীলানী (কুদ্দিসা সিররুহু) বারো বছর ধরে নিমজ্জিত নৌকা জীবিত আরোহীদের সহ (নদীগর্ভ থেকে) তুলে বের করে আনলেন আর তেমনি রাগান্বিত হয়ে তিনি 'মালাকুল মওত' ফিরিশ্‌তার পা এজন্য ভেঙ্গে দিয়েছিলেন যে সে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কোনো মুরিদের 'রূহ্' কবজ করে নিয়ে গিয়েছিল তাহলে এসব কিরামত তারা কখনও মেনে নেবেন না। বরং এসব বিবরণ সংবলিত মুনাজাত পাঠকারীদের তাঁরা মুশরিক বলে আখ্যায়িত করে থাকেন।

কিন্তু অভিশপ্ত দাজ্জাল সম্পর্কে তারা প্রকাশ্যে এ বিশ্বাস পোষণ করেন যে, শুধু 'মালাকুল-মওত' কেন, সমস্ত ফিরিশ্‌তা তথা পৃথিবী ও আকাশ জুড়ে চন্দ্র, সূর্য, মেঘপুঞ্জ, বায়ুমন্ডল ও নদ-নদী ইত্যাদির ওপর সংরক্ষণমূলক দায়িত্বে নিযুক্ত সমগ্র ফিরিশ্‌তাকূল দাজ্জালের আজ্ঞাবাহকে পরিণত হবে এবং পরম আনুগত্যের সাথে তার সামনে সেজদাবনত হবে! চিন্তা করা উচিত, এ যে কত বড় শির্ক, যার কোনো কুল কিনারা খুঁজে পাওয়া যায় না! আক্ষেপ! এ সকল লোকের হৃদয়ের ওপর এ কী ধরনের পর্দা পড়ে গেল যে তারা রূপকাশ্রিত বর্ণনাগুলোকে আক্ষরিক অর্থে বাহ্যিক ও বাস্তব বলে ধরে নিয়ে শির্কের এক প্রচন্ড ঝড় তুলে দিয়েছেন?! জোরালো কারণ ও প্রমাণসমূহ থাকার

দরুন এসবই যে 'ইস্তিয়ারা' তথা উপমামূলক রূপক ভাষা তা তারা মানতে চান না, যদিও এগুলোর ক্ষেত্রে কুরআন মজীদ তৌহীদের নিক্ষেষিত অসি নিয়ে দন্ডায়মান।

আক্ষেপ! অধিকাংশ মানুষ শুষ্ক মোল্লাদের অনুসরণ করে থাকে এবং জানে না, এরূপ বিষয়াবলীকে বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করায় কী ভীষণ খারাপি ছড়াবে। সেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম (আমার মাতা-পিতা তাঁর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত), যিনি আমাদের 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'-এর (তথা তৌহিদের) শিক্ষা দান ক'রে 'গাইরুল্লাহ্' তথা মহান আল্লাহ্ ছাড়া সমস্ত কিছুর যাবতীয় শক্তিকে আমাদের পদতলে স্থান দিয়েছেন এবং একজন মহাপরাক্রমশালী উপাস্যের আঁচল ধরিয়ে দিয়ে মহান আল্লাহ্ ছাড়া সমস্ত কিছুর মূল্য একটি মৃত কীটের চেয়ে তুচ্ছ ও নিম্নতর বলে সাব্যস্ত করেছেন, সেই মহাপবিত্র নবী (সাল্লাল্লাহুঃ) কি আমাদের ভীত-ত্রস্ত করার উদ্দেশ্যে আখেরী যুগের জন্য এই 'জুজু' (কাল্পনিক ভীতিপ্রদ বস্তু) ছেড়ে গেছেন?!

পুনরায় বলছি, সেই তৌহিদে বিশ্বাসী ও একত্ববাদের পতাকাবাহীদের সম্রাট (সা.) যিনি আমাদের শিরায় শিরায় ও রন্ধ্রে রন্ধ্রে সর্বকালের জন্য (এ শিক্ষা ও বিশ্বাস) সঞ্চারিত করেছেন যে, খোদা তা'লার ঐশ্বরিক শক্তি নিচয় কোনো সৃষ্টজীবে আসতেই পারে না, তিনি কি তাঁর নিরবচ্ছিন্ন এ ধারায় প্রদত্ত শিক্ষার পরিপন্থী ওরূপ কোনো সবক (পাঠ) পড়াতে যাবেন?! অতএব হে আমার প্রিয় ভ্রাতাগণ! নিশ্চিত জেনে নাও যে, এ হাদীসের বা এর অনুরূপ অন্যান্য হাদীসের আক্ষরিক ও বাহ্যিক অর্থ কখনও বোঝায় না। জোরালো কারণ ও প্রমাণসমূহ এক কোষমুক্ত তলোয়ারের ন্যায় (অন্তরায় হয়ে) এ রাস্তার দিকে যেতে বাধা দিচ্ছে। বরং গোটা হাদীসটি ঐ সব কাশফ বা দিব্যদর্শনের শ্রেণীভুক্ত, যার প্রত্যেক শব্দ ব্যাখ্যা সাপক্ষ হয়ে থাকে।

যেভাবে আমি সহীহ্ মুসলিমের অন্য একটি হাদীস উদ্ধৃত করে একটু আগেই প্রমাণ করে এসেছি যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিজে একথা ইরশাদ করেন যে তাঁর এ যাবতীয় বর্ণনা তাঁর কাশফ ও দিব্যদর্শনের অন্তর্গত। দামেস্ক সংশ্লিষ্ট হাদীসটিতেও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে যে 'কা-আন্নি' ('যেন আমি') শব্দ-গুচ্ছটি মওজুদ রয়েছে, এটিও উচ্চৈস্বরে বলে দিচ্ছে যে, এ যাবতীয় বিষয় 'রোইয়া' (সত্যস্বপ্ন) ও কাশফ সম্পর্কিত জগতের অন্তর্গত। এর যাবতীয় কথার সমীচীন ভাবে ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। অতএব মোল্লা (ইমাম) আলী ক্বারীও তা-ই লিখেছেন। বস্তুত খোদা তা'লার সৃষ্ট প্রাকৃতিক নিয়ম পবিত্র কুরআনের আয়াত ঃ "খুলিক্বাল ইনসানু যায়ীফা" [অর্থঃ 'মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।' [(সূরা নিসা ঃ ২৯) –অনুবাদক] অনুযায়ী মানুষের সৃষ্টিগত দুর্বলতার সপক্ষে প্রকাশ্য ও সবাক সাক্ষ্য স্বরূপ রয়েছে। যা কোনো মনুষ্য সন্তানের ক্ষেত্রে এরকম শক্তিমত্তা স্বীকার করে না যে, সে 'জুজু'-এর মতো মুহূর্তের মধ্যে (নিজস্বভাবে) বিশ্বের পূর্ব-পশ্চিমে বিচরণ করতে পারে এবং আকাশের সব নক্ষত্র ও পৃথিবীর সব অনু-পরমানু তার আজ্ঞা- বাহক হবে!!

অদ্ভুত ব্যাপার যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন নিজেই ইরশাদ করেছেন যে এ হাদীসটির বিষয়বস্তু কাশ্‌ফ ও রুইয়া-সালেহা'র শ্রেণীভুক্ত অর্থাৎ তা'বির ও ব্যাখ্যা সাপেক্ষে, তখন আর কেনই-বা খামোখা এর বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থের ওপর জোর পূর্বক চাপ দেওয়া হয় এবং কেন স্বপ্নের (তা'বিরের) মতো এর তা'বির (ব্যাখ্যা) করা হয় না? অথবা 'মুতাশাবেহ্ কাশ্‌ফ' তথা সাদৃশ্যমূলক বিষয় সংবলিত দিব্যদর্শনের মতো এর মূলতত্ত্ব খোদা তা'লার (মহাপ্রজ্ঞার) ওপর সমর্পণ করা হয় না? (অর্থাৎ এগুলো তিনি যখন ও যেভাবে ইচ্ছা বাস্তবে পূরণ করবেন)। জাকারিয়া বা যোহনের পুস্তকে, যা (তৌরাতে) মালাকি (নবীর পুস্তক)-এর পূর্বে রয়েছে–এতে এ প্রকারেরই কতো 'কাশ্‌ফ' বা দিব্যদর্শন লিপিবদ্ধ রয়েছে, কিন্তু কোনো বিবেকবান জ্ঞানী ব্যক্তি এগুলোকে আক্ষারিক ও বাহ্যিক অর্থে টেনে নিয়ে যান না। অনুরূপভাবে খোদা তা'লার সঙ্গে হযরত ইয়াকুবের কুস্তি লড়ার বিবরণ যেমন তৌরাতে লেখা আছে, কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিই সে-কাশ্‌ফ বা দিব্যদর্শনটিকে কখনও বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করতে পারেন না।

অতএব হে ভ্রাতাগণ! আমি আল্লাহ্‌র খাতিরে হিতাকাঙ্খী হিসাবে আপনাদের প্রতি এবং নিজ প্রিয় দ্বীনে-ইসলামের প্রতি আমার পরম সহানুভূতির তাড়নায় আপনাদের বোঝাচ্ছি, আপনারা যে কেবল জবরদস্তিমূলক ভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাশ্‌ফ বা দিব্যদর্শনসমূহকে আক্ষরিক ও বাহ্যিক অর্থে সীমাবদ্ধ বলে নির্ধারণ করে বসেছেন এটা করে আপনারা (প্রকৃতপক্ষেই) ভুল করেছেন বরং মারাত্মক ভুল করেছেন। নিশ্চিৎ জানবেন যে উক্ত বিষয় ও কথাগুলোকে আক্ষরিক ও বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করায় আপনারা নিজেদের ঈমানী সৌধের ইট খসে ফেলার মত কাজ করছেন। আমি বিস্মিত যে, আপনারা 'ইস্তিআরা' তথা রূপকার্থে এ বর্ণনাগুলোকে গ্রহণ করতে না পারলে কেন এই বোধগম্যাতাতীত বিষয়াবলীর তফসীর ও ব্যাখ্যাকে খোদা তা'লার প্রজ্ঞা ও কর্তৃত্বের ওপর ছেড়ে দেন না যাতে তিনি নিজেই এগুলোর প্রকৃত অর্থে বাস্তবায়িত করেন? এতে আপনাদের ও আপনাদের ধর্মীয় উত্তেজনা-উদ্দীপনার কী-বা ক্ষতি হতো? কে-ই-বা আপনাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে? অথবা কবে এবং কখনই-বা আপনাদের প্রতি রসূল করীম (সা.)-এর পক্ষ থেকে তাকিদ করা হয়েছে যে 'অবশ্য-অবশ্যই তোমরা এরকম শব্দাবলী কেবল বাহ্যিক অর্থেই গ্রহণ করবে?

আপনাদের এই ওজর যে, এ বিষয়ে অতীতের বুযূর্গানে-উম্মতের 'ইজ্‌মা' তথা সর্বসম্মত ঐকমত্য রয়েছে– এটি এক অদ্ভুত ওজর যা উপস্থাপন করতে গিয়ে আপনারা চিন্তা করেন নি যে, কোনো 'ইজ্‌মা' আছে বলে ধরে নিলেও তা কেবল বাহ্যিক শব্দাবলীর ওপর ইজ্‌মা হয়ে থাকবে। কিন্তু এমনটি কখনও হয়নি যে তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি হলপ করে এ অঙ্গীকার করেছিলেন যে এ হাদীসটির

শব্দবলী থেকে যে আক্ষরিক ও বাহ্যিক অর্থ প্রতীয়মান হয় প্রকৃতপক্ষে কেবল তাই বুঝায়। শ্রদ্ধাভাজন এ সকল বুযূর্গ তো উল্লিখিত হাদীসগুলো 'আমানত' তথা গচ্ছিত সম্পদ হিসেবে (ভবিষ্যৎ উম্মতের হাতে) তুলে দিয়েছেন এবং এগুলোর প্রকৃতস্বরূপ ও মূলতত্ত্ব খোদা তা'লার ওপর সমর্পণ করে এসেছেন এ বুযূর্গদের প্রতি ইজ্‌মা প্রতিষ্ঠার অপবাদ এমন অলীক ও ভিত্তিহীন যে এর কোনো প্রমাণ পেশ করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। আমি বলছি, 'ইজমা' তো দূরে থাক এ শ্রেণীর হাদীসগুলো সাধারণভাবেও সাহাবীদের মাঝে বিস্তার লাভ করে নি। স্বতঃস্পষ্ট যে, সকল সাহাবার যদি একথার ওপর ঐক্যমত হতো যে প্রতিশ্রুত দাজ্জাল শেষযুগে বের হবে এবং হযরত মসীহ্-ইবনে-মরিয়ম (আ.) তাকে হত্যা করবেন, তাহলে হযরত জাবের-বিন-আব্দুল্লাহ্ এবং হযরত উমর (রা.) হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর সামনে কেনই বা একথা বলতেন যে প্রতিশ্রুত দাজ্জাল যে আসবে-সে এই ইবন-সাইয়াদই বটে।

সে অবশেষে মুসলমান হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে মদীনা মুনোয়ারায় মারা যায়। হে ভ্রাতাগণ! এ হাদীসটি সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম উভয় গ্রন্থে লেখা রয়েছে। তাছাড়া আবু দাউদ ও বাইহাকীতে হযরত নাফে' (রা.) বর্ণিত হাদীসেও লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, হযরত উমর কসম খেয়ে বলতেন, 'খোদার কসম! এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই যে প্রতিশ্রুত দাজ্জাল এই ইবনে-সাইয়াদই বটে।' ভালো কথা এ শেষোক্ত হাদীসটি যদি বাদই দেন, এ কারণে যে এতে কেবল একজন সাহাবীর উল্লেখ আছে, হয়তো তিনি ভুল করে থাকবেন। কিন্তু পূর্বোক্ত সেই হাদীসটির সম্পর্কে কী ওজর উপস্থিত করবেন? –যেখানে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমর (রা.) নিজে রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সকাসে কসম খেয়ে বলেছিলেন, 'প্রতিশ্রুত দাজ্জাল এ ইবনে-সাইয়াদই বটে।' আর তা শোনার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নীরব থাকার এবং অস্বীকার না করার দরুন সেই কসমকে মোহরাঙ্কিত (সত্যায়িত) করেন এবং হযরত উমরের অভিমতের সাথে ঐক্যমত প্রকাশ করেন।

হযরত উমর (রা.)-এর মর্যাদা তো জানেন যে তা কতো বড়! এমন কি কখনও-কখনও তাঁর রায় বা অভিমতের অনকুলে কুরআন করমের আয়াত অবতীর্ণ হতো। আর তাঁর সপক্ষে এ মর্মে পবিত্র হাদীস রয়েছে যে, 'শয়তান উমরের ছায়া হতেও পালিয়ে যায়।' দ্বিতীয়ত এ হাদীসটিও রয়েছে ; 'আমার পরে কোনো নবী হলে উমর (নবী) হতেন।' তৃতীয়ত এ হাদীসটিও রয়েছে ঃ 'পূর্ববর্তী উম্মত সমূহে 'মুহাদ্দাস' (তথা ওহী-ইলহাম বা ঐশীবাণী প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ) হতে থাকেন। আমার উম্মতে 'মুহাদ্দাস' থাকলে তিনি হলেন উমর।' এখন ভেবে দেখুন, উমর (রা.)-এর উচ্চ মর্যাদার সাথে হযরত নোওয়াস বিন-সাম্'আন-এর কী-বা তুলনা?!

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের যে ব্যুৎপত্তি হযরত উমর (রা.)-কে দান করা হয়েছিল তার সাথে হযরত নোওয়াসের কী-বা তুলনা হতে পারে?! তদুপরি এ হাদীসটি হলো 'মুত্তাফাক আলাইহ্'– যা ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয়ে (তাদের সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ে) লিপিবদ্ধ করেছেন। আর নোওয়াস বর্ণিত দামেস্ক-সংশ্লিষ্ট হাদীসটি 'সহীহ্ মুসলিমে' লিপিবদ্ধ আছে–যে-হাদীসটিতে (এর আক্ষরিক অর্থ ধরে) দাজ্জাল সম্পর্কে এমন সব বৈশিষ্ট ও গুণাগুণ বর্ণিত হয়েছে যা জ্ঞান-বুদ্ধিসম্মত যুক্তি ও তৌহীদের পরিপন্থী। তা ছাড়া, হযরত উমর (রা.) কর্তৃক (ইবনে-সাইয়াদ সম্পর্কে) কসম খাওয়া এবং রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে সেটি অগ্রাহ্য ও প্রত্যাখ্যান না করায় এটাই সাব্যস্ত হয় যে, নিশ্চয়ই রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দৃষ্টিতে এবং সাহাবায়ে কিরামের দৃষ্টিতেও প্রতিশ্রুত দাজ্জাল ইবনে-সাইয়াদই ছিল। 'শারহুস্-সুন্নাহ্' বর্ণিত হাদীস থেকেও এটাই প্রমাণিত হয় যে, দীর্ঘকাল ব্যাপী সবসময় রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম স্বীয় উম্মতের ব্যাপারে ইবনে-সাইয়াদই প্রতিশ্রুত দাজ্জাল– এ বিষয়টির দরুন শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন ছিলেন।

এখন ইবনে-সাইয়াদের চিহ্নিত দাজ্জাল হওয়ার বিষয়টি যখন এমন চূড়ান্ত ও নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হল যে এতে কোনো রকম সন্দেহ-শংসয়ের অবকাশ থাকল না, তখন এ ক্ষেত্রে স্বভাবতঃ এ প্রশ্নের উদ্ভব হয় যে দাজ্জাল যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশাতেই জন্ম লাভ করে এবং ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার সৌভাগ্যে ভূষিত হয়ে পরিশেষে মদীনায় মারাও গেল তখন হযরত মসীহ্– যাঁর পুনরাগমনের মুখ্য উদ্দেশ্যই কি-না দাজ্জালকে বধ করা প্রকাশ (ব্যক্ত) করা হয় তাঁর হাতে আর কে নিহিত হবে? কেননা দাজ্জাল তো থাকলই না– যাকে তিনি হত্যা করবেন? অথচ এটাই বিশেষ এক খিদমত ছিল যা তাঁর ওপর অর্পণ করা হয়েছিল? এ প্রশ্নের উত্তর আমরা এ ছাড়া অন্য কোনো ভাবে দিতে পারি না যে, প্রতিশ্রুত দাজ্জাল (উল্লিখিত আক্ষরকি অর্থে) আখেরী যুগে আসবে– এটা একেবারে অসত্য।

এখন মোদ্দাকথা হলো, ইমাম মুসলিম পেশকৃত দামেস্ক-সংক্রান্ত এ হাদীসটি স্বয়ং মুসলিমের আরেকটি হাদীস দ্বারা আস্থার অযোগ্য বলে সাব্যস্ত হয় এবং স্বতঃস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে রিওয়ায়াতকারী নোওয়াস-বিন-সাম্'আন ঐ হাদীসটি বর্ণনা করায় ধোঁকা খেয়েছেন (বা ভুল করেছেন)। ইমাম মুসলিমেরই অবশ্য কর্তব্য ছিল, তিনি তাঁর বর্ণিত হাদীসটির পরিপন্থীতা নিজ হাতে রফা-দফা করতেন, কিন্তু তিনি যে এ স্ববিরোধের উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি এতে করে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি মুহাম্মদ-বিন-মুনকাদির বর্ণিত হাদীসটিকে একেবারে নিশ্চিত ও একান্ত নির্ভরযোগ্য, স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট মনে করতেন এবং নোওয়াস-বিন-সাম্'আন বর্ণিত হাদীসটিকে উপমা ও সাদৃশ্যমূলক, রূপকাশ্রিত বর্ণনার শ্রেণীভুক্ত বলে বিশ্বাস করেন, এর মূল-তত্ত্ব ও প্রকৃতস্বরূপ খোদা তা'লার ওপর সমর্পণ করতেন।

(চলবে)

ভাষান্তর : **মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.)

জুমুআর খুতবা

পবিত্র রমযান সংক্রান্ত বিভিন্ন মাসলা মাসায়েল

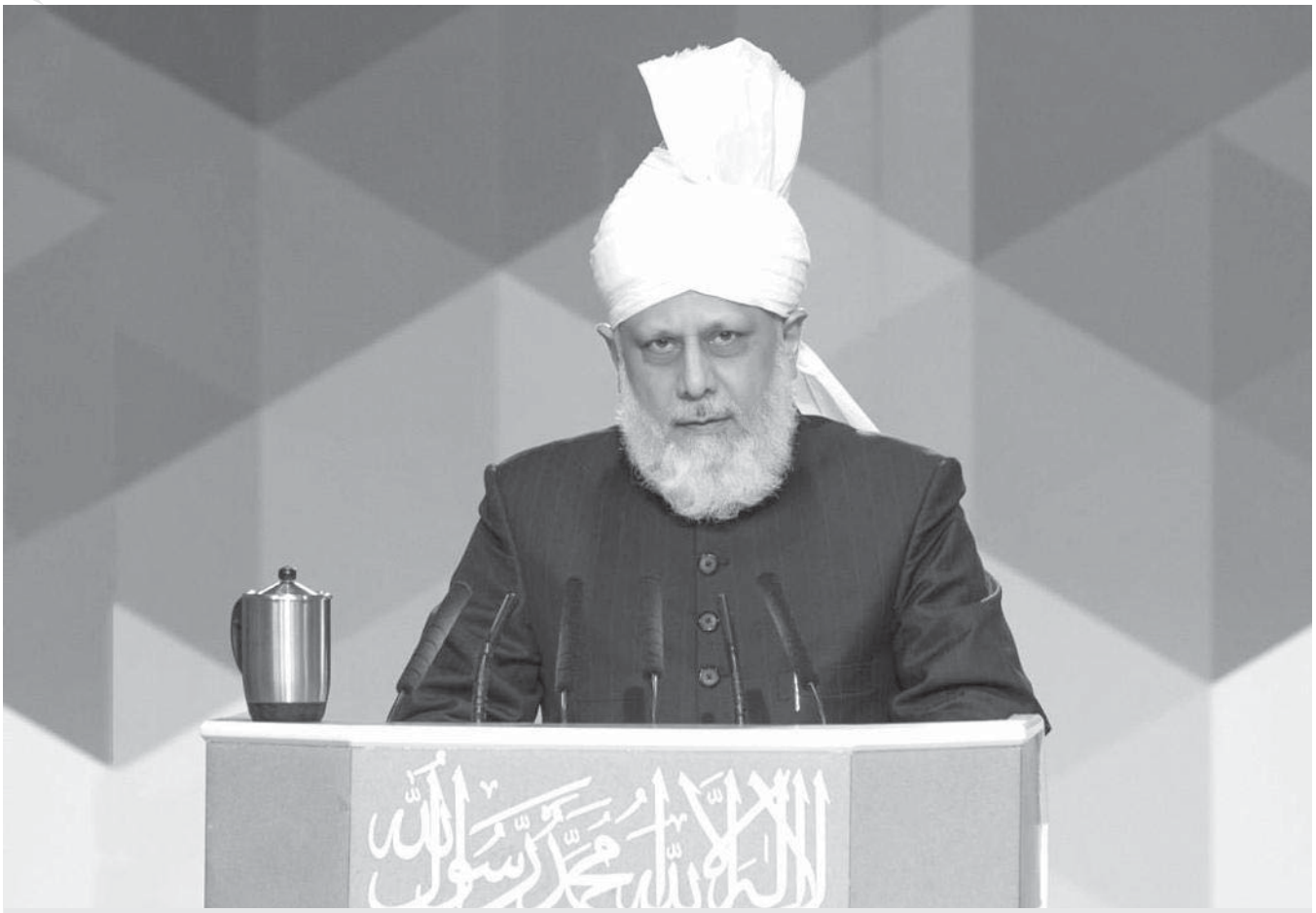

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৩ জুন, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা আগামী তিন-চার দিনের মধ্যে পবিত্র রমযান মাস আরম্ভ হতে যাচ্ছে। এই সময় দিন দীর্ঘ হওয়ার কারণে গ্রীষ্ম-প্রধান দেশগুলোতে রোযা রাখা খুবই কঠিন হয়ে থাকে, কিন্তু তাসত্ত্বেও প্রত্যেক সুস্থ এবং প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির জন্য রোযা রাখা আবশ্যক। অবশ্য কোন কোন পরিস্থিতিতে রোযা রাখার ক্ষেত্রে ছাড় দেয়া হয়েছে। গ্রীষ্ম-প্রধান দেশগুলোতে শ্রমিকদের ক্ষেত্রে বা অন্যান্য ক্ষেত্রেও রোযা রাখার পরিস্থিতি যদি অনুকূল না হয় তাহলে কিছু শর্ত স্বাপেক্ষে রোযা না রাখার ছাড় রয়েছে।

অনুরূপভাবে কিছু দেশ যেখানে আজকাল দিন ২২/২৩ ঘন্টা দীর্ঘ বা রাত মাত্র দেড় দুই ঘন্টার হয়ে থাকে, তা-ও পুরো রাত নয় বরং দিনের আলোই বিরাজ করে বা ঊষা ও গোধূলীর মত সময় হয়ে থাকে। তাই সেখানকার জামাতগুলোকে বলা হয়েছে তারা যেন সময়ের একটা ধারণা করে সেহেরি ও ইফতারের সময় নির্ধারণ করে নেয়। অধিকাংশ স্থানে পার্শবর্তী দেশের সময়ের ওপর নির্ভর করে বা

তাদের সময়ের ধারণা অনুযায়ী আজকাল প্রায় ১৮/১৯ ঘন্টার রোযাই হবে। যদি এসব দেশে এমনটি না করা হয় তাহলে সেহরি এবং ইফতারের মাঝে কোন সময়ই থাকবে না। তাহাজ্জুদও পড়া সম্ভব হবে না। আর ইশা এবং ফজরের নামাযের সময়ও নির্ধারণ করা সম্ভব হবে না। যাহোক, এসব অঞ্চলের জামাতগুলো এ অনুসারে নিজেরাই সিদ্ধান্ত করবেন যে, তারা কীভাবে সময় নির্ধারণ করবেন।

রোযা ইসলামের মৌলিক স্তম্ভগুলোর একটি, আর তা পালন করা আবশ্যক। রোযা সম্পর্কে কিছু ছোট ছোট প্রশ্নেরও অবতারণা হয়, সেহেরি-ইফতারের সময় সম্পর্কে, অসুস্থতা সম্পর্কে, অনুরূপভাবে মুসাফির সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয়ে থাকে। খোদার অপার কৃপায় প্রত্যেক বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ আমাদের জামাতে যোগ দেয়, মুসলমানদের বিভিন্ন ফির্কা ছাড়াও ভিন ধর্ম হতেও তারা এসে থাকে। মুসলমানদের বিভিন্ন ফির্কায় কিছু আদেশ বা শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন ফিকাহ্‌গত দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে। এসব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যখন তারা জামাতে প্রবেশ করে তখন কিছু বিষয়তাদের মাঝে অস্থিরতার সৃষ্টি করে, তারা এর কিছু ব্যাখ্যা চায়। অনেকেই বিস্তারিত আলোচনা চায়, আবার অনেকেই প্রশ্ন উত্থাপন করে। অনুরূপভাবে ভিন ধর্ম থেকে যারা আহমদীয়াত গ্রহণ করে তারা কিছু বিষয়ের আদৌ জ্ঞান রাখে না বরং তাদের জ্ঞান থাকেই না, তারা নতুনভাবে সবকিছু শিখে। তাই তাদের জন্য ইসলামের মৌলিক স্তম্ভগুলোর জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক।

এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে হাকাম এবং সুবিচারক বা ন্যায়-বিচারক হিসেবে পাঠিয়েছেন যার ইসলামী শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে সব বিষয়ের সিদ্ধান্ত প্রদানের দায়িত্ব ছিল এবং তিনি তা করেছেন। আর একইভাবে তাঁর সব সমস্যার সমাধান উপস্থাপন করার কথা ছিল আর তিনি তা করেছেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এ যুগে বিভিন্ন মাসলা-মাসায়েলের সমাধান এবং জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য আমাদের তাঁর মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি দেখা উচিত । রোযার দৃষ্টিকোণ থেকে যেসব প্রশ্ন উঠানো হয়, যেমনটি আমি বলেছি, সেই অনুসারে কিছু প্রশ্নের উত্তর বা এ সম্পর্কে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অবস্থান কী ছিল বা তিনি কী নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁর ফতওয়া কী ছিল, এখন আমি সে সম্পর্কে আলোচনা করব।

আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, এ যুগে শরীয়তের আদেশ নিষেধ সম্পর্কে তিনি (আ.)-এর নির্দেশ এবং দৃষ্টিভঙ্গীই আমাদের জন্য সেই বিষয়ের শরীয়ত-সংক্রান্ত সমাধান বা সিদ্ধান্ত। এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যেকথাটি স্মরণ রাখতে হবে তাহলো, ইসলামী শিক্ষা মেনে চলার বা অনুশীলনের ভিত্তি হলো তাক্বওয়া বা খোদাভীতি। তাক্বওয়াকে দৃষ্টিতে রেখে রোযা সংক্রান্ত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এই উক্তিকে সামনে রাখুন যে, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য নিষ্ঠার সাথে রোযা রাখ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কিছু মানুষ প্রশ্ন করে, কোন কোন বালক-বালিকা প্রশ্ন করে যে, আমরা রমযান এবং ঈদ ইত্যাদি গয়ের আহমদী মুসলমানদের সাথে একই দিনে কেন করি না বা ভিন্ন সময় কেন আরম্ভ করি?

প্রধানতঃ তাদের সাথে আমাদের ভিন্নতা অবশ্যই থাকতে হবে এমনটি আবশ্যক নয়, আমাদের রোযা আরম্ভ করা বা ঈদের দিন ভিন্ন হওয়া আবশ্যক নয়। আর এক্ষেত্রে জেনেশুনে আমরা কোন মতভেদও করি না। এমন বছরও এসেছে এবং এসে থাকে যে, আমাদের এবং অন্যান্য মুসলমানদের রোযা এবং ঈদ একই দিনে হয়ে থাকে। পাকিস্তানে এবং ইসলামী বিশ্বে যেখানে সরকারের পক্ষ থেকে চাঁদ দেখা কমিটি গঠিত হয়েছে, তারা যখন ঘোষণা দেয় যে, চাঁদ দেখা গেছে আর প্রত্যক্ষদর্শীর স্বাক্ষীও রয়েছে, আমরা আহমদী মুসলমানরাও সে অনুসারে আমাদের রোযা রাখি আর সে অনুসারেই আমাদের রোযা সমাপ্ত হয়, আর আমাদের ঈদও একই সাথে উদযাপিত হয়। ইউরোপিয়ান দেশে বা পাশ্চাত্যের দেশ সমূহে সরকারের পক্ষ থেকে এমন চাঁদ দেখা কমিটির ব্যবস্থা নেই আর এর ঘোষণাও করা হয় না, তাই আমরা চাঁদ দেখার স্পষ্ট সম্ভাবনাকে সামনে রেখে রোযা রাখা আরম্ভ করি এবং ঈদ করি। হ্যাঁ, যদি আমাদের ধারণা ভুল হয় আর চাঁদ পূর্বেই দেখা গিয়ে থাকে তাহলে বুদ্ধিমান, প্রাপ্তবয়স্ক ও মু'মিনদের স্বাক্ষ্য সাপেক্ষে, অর্থাৎ যারা চাঁদ দেখেছে তাদের সাক্ষ্য সাপেক্ষে পূর্বেই রোযা আরম্ভ করা যেতে পারে। যে চার্ট প্রণীত হয় আবশ্যক নয় যে, সে অনুসারেই রোযা আরম্ভ করতে হবে, কিন্তু চাঁদ স্পষ্টভাবে পরিদৃষ্ট হওয়া উচিত বা দেখা আবশ্যক। কিন্তু এই কথা বলা যে, আমরা অবশ্যই অ-আহমদী মুসলমানদের ঘোষণা অনুসারে চাঁদ না দেখে রোযা রাখতে আরম্ভ করব আর ঈদ করব এটি ভুল বা ভ্রান্ত রীতি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)- এই বিষয়টি তাঁর গ্রন্থ 'সুরমা চশমায়ে আরীয়া'-তে উল্লেখ করেছেন, হিসাব-কিতাব বা ধারণা ও অনুমানকে তিনি প্রত্যাখান করেন নি, এটিও বিজ্ঞান-সম্মত একটি জ্ঞানের শাখা, কিন্তু দেখাকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

আল্লাহ্ তা'লা ধর্মীয় শিক্ষাকে সহজসাধ্য করার জন্য সাধারণ মানুষকে পরিষ্কার এবং সোজা পথ সম্পর্কে অবহিত করেছেন। অনর্থক জটিলতার মাঝে ঠেলে দেন নি। যেমন, রোযা রাখার জন্য এই নির্দেশ দেন নি যে, যতক্ষণ তোমরা জ্যোতির্বিদদের হিসাব অনুসারে এটি নির্ধারণ করতে না পার যে, চাঁদ ২৯ না-কী ৩০ দিনের, ততক্ষণ দেখার বা রো'ইয়াতের বিষয়টিকে আদৌ বিশ্বাস করবে না। বিজ্ঞানীদের পক্ষ থেকে হিসাবের যে নিয়ম নির্ধারিত হয়েছে, জ্যোতির্বিদ্যা বা গ্রহ-নক্ষত্রের যারা জ্ঞান রাখে, তারা যে নিয়ম নির্ধারণ করেছেন সেসব নিয়ম অনুসরণ আবশ্যক নয়। তাদের হিসাব যদি এটি বলে যে, চাঁদ ২৯ বা ৩০ এর হয়েছে সেই অনুসারে রোযা রাখ, চাঁদ দেখার আদৌ চেষ্টা করো না বা চাঁদ দেখার বিষয়টি আদৌ বিশ্বাস করো না, এমনটি মনে করা ভুল। তিনি (আ.) বলেন, এমন যেন না হয় যে, দেখার বিষয়টিকে তোমরা আদৌ গুরুত্ব দেবে না আর চোখ বন্ধ করে রাখবে, এটি ভুল। জ্যোতির্বিদদের সূক্ষ্ম গবেষণা কর্মকে জনসাধারণের গলার হার বানিয়ে বসা একটি অপ্রয়োজনীয় সমস্যাকে আমন্ত্রণ

দেয়া এবং অনর্থক নিজেকে কষ্টের মুখে ঠেলে দেয়ার নামান্তর। শুধু এই কথার ওপর আমল করা যে, হিসাব এটি বলছে বা বিজ্ঞানের ধারণা এটি বলছে, আমরা এর বাহিরে আর কোন কিছু করবো না, এটি ঠিক নয়। তিনি বলেন, এমন ধারণা বা হিসাবের ক্ষেত্রে অনেক ভুল-ভ্রান্তি হয়ে থাকে। তাই সোজা এবং জনসাধারণের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কথা হলো, তারা যেন জ্যোতির্বিদদের মুখাপেক্ষী না থাকে অর্থাৎ যারা নক্ষত্র এবং গ্রহ-তারকার জ্ঞান রাখে তাদের মুখাপেক্ষী হয়ে যেন বসে না থাকে আর চাঁদ দেখার ওপর যেন নির্ভর করে। অর্থাৎ কোন তারিখে চাঁদ উদিত হয় তা নিশ্চিৎ হওয়ার জন্য যেন স্বয়ং দেখার ওপর নির্ভর করে। আর এতটুকু জ্ঞান থাকা আবশ্যক যে, দিনের সংখ্যা যেন ত্রিশের অধিক না হয়। চাঁদ দেখা আবশ্যক, কিন্তু দেখার চেষ্টা করার পরও যদি দেখা না যায় তাহলে জ্যোতির্বিদদের হিসাবের ওপর নির্ভর করা যেতে পারে। আর এই কথার ওপরও দৃষ্টি রাখা উচিত যে, দিনের সংখ্যা যেন ত্রিশের অধিক না হয়। তিনি বলেন, এটিও স্মরণ রাখা উচিত, যুক্তিগত দিক থেকে চাঁদ দেখার– জ্যোতির্বিদদের হিসাবের ওপর প্রাধান্য রয়েছে। যুক্তি বা বিবেকও একথাই বলে যে, চর্মচোখে দেখার বিষয়টি অঙ্কের হিসাবের ওপর অবশ্যই প্রাধান্য রয়েছে। ইউরোপের দার্শনিকেরাও চাঁদ দেখাকে বেশি নির্ভরযোগ্য মনে করার সুবাদে দৃষ্টিশক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন প্রকার অনুবীক্ষণ এবং দুর্বীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেছে। যেহেতু ইউরোপের শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান শ্রেণী এবং বিজ্ঞানীরা একথাকে নির্ভরযোগ্য জ্ঞান করেছে তাই তারা একে কাজে লাগিয়ে দুর্বীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেছে যার মাধ্যমে তারা মহাশূন্যকে দেখে।

আমি যেমনটি বলেছি, অনেক সময় হিসাবে ভুলও হতে পারে। আর যদি ভুল হয়ে যায়, দৃষ্টান্তস্বরূপ যদি প্রমাণিত হয় যে, চাঁদ একদিন পূর্বেই উদিত হয়েছে, এমন ক্ষেত্রে কোন্ নীতি অনুসৃত হওয়া উচিত? একটি রোযা তো বাদ পড়ল, আমরা একদিন পরেরমযান আরম্ভ করলাম, চাঁদ পূর্বেই দেখা গেছে আর প্রমাণও পাওয়া গেছে যে, চাঁদ পূর্বেই উদিত হয়েছে, এমন ক্ষেত্রে কি করতে হবে? এই প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে প্রশ্ন করা হয়। শিয়ালকোট থেকে এক বন্ধু জিজ্ঞেস করেন, এখানে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় চাঁদ দেখা যায় নি বরং বুধবারে দেখা গেছে অথচ বুধবারে রমযান আরম্ভ হয়ে গেছে। সেই এলাকায় মোটের ওপর এটিই হয়েছে আর এই কারণে বৃহস্পতিবারে প্রথম রোযা রাখা হয়। তিনি জিজ্ঞেস করেন, রোযা বুধবারে আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল কিন্তু আমাদের এখানে প্রথম রোযা রাখা হয়েছে বৃহস্পতিবারে এখন কি করা উচিত? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, এর জন্য রমযানের পর একটি রোযা রাখতে হবে, যে রোযা রয়ে গেছে তা রমযানের পর রাখ।

অনুরূপভাবে সেহেরি খাওয়ার বিষয় রয়েছে, সেহেরি খেয়ে রোযা রাখা আবশ্যক। মহানবী (সা.) আমাদেরকে এই নির্দেশই দিয়েছেন। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি (সা.) বলেছেন, রোযার সময় সেহেরি খেয়ো কেননা, সেহেরি খেয়ে রোযা রাখাতে কল্যাণ নিহিত আছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজেও এই রীতি অনুসরণ করতেন আর জামাতের সদস্যদের এবং বন্ধুদেরও একই নসীহত করতেন। অনুরূপভাবে কাদিয়ানে যেসব অতিথি আসতেন তাদের জন্য রীতিমত সেহেরির ব্যবস্থা থাকতো বরং খুব ভালোভাবে আয়োজন করা হতো।

এই সম্পর্কে হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, কপুরথলার মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব আমাকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন যে, আমি কাদিয়ানে মসজিদে মুবারকের সাথে সন্নিবেশিত কক্ষে অবস্থান করতাম। একবার আমি সেহেরি খাচ্ছিলাম তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আসেন, তিনি আমাকে সেহেরি খেতে দেখে বলেন, আপনি কি সেহেরির সময় ডাল-রুটিই খান? আর তখনই ব্যবস্থাপককে ডেকে এবং বলেন, সেহেরির সময় বন্ধুদের কি এমন খাবারই দেন? আমাদের যত বন্ধু আছে তারা সফরে নয় বরং এখানে অবস্থান করছেন আর রোযা রাখছেন, তাদের সবাইকে জিজ্ঞেস করুন, তাদের কী-কী খাওয়ার অভ্যাস আছে? সেহেরির সময় তারা যা খেতে পছন্দ করে সেই খাবার তাদের জন্য প্রস্তুত করা হোক। এরপর ব্যবস্থাপক আমার জন্য আরো খাবার নিয়ে আসেন কিন্তু আমি পূর্বেই খাবার শেষ করেছিলাম আর আযানও হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু হুযূর বলেন, খাও, আযান সময়ের পূর্বেই দেয়া হয়েছে, এই ব্যাপারে চিন্তা করো না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে তাহাজ্জুদ পড়া এবং সেহেরি খাওয়া সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বলেন, ডাক্তার মীর মোহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, ১৮৯৫ সনে পুরো রমযান মাস আমার কাদিয়ানে কাটানোর সৌভাগ্য হয়। আমি পুরো মাস হযরত সাহেবের পেছনে তাহাজ্জুদ বা তারাবী পড়েছি। তাঁর রীতি ছিল তিনি রাতের প্রথম ভাগে বেতের পড়ে ফেলতেন আর দুই-দুই রাকাত করে রাতের শেষ প্রহরে আট রাকাত তাহাজ্জুদ পড়তেন। আর এই নামাযে তিনি সবসময় প্রথম রাকাতে আয়তুল কুরসী তিলাওয়াত করতেন অর্থাৎ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ থেকে وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ (সূরা আল্-বাকারা: ২৫৬) পর্যন্ত পড়তেন আর দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস পাঠ করতেন। আর রুকু এবং সিজদায় 'ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম বিরাহমাতিকা আসতাগীস' প্রায়শঃ পড়তেন, আর এমন সুরে পড়তেন যে, তাঁর আওয়াজ শোনা যেত। এছাড়া সেহেরি সবসময় তিনি তাহাজ্জুদের পর খেতেন। আর সেহেরি খাওয়ার ক্ষেত্রে এত বিলম্ব করতেন যে, অনেক সময় খেতে খেতে আযান হয়ে যেত।

তিনি অনেক সময় আযান শেষ হওয়া পর্যন্ত খাবার অব্যাহত রাখতেন। এই অধম নিবেদন করে যে, সত্যিকার অর্থে যতক্ষণ সুবহে সাদিক পূর্ব দিগন্তে দেখা না যায় ততক্ষণ সেহেরি খাওয়া বৈধ। আযানের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। ফজরের আযানের সময়ও সুবহে সাদিকেরই সময় হয়ে থাকে, তাই মানুষ

সচরাচর আযানকে সেহেরির শেষ সীমা মনে করে। কাদিয়ানে যেহেতু সুবহে সাদিক উদিত হতেই ফজরের আযান হয়ে যায় বরং হতে পারে অনেক সময় ভুল বশতঃ বা অসাবধানতা বশতঃ এর পূর্বেও হয়ে যায়, তাই এমন সময় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আযানের প্রতি কর্ণপাত করতেন না বরং সুবহে সাদিক স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত সেহেরি খেতেন। সত্যিকার অর্থে শরীয়তের উদ্দেশ্য এটি নয় যে, হিসাবের দৃষ্টিকোণ থেকে যখন সুবহে সাদিকের সূচনা হয় তখনই খাবার ছেড়ে দেয়া উচিত, বরং শরীয়তের উদ্দেশ্য হলো, সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে সুবহে সাদিকের শুভ্রতা যখন প্রকাশ পায় তখন খাবার ছেড়ে দেয়া উচিত। 'তাবায়্যুন' শব্দ এদিকেই ইঙ্গিত করছে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেন, বেলালের আযান শুনে সেহেরি খাওয়া বন্ধ করবে না বরং ইবনে মাক্তূম এর আযান পর্যন্ত পানাহার অব্যাহত রাখ। ইবনে মাক্তূম যেহেতু অন্ধ ছিলেন তাই যতক্ষণ সকাল হয়ে গেছে বলে হৈচৈ আরম্ভ না হতো ততক্ষণ তিনি আযান দিতেন না।

গত বছর আমি এক বন্ধুকে বলেছিলাম, আপনি দীর্ঘক্ষণ সেহেরি খেতে থাকেন, একথা শুনে তিনি এরপর পুনরায় রোযা রাখেন। আমার কথা শুনেই হয়তো পরে আবার রোযা রেখেছেন। কিন্তু তিনি যদি সময়কে এর পরেও সম্প্রসারিত না করে থাকেন অর্থাৎ শুভ্রতা প্রকাশ পাওয়ার পর যদি সম্প্রসারণ না করেন তাহলে ঠিক আছে। এখনো সবাই এটি যাচাই করতে পারে। এখানে তো আযান হয় না, কিন্তু সুবহে সাদিক দেখা আবশ্যক। যখন প্রভাত উদিত হয় বা যখন শুভ্র রেখা প্রকাশিত হয় সেই সময় পর্যন্ত সেহেরি খাওয়া যেতে পারে।

সেহেরির সময় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আতিথেয়তা সংক্রান্ত আরেকটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে, হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, ডাক্তার খলীফা রশীদ উদ্দিন মরহুম সাহেবের স্ত্রী কাদিয়ানের লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র বরাতে লিখিতভাবে জানিয়েছেন যে, ১৯০৩ সনের কথা, আমি এবং মরহুম ডাক্তার সাহেব রাঢ়কী থেকে এখানে আসি, চারদিন ছুটি ছিল। হুযূর জিজ্ঞেস করেন, সফরে রোযা রাখেন নি তো? আমরা বললাম, না। হুযূর আমাদের থাকার জন্য গোলাপি কক্ষ বরাদ্দ করেন। ডাক্তার সাহেব বলেন, আমরা রোযা রাখব। তিনি (আ.) বলেন, ভালো কথা। এরপর বলেন, আপনারা সফরে আছেন। ডাক্তার সাহেব বলেন, কয়েকদিন এখানে অবস্থান করব তাই রোযা রাখার ইচ্ছা হচ্ছে। তিনি (আ.) বলেন, ঠিক আছে আমরা আপনাদেরকে কাশ্মীরি পরোটা খাওয়াবো। আমরা ভাবছিলাম, আল্লাহ্‌ই জানে, কাশ্মীরি পরোটা না জানি কেমন হয়। যখন সেহেরির সময় হয়, আর আমরা তাহাজ্জুদ ও নফল শেষ করি, এরপর খাবার আসে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) স্বয়ং সেই গোলাপি কক্ষে আসেন যা ঘরের নিচের তলায় অবস্থিত ছিল। হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব উপরের তিন তলায় থাকতেন। তার বড় স্ত্রী করিম বিবি সাহেবা যাকে মৌলভীয়ানী বলা হতো, কাশ্মীরি ছিলেন, তিনি ভালো পরোটা বানাতে পারতেন। হুযূর আমাদের জন্য তার হাতে পরোটা বানিয়েছিলেন। উপর থেকে গরম গরম পরোটা আসতো আর হুযূর (আ.) নিজেই আমাদের জন্য তা নিয়ে আসতেন এবং বলতেন, ভালো করে পেট ভরে খাও। আমার লজ্জা হচ্ছিল, ডাক্তার সাহেবও লজ্জিত ছিলেন, কিন্তু আমাদের ওপর হুযূরের স্নেহ এবং বদান্যতার যে প্রভাব ছিল তার ফলে আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আনন্দের স্পন্দন অনুভূত হচ্ছিল। ততক্ষণে আযান হয়ে যায়। হুযূর (আ.) আমাদের বলেন, আরো খাও, এখনো অনেক সময় আছে। তিনি (আ.) বলেন, কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

(সূরা আল্-বাকারা: ১৮৮) মানুষ এটি মেনে চলে না। আপনারা খান, এখনো অনেক সময় আছে। মুয়ায্যিন সময় হওয়ার পূর্বেই আযান দিয়ে দিয়েছে। তিনি বলেন, আমরা যতক্ষণ খাচ্ছিলাম হুযূর দাঁড়িয়ে ছিলেন বা পায়চারি করছিলেন। যদিও ডাক্তার সাহেব বলেন যে, হুযূর! বসুন, আমি পরিচারিকাকে দিয়ে পরোটা আনিয়ে নিব বা আমার স্ত্রী নিয়ে আসবে, কিন্তু হুযূর সে কথা মানেন নি বরং অতিথি সেবায় নিয়োজিত থাকেন। এই খাবারে তরকারীও ছিল এবং দুধ ও সেমাই ইত্যাদিও ছিল।

ভালো খাবার অবশ্যই খান কিন্তু এক্ষেত্রেও মধ্যম পন্থা বা ভারসাম্য বজায় রাখা আবশ্যক। রোযা রেখে এই সচেতনতাও থাকা উচিত যে, আমরা রোযা রেখেছি। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বরাতে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

(সূরা আল্-বাকারা: ১৮৬) এটি আমাদের জন্য অসহ্য যে, তোমরা ঈমান আনবে আর কষ্টে জর্জরিত থাকবে, তাই রোযা আবশ্যক করেছি, যেন তোমাদের কষ্ট এবং অস্বাচ্ছন্দ্য দূরীভূত হয়। এটি এমন একটি কথা যা মু'মিনকে মু'মিন বানায়। এ কথা স্মরণ রাখার যোগ্য যে, তিনি তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য বা সহজসাধ্যতা চান, কষ্ট নয়। এর ব্যাখ্যা কী? এটি এমন একটি গুণ বা যোগ্যতা যা মু'মিনকে মু'মিনে পরিণত করে। এর ব্যখ্যা হলো রোযায় ক্ষুধার্ত থাকা বা ধর্মের খাতিরে কুরবানী করা মানুষের জন্য ক্ষতির কোন কারণ নয় বরং এটি সম্পূর্ণভাবে কল্যাণকর বিষয়। যে মনে করে, রমযানে মানুষ ক্ষুধার্ত থাকে সে কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে কেননা; আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমরা ক্ষুধার্ত ছিলে, এ জন্য আমি রমযান নির্ধারণ করেছি যেন তোমরা রুটি খেতে পার। অতএব বোঝা গেল প্রকৃত রুটি বা খাবার হলো সেটি যা আল্লাহ্ তা'লা খাওয়ান। আর এর সাথেই প্রকৃত জীবনের সম্পর্ক, এছাড়া যেই খাবার রয়েছে তা রুটি নয়, পাথর, যা তার আহারকারীর জন্য ধ্বংসের কারণ। মু'মিনের জন্য আবশ্যক হলো, যে গ্রাশই তার মুখে যায়, দেখা উচিত যে, তা কার জন্য, যদি আল্লাহ্‌র জন্য হয়ে থাকে তাহলে সেটিই খাবার, আর যদি প্রবৃত্তির জন্য হয়ে থাকে তাহলে সেটি খাবার নয়।

সুতরাং সেহেরি যদি খোদার নির্দেশে

খাওয়া হয় আর ভালোও খাওয়া হয় তাহলে তা খোদার সন্তুষ্টির জন্য। আর মহানবী (সা.) যেভাবে বলেছেন, এতে কল্যাণ নিহিত থাকবে। আর যদি শুধু উদরপূর্তি করাই উদ্দেশ্য হয় আর ভালো খাবার খাওয়া উদ্দেশ্য হয়, স্বাদ পাওয়া উদ্দেশ্য হয় তাহলে তা প্রবৃত্তির জন্য। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এরপর ব্যাখ্যা করেন, সেটিই প্রকৃত পোষাক যা খোদার জন্য পরিধান করা হয়, প্রবৃত্তির জন্য যদি কেউ পরিধান করে তাহলে এমন ব্যক্তি নগ্ন। দেখ! কত সূক্ষ্মভাবে বলা হয়েছে, যতদিন আল্লাহ্‌র জন্য কষ্ট সহ্য না করবে ততদিন তোমরা সুযোগ পেতে পার না। এর মাধ্যমে সেসব লোকের ধারণাও খণ্ডিত হয় যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উক্তি অনুসারে রমযানকে মোটা হওয়ার মাধ্যম হিসেবে নেয়। কিছু মানুষ এমন আছে যাদের ওজন রমযানে কমার পরিবর্তে বৃদ্ধি পায়। হুযূর (আ.) বলতেন, অনেকের জন্য রমযান তেমনই যেভাবে ঘোড়ার জন্য 'খুয়েত' হয়ে থাকে, অর্থাৎ গম এবং ভুট্টার সমন্বয়ে পুষ্টিকর ঘোড়ার খাবার। এমন লোকেরা প্রায় সময় ঘি, মিষ্টি এবং তৈলাক্ত খাবার খেয়ে সেভাবে মোটা হয় যেভাবে 'খুয়েত' খেয়ে ঘোড়া মোটা হয়ে থাকে। এগুলো রমযানের বরকতকে হ্রাস করে। এখন দেখ, একদিকে নির্দেশ রয়েছে, সেহেরি খাও এতে বরকত বা কল্যাণ রয়েছে, ইফতারী খাও তাতেও বরকত নিহিত আছে, পক্ষান্তরে যদি শুধু খাদ্য পানীয়ই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে তা বরকত এবং কল্যাণকে হ্রাস করে। তাই ভারসাম্য বজায় রাখা আবশ্যক। ভালো খাবার খাও কিন্তু ভারসাম্য বজায় রেখে খাও।

সফর এবং অসুস্থতায় রোযা রাখা বৈধ নয়। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এক জায়গায় বলেন, আমার ভালোভাবে মনে পড়ে, খুব সম্ভব মির্যা ইয়াকূব বেগ সাহেব, যিনি আজকাল একজন নেত্রীস্থানীয় লাহোরী, একবার বাহির থেকে এখানে আসেন। আসরের সময় ছিল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) জোর দিয়ে বলেন, রোযা ভেঙ্গে ফেল, তিনি বলেন, সফরে রোযা রাখা বৈধ নয়। একইভাবে একবার অসুস্থতার প্রশ্ন আসলে তিনি বলেন, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী হলো, ধর্ম যে ছাড় দিয়েছে সেগুলো গ্রহণ করা উচিত। ধর্ম কাঠিন্য নয় বরং স্বাচ্ছন্দ্য শিখায়, সহজসাধ্যতা শিখায়। কেউ কেউ বলে, মুসাফির ও অসুস্থরা যদি রোযা রাখতে পারে তাহলে রাখা উচিত, আমরা একে সঠিক মনে করি না। এ প্রসঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) মুহীউদ্দীন ইবনে আরাবীর উক্তি শুনিয়েছেন যে, সফর এবং অসুস্থতায় রোযা রাখা তিনি বৈধ মনে করতেন না, তার দৃষ্টিতে এমন অবস্থায় রোযা রাখলে তা আবার পরে রাখা আবশ্যক। এটি শুনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, হ্যাঁ আমাদেরও একই বিশ্বাস বা একই দৃষ্টিভঙ্গী।

একবার বক্তৃতা করার সময় হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমাকে একটি প্রশ্ন করা হয়েছে, আর তাহলো, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) রোযা সম্পর্কে এই ফতওয়া দিয়েছেন যে, রোগী এবং মুসাফির যদি রোযা রাখে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে নির্দেশ লঙ্ঘনের ফতওয়া বর্তাবে। তিনি হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-কে বলেন, আল্ ফযলে আপনার পক্ষ থেকে এই ঘোষণা ছাপা হয়েছে যে, আহমদী বন্ধুরা যারা সালানা জলসায় আসবেন, তারা এখানে এসে রোযা রাখতে পারবেন। তখন জলসা সালানা হয় রমযান কিন্তু যারা রোযা রাখতে চেয়েছেন তারা রোযাও রেখেছে। তিনি লিখেন বা বলেন, যারা রোযা রাখবে না এবং পরে রাখবে তাদের বিরুদ্ধেও কোন আপত্তি বর্তাবে না, এই ঘোষণা ছাপা হয়েছে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, এ সম্পর্কে প্রধানতঃ আমি একথা বলতে চাই যে, আমার কোন ফতওয়া আল্ ফযলে ছাপেনি। হ্যাঁ, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন রেওয়ায়েতের বরাতে একটি ফতওয়া ছেপেছে। আসল কথা হলো, খিলাফতের প্রথম দিকে আমি সফরে রোযা রাখতে বারণ করতাম, কেননা, আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে দেখেছি, তিনি মুসাফিরকে রোযা রাখার অনুমতি দিতেন না। একবার আমি দেখেছি, মির্যা আইয়ূব বেগ সাহেব রমযানে এখানে (কাদিয়ানে) আসেন, তিনি রোযা রেখেছিলেন। আসরের সময় তিনি যখন পৌঁছেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাকে বলেন, রোযা ভেঙ্গে ফেলুন, সফরে রোযা রাখা অবৈধ। এটি নিয়ে দীর্ঘ বিতর্ক এবং কথা হয়, যেমনটি পূর্বেই বলা হয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) চিন্তা করেন, কোথাও আবার সে হোঁচট না খায়, তাই তিনি ইবনে আরাবীর উক্তি উপস্থাপন করে বলেন যে, তিনিও একই কথা বলেছেন।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমার ওপর এই ঘটনার যে প্রভাব ছিল সেই কারণে আমি সফরে রোযা রাখতে বারণ করতাম। দৈবক্রমে একবার মৌলভী আব্দুল্লাহ্ সানৌরী সাহেব এখানে রমযান মাস কাটানোর জন্য আসেন। তিনি বলেন, আমি শুনেছি যারা বাহির থেকে আসে আপনি তাদেরকে রোযা রাখতে বারণ করেন। কিন্তু আমার রেওয়ায়েত হলো, এখানে এক ব্যক্তি আসেন, তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে নিবেদন করেন যে, আমার এখানে অবস্থান করতে হবে, আমিএর মাঝে রোযা রাখব কি রাখব না? পূর্বে দুটো ঘটনা শোনানো হয়েছে যে, মুসাফিররা কাদিয়ানে এসে রোযা রাখতো।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, হ্যাঁ, আপনি রোযা রাখতে পারেন,কেননা, কাদিয়ান আহমদীদের জন্য দ্বিতীয় জন্মভূমির মর্যাদা রাখে। যদিও মৌলভী আব্দুল্লাহ্ সানৌরী সাহেব মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর খুব কাছের সাহাবী ছিলেন, নৈকট্য প্রাপ্ত ছিলেন, কিন্তু আমি শুধু তাঁর রেওয়ায়েতই গ্রহণ করিনি, এ সম্পর্কে মানুষের সাক্ষ্যও গ্রহণ করেছি। আর জানা গেছে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কাদিয়ানে অবস্থানকালে রোযা রাখার অনুমতি দিতেন, অবশ্য আসা এবং যাওয়ার দিন অনুমতি দিতেন না, সেকারণে আমার প্রথম দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করতে হয়। এবার রমযানে যখন বার্ষিক জলসা ঘনিয়ে আসছিল আর প্রশ্ন উঠানো হয় যে, তাদের রোযা রাখা উচিত কি না,

তখন এক ব্যক্তি বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে রমযানে যখন জলসা হতো আমরা স্বয়ং অতিথিদের সেহেরি খাইয়েছি।এই প্রেক্ষিতে আমি যে এখানে জলসায় আগমনকারীদের রোযা রাখার অনুমতি দিয়েছি তা-ও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এরই একটি ফতওয়া। পূর্বের আলেমগণ সফরে রোযা রাখা বৈধ আখ্যা দিয়ে দিতো, আর অ-আহমদী মৌলভীরা বর্তমান সময়ের সফরকে সফর বলে গণ্য করে না। কিন্তু হযরত মসীহ্মাওউদ (আ.) সফরে রোযা রাখতে বারণ করেছেন, আবার তিনি নিজেই এ কথা বলেন, কাদিয়ানে এসে রোযা রাখা বৈধ। এখন তাঁর একটি ফতওয়া আমরা গ্রহণ করব আর অপরটি প্রত্যাখ্যান করবএমনটি হওয়া উচিত নয়। এভাবে সেই কথাই প্রযোজ্য হবে যা এক পাঠান সম্পর্কে প্রসিদ্ধ রয়েছে। পাঠানরা ধর্মীয় আইনশাস্ত্র বা ফিকাহ্শাস্ত্রকে কঠোরভাবে মেনে চলে।

এক পাঠান ছাত্র ছিল সে পড়েছে যে, 'হরকতে কবীরা' বা খুব বেশি নড়া-চড়ায় (যেমন নামায ছেড়ে দরজা ইত্যাদি খুলে দেয়া) করলে নামায নষ্ট হয়ে যায়। সে হাদিসে মহানবী (সা.) সম্পর্কে পড়ল যে, তিনি একবার নামাযে নড়া-চড়া করেছেন তখন সে বলল, ও-হো, মুহাম্মদ (সা.)-এর তো তাহলে নামায নষ্ট হয়ে গেছে, কেননা কদূরী-তে এটি লেখা রয়েছে যে, 'হরকতে কবীরা'বা খুব বেশি নড়া-চড়া করলে নামায নষ্ট হয়ে যায়। যেনসেই পাঠান বা মৌলভীদের শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্র মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরুদ্ধেই ফতওয়া দিতে আরম্ভ করে। তিনি (রা.) বলেন, অতএব যিনি এই ফতওয়া দিয়েছেন যে, সফরে রোযা রাখা উচিত নয় তিনি আবার একথাও বলেছেন যে, কাদিয়ান আহমদীদের জন্য দ্বিতীয় মাতৃভূমি আর এখানে রোযা রাখা বৈধ। তাই এখানে রোযা রাখা তাঁর প্রদত্ত ফতওয়া অনুসারেই সঠিক, যদিও এর আরো কারণ রয়েছে।

একস্থানে অবস্থান কালে রোযা রাখা সম্পর্কে হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ সরওয়ার শাহ্ সাহেব লিখেন, রোযা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তিকে এক জায়গায় তিন দিনের অধিককাল পর্যন্ত অবস্থান করতে হয় তাহলে তার রোযা রাখা উচিত। তিন দিনের কম যদি থাকতে হয় তাহলে রোযা রাখা উচিত নয়। আর কাদিয়ানে যদি স্বল্পকাল অবস্থান সত্ত্বেও কেউ রোযা রাখে তাহলে পরে আর রোযা রাখার প্রয়োজন নেই কেননা; কাদিয়ান আহমদীদের দ্বিতীয় মাতৃভূমি, এখানে তিন দিনের চেয়ে কম অবস্থান হলেও রোযা রাখতে পারে, কিন্তু অন্যস্থানে তিন দিন অবস্থান করলে রোযা রাখতে পারবে।

মুসাফির ও রুগ্নদের রোযা না রাখা সংক্রান্ত একটি ঘটনা রয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এটি জানতে পারেন যে, লাহোর থেকে শেখ মোহাম্মদ চট্টু সাহেব নামে এক ব্যক্তি এসেছেন আর অন্যান্যরাও এসেছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর মহান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিনে বাহিরে আসেন, উদ্দেশ্য ছিল তিনি ভ্রমণের জন্যবাহিরে যাবেন আর বন্ধুদের সাথে সাক্ষাতেরও উপলক্ষ সৃষ্টি হবে, যারা বাহির থেকে এসেছেন তাদের সাথে সাক্ষাত হবে। অন্যরাও জানতে পারে যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বাহিরে আসবেন। তাই অনেকেই ছোট মসজিদে অর্থাৎ মসজিদে মুবারকেসমবেত হন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখন দরজার বাহিরে আসেন রীতি অনুসারে খোদ্দামরা পতঙ্গের মত তাঁর দিকে ছুটে যায়, তিনি শেখ সাহেবের দিকে তাকিয়ে সালামের পর বলেন, আপনি কেমন আছেন? তিনি পুরোনো জানাশোনা মানুষ, আর বাবা চট্টু সাহেব বলেন, আলহামদুলিল্লাহ্। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) হাকীম মোহাম্মদ হোসেন কোরেশী সাহেবকে সম্বোধন করে বলেন, তার যেন কোন কষ্ট না হয় তা নিশ্চিত করা আপনার দায়িত্ব, তার থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা করুন, যে জিনিষের প্রয়োজন হয় আমাকে জানান আর মিয়াঁ নিযাম উদ্দিন সাহেবকে তাগাদা দিন যে, খাবারের জন্য যা যথাযথ এবং তিনি যা খেতে পছন্দ করেন তা যেন প্রস্তুত করেন। হাকীম সাহেব বলেন, ইনশাআল্লাহ্ কোন কষ্ট হবে না। এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) অতিথিকে সম্বোধন করে বলেন, আপনি নিশ্চয় রোযা রাখেন নি। সেই ব্যক্তি বলেন, আমি রোযা রেখেছি। তিনি আহমদী ছিলেন না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, কুরআন যেসব ছাড় দিয়েছে সেগুলো অনুসরণ করাও তাক্বওয়া। আল্লাহ্ তা'লা মুসাফির এবং রুগ্নদের অন্য সময় রোযা রাখার অনুমতি এবং ছাড় দিয়েছেন, তাই এই নির্দেশও মেনে চলা উচিত। তিনি বলেন, আমি পড়েছি অধিকাংশ জ্যেষ্ঠ বা উম্মতের বুযূর্গদের মতামত হলো, যে ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় এবং সফরে রোযা রাখে সে পাপ করে, কেননা আসল বিষয় হলো আল্লাহ্র সন্তুষ্টি, নিজের ইচ্ছায় নয় বরং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি তাঁর আনুগত্যের মাঝে নিহিত অর্থাৎ তিনি যে নির্দেশ দেন তার আনুগত্য করা উচিত। নিজের পক্ষ থেকে এতে কোন কথা যোগ করা উচিত নয়।

তিনি এই নির্দেশই দিয়েছেন,

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ
عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ

(সূরা আল্-বাকারা: ১৮৫) এতে অন্য কোন শর্ত রাখেন নি যে, এমন সফর হতে হবে আর এ ধরণের অসুস্থতা হতে হবে। আমি সফরে রোযা রাখি না, অনুরূপভাবে অসুস্থ অবস্থায়ও রোযা রাখি না, আজও আমার ভালো লাগছে না, আমার স্বাস্থ্য ভাল নেই, তাই আমি রোযা রাখি নি। হাঁটা চলা করলে রোগের প্রকপ কিছুটা কমে যায়, তাই আমি বাহিরে যাব। অতিথিকে তিনি জিজ্ঞেস করেন, আপনিও যাবেন কি না, বাবা চট্টু সাহেব বলেন, না আমি যেতে পারবো না,আপনি ঘুরে আসুন। নিঃসন্দেহে (কুরআনে) এই নির্দেশ রয়েছে কিন্তু সফরে যদি কোন কষ্ট না হয় তাহলে রোযা কেন রাখা হবে না। হুযূর বলেন, এটি আপনার মতামত, কুরআন শরীফে কষ্ট হওয়া বা কষ্ট না হওয়ার কথা আদৌ উল্লেখ করা হয় নি। আপনি খুবই বয়োঃবৃদ্ধ এক ব্যক্তি। জীবনের কোন ভরসা নেই, মানুষের সেই পথই অনুসরণ বা অবলম্বন করা উচিত যাতে খোদা তা'লা সন্তুষ্ট হন এবং যেন সে সিরাতে মুস্তাকীম পেতে পারে। তখন বাবা সাহেব বলেন, আমি তো এ জন্যই

এসেছি যেন আপনার কাছে থেকে কিছুটা উপকৃত হতে পারি, যদি এই পথই সত্য হয় তাহলে কোথাও এমন যেন না হয় যে, আমরা ঔদাসিন্যের মাঝে মারা যাই। হুযূর (আ.) বলেন, এটি খুবই ভাল কথা। তিনি বলেন, আমি কিছুটা ঘুরে আসি, আপনি বিশ্রাম করুন।

একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বৈঠকে রুগ্ন এবং মুসাফিরের রোযা রাখার প্রসঙ্গ উঠে। হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব বলেন, পূর্বের কথাই শুনিয়েছেন যে, শেখ ইবনে আরাবীর উক্তি রয়েছে, রুগ্ন এবং মুসাফির রোযার সময় রোযা রাখলেও আরোগ্য লাভের পর অর্থাৎ রমযানের পর তার জন্য পুনরায় রোযা রাখা আবশ্যক, কেননা আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ

(সূরা আল্-বাকারা: ১৮৫) অর্থাৎ তোমাদের মাঝে যারা অসুস্থ বা সফরে থাকে তারা রমযান মাসের দিনগুলো অতিবাহিত হওয়ার পর রোযা রাখবে। এখানে আল্লাহ্ তা'লা একথা বলেন নি যে, রুগ্ন ব্যক্তি বা মুসাফির যদি নাছোড় মনোবৃত্তি প্রদর্শন করে বা নিজের বাসনা পূর্ণ করতঃ এই দিনগুলিতে রোযা রাখে তাহলে পরবর্তীতে আর রোযা রাখার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্ তা'লার স্পষ্ট নির্দেশ হলো, সে পরেও রোযা রাখবে বা তাকে পরেও রোযা রাখতে হবে, পরবর্তীতে রোযা রাখা তার জন্য আবশ্যক। মধ্যবর্তী রোযা যদি সে রাখে এটি তার জন্য অতিরিক্ত একটি বিষয়, এটি তার নিজেরই সিদ্ধান্ত, এর ফলে পরে রোযা রাখা সম্পর্কে খোদার যে নির্দেশ রয়েছে সেটি টলতে পারে না।

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, যে ব্যক্তি সফর এবং অসুস্থ অবস্থায় রমযান মাসে রোযা রাখে সে আল্লাহ্‌র স্পষ্ট নির্দেশের অবাধ্যতা করে। আল্লাহ্‌র পরিস্কার নির্দেশ হলো, রুগ্ন এবং মুসাফির যেন রোযা না রাখে, সুস্থ হওয়ার পর আর সফর সমাপ্তির পর সে রোযা রাখবে। আল্লাহ্‌র এই নির্দেশ মেনে চলা উচিত, কেননা পরিত্রাণ লাভ হয় খোদার অনুগ্রহে, কর্মবলে কেউ মুক্তি পেতে পারে না। তিনি (আ.) বলেন, খোদা তা'লা এই কথা বলেন নি যে, রোগ সামান্য না বেশি, সফর সংক্ষিপ্ত নাকি দীর্ঘ, বরং এটি সার্বজনীন একটি নির্দেশ, এটি মেনে চলা উচিত। রুগী এবং মুসাফির যদি রোযা রাখে তাহলে তারা নির্দেশ লঙ্ঘনের অপরাধে অপরাধী হবে।

এক বর্ণনায় এসেছে হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন, মিঞাঁ রহমতুল্লাহ্ সাহেব পিতার নাম মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্ সানৌরী সাহেব বর্ণনা করেন, একবার হুযূর (আ.) লুধিয়ানায় আসেন, পবিত্র রমযান মাস ছিল, আমরা সবাই গওসগড় থেকে রোযা রেখে লুধিয়ানা যাই, হুযূর আমার পিতাকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন বা অন্য কারো কাছ থেকে জানতে পারেন, যা এখন আমার মনে নেই, গওসগড় থেকে যারা এসেছেন তারা সবাই রোযাদার। হুযূর (আ.) বলেন, মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্! যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন একইভাবে সফরে রোযা না রাখারও নির্দেশ দিয়েছেন। আপনারা সবাই রোযা খুলে ফেলুন। যোহরের পরের কথা এটি, এরপর সবার রোযা খুলেদেয়া হয়েছে।

আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে, হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব নিজেই লিখেন, মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্ সানৌরী সাহেব বর্ণনা করেন, প্রথম যুগের কথা, একবার রমযান মাসে এখানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে কোন অতিথি আসেন। তিনি রোযা রেখেছিলেন, দিনের বেশির ভাগ সময় কেটে গিয়েছিল, খুব সম্ভব আসরের পরের কথা এটি। হুযূর তাকে বলেন, আপনি রোযা ভেঙ্গে ফেলুন। সেই ব্যক্তি বলেন, সামান্য সময় অবশিষ্ট আছে, রোযা ভেঙ্গে কি লাভ? হুযূর বলেন, আপনি কি বাহুবলে খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট করতে চান?

খোদা তা'লাকে সংকল্পবলে সন্তুষ্ট করা যায় না বরং তাঁকে আনুগত্যের মাধ্যমে সন্তুষ্ট করা যায়। যেখানে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, মুসাফির রোযা রাখবে না, সেখানে রোযা রাখা উচিত নয়। তখন সেই অতিথি রোযা ভেঙ্গে ফেলেন।

একইভাবে কপুরথলা নিবাসী হযরত মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব বলেন, একবার আমি এবং হযরত মুন্সী আরোড়া খান সাহেব এবং লুধিয়ানা নিবাসী হযরত খান সাহেব মোহাম্মদ খান সাহেব হুযূরের সকাশে উপস্থিত হই। রমযান মাস ছিল, আমার রোযা ছিল আরআমার সাথীরা রোযা রাখেন নি। আমরা যখন হুযূরের কাছে উপস্থিত হই তখনও সূর্যাস্তের কিছু সময় বাকী ছিল, সূর্য ছিল ডুবু ডুবু। আমার সাথীরা বললেন, জাফর আহমদ রোযা রেখেছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাৎক্ষণিকভাবে ভেতরে যান এবং এক গ্লাস শরবত নিয়ে আসেন আর বলেন, রোযা ভেঙ্গে ফেল, সফরে রোযা রাখা উচিত নয়, আমি নির্দেশ মান্য করি। আর সেখানে অবস্থানের সুবাদে এরপর রোযা রাখতে আরম্ভ করি। পরের দিনগুলোতে যেহেতু সেখানে অবস্থান ছিল তাই পুনরায় তারা রোযা রেখেছেন। রোযার দিনগুলোতে সেখানে অবস্থানকালে একদিন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ইফতারের সময় একটি থালায় তিনটি বড় শরবতের গ্লাস নিয়ে আসেন। আমরা রোযা খুলতে যাচ্ছিলাম, আমি বললাম, হুযূর! মুন্সিজী আরোড়া খান সাহেবের এক গ্লাসে কিছু হয় না, সারাদিন রোযা রেখেছেন, আর আপনি এক গ্লাস করে পানি এনেছেন, এতে তার কিইবা হবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মুচকি হাসেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে ঘরের ভেতরে গিয়ে একটি বড় জগ ভর্তি করে শরবত নিয়ে আসেন আর মুন্সিজীকে পান করান। মুন্সিজী মনে করেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে শরবত পান করছি, তাই তিনি পান করতে থাকেন এবং পুরো জগ পান করে ফেলেন, একটা বড় জগ ভর্তি শরবত ছিল।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন, পেনশনার মওলা বক্স সাহেব মৌলভী আব্দুর রহমান সাহেব মুবাশ্বেরের বরাতে লিখে পাঠিয়েছেন যে, একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) রমযান মাসে অমৃতসর আসেন, সেখানে তাঁর বক্তৃতা ছিল মুন্ডুয়া বাবু বেনিয়া লাল-এ যার বর্তমান নাম হলো 'বন্দে মাতরম পাল'। সফরের কারণে হুযূরের হুযূর রোযা

রাখেন নি। বক্তৃতা চলাকালে মুফতি ফজলুর রহমান সাহেব হুযূরকে চায়ের পেয়ালা দেন, হুযূর এদিকে দৃষ্টি দেন নি, তিনি আরো কিছুটা এগিয়ে আসেন, তখন হুযূর বক্তৃতায় ব্যস্ত ছিলেন, এরপর মুফতি সাহেব পেয়ালা তাঁর আরো কাছে নিয়ে আসেন, হুযূর তা থেকে এক চুমুক পান করেন। তখন মানুষ হৈ-চৈ আরম্ভ করে যে, এই হলো রমযান মাসের সম্মান, ইনি রোযা রাখেন না। তারা অশালীন কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করে এবং বক্তৃতা বন্ধ হয়ে যায়। হুযূর পর্দার অন্তরালে বা পিছনে চলে যান। গাড়ী দ্বিতীয় দিক থেকে দরজার সামনে আনা হয়, হুযূর এতে প্রবেশ করেন, মানুষ ইট-পাথর ইত্যাদি ছুঁড়তে আরম্ভ করে, অনেক হৈচৈ করে, গাড়ীর কাঁচ ভেঙ্গে যায়, হুযূর নিরাপদে তাঁর আবাসস্থলে পৌঁছে যান।

একজন বর্ণনাকারী বলেন, পরে শোনা গেছে যে, একজন অ-আহমদী মৌলভী এসব কিছু সত্ত্বেও বলত, আজকে মানুষ মির্যাকে নবী বানিয়ে দিয়েছে, আমি স্বয়ং তাঁর মুখে একথা শুনিনি। এরপর হযরত মৌলভী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেবের সাথে আমরা বাহিরে যাই। আমি তাঁকে বললাম, মানুষ ইট-পাথর ছুড়ছে, হৈ-হট্টগোল হচ্ছে, কিছুক্ষণ পর বের হন, তখন খলীফা আউয়াল (রা.) বলেন, মানুষ যাকে পাথর মারত তিনি চলে গেছেন, আমাকে কে পাথর মারবে। যেহেতু মুফতি ফজলুর রহমান সাহেবের চা পরিবেশনের কারণে এই হৈচৈ এবং গণ্ডগোল আর হট্টগোল হয়, তাই সবাই তাকে বলতে আরম্ভ করে, তুমি কেন এমনটি করলে? সব আহমদী তাকে দোষারোপ করতে থাকে।

ঘটনা বর্ণনাকারী বলেন, আমিও তাকে এমনটিই বললাম, তিনি পরে বিরক্ত হয়ে যান আর মিয়াঁ আব্দুল খালেক মরহুম আমাকে বলেন, এই বিষয়টি যখন হুযূরের সামনে উপস্থাপন করা হয় যে, মুফতি সাহেব অনর্থক বক্তৃতা নষ্ট করেছেন তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, মুফতি সাহেব কোন অপছন্দনীয় কাজ করেন নি। এটি আল্লাহ্ তা'লার একটি নির্দেশ যে, সফরে রোযা রাখবে না বা রাখা উচিত নয়, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এই কাজের মাধ্যমে এই নির্দেশ প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন। যিনি এটি লিখছেন তিনি একথাও লিখেছেন যে, মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এই উত্তর শুনে মুফতি সাহেবের সাহস আরো বেড়ে যায়।

অসুস্থ হলে রোযা ভেঙ্গে ফেলা সম্পর্কে হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, ডাক্তার মীর মোহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব বর্ণনা করেন, একবার লুধিয়ানায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) রোযা রেখেছিলেন, কিন্তু তাঁর রক্তচাপ কমে যায় এবং হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যেতে থাকে। তখন সূর্য ছিল ডুবন্তপ্রায়, তিনি তাৎক্ষণিকভাবে রোযা ভেঙ্গে ফেলেন। তিনি সব সময় শরীয়তের সহজ পন্থাকে প্রাধান্য দিতেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বলেন, এই অধম বর্ণনা করছে যে, হাদীসে হযরত আয়েশা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে মহানবী (সা.) সম্পর্কেও এমনটিই দেখা যায় যে, তিনি সব সময় দু'টো বৈধ পথের মাঝে সহজ পথকে বেছে নিতেন।

একবার প্রশ্ন করা হয় যে, অনেক সময় রমযান মাস এমন মৌসুমে আসে যখন কৃষকদের কাজ অনেক বেশি থাকে, যেমন ফসল রোপন বা কাটার মৌসুম ইত্যাদি। যারা শ্রমজীবী এমন শ্রমিকদের জন্য রোযা রাখা সম্ভব হয় না, এ সম্পর্কে শিক্ষা কী? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, 'আল আ'মালু বিন্ নিয়্যত' এরা নিজেদের অবস্থা গোপন রাখে, তাক্বওয়া এবং পবিত্রতার নিরিখে নিজের অবস্থা মানুষ যাচাই করতে পারে, কেউ যদি মজদুরী করা সত্ত্বেও রোযা রাখতে পারে তাহলে তার রাখা উচিত নতুবা সে রুগীদের মাঝে গণ্য হবে, এরপর সুযোগ হলে রাখতে পারে। বিশেষ করে গরমের দিনগুলো অনেক দীর্ঘ হয়ে থাকে আর যেসব দেশে তাপমাত্রা অনেক বেশি হয়ে থাকে, ভয়াবহ হয়ে থাকে, সেসব দেশ সম্পর্কে বলা হচ্ছে, এই মজদুরীর কারণে তারা পরে রোযা রাখতে পারে। আর

وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ

(সূরা আল্ বাকারা:১৮৫) সম্পর্কে বলেন, এর অর্থ হলো, যাদের শক্তি নেই বা সামর্থ্য নেই বা যারা অপারগ। রমযানে যারা রোযা রাখতে পারে না এবং ফিদিয়া দেয় এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "একবার আমার হৃদয়ে প্রশ্নোদয় হলো, ফিদিয়া নির্ধারণের কারণ কি? তখন জানতে পারলাম, এটি সামর্থ লাভের উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ এর মাধ্যমে যেন রোযা রাখার সামর্থ অর্জিত হয়। খোদা তা'লার পবিত্র সত্তাই শক্তি যুগিয়ে থাকে, তাই সবকিছু তাঁর কাছেই চাওয়া উচিত। খোদা তা'লা সর্বশক্তির আধার। তিনি চাইলে একজন যক্ষ্মা-রোগীকেও রোযা রাখার সামর্থ দিতে পারেন। ফিদিয়ার উদ্দেশ্যই হলো, সেই শক্তি লাভ করা আর এটি খোদার কৃপাগুণেই লাভ হয়। অতএব আমার মতে এভাবে দোয়া করলে খুব ভাল হয়, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! এটি তোমার আশিসপূর্ণ একটি মাস, অথচ আমি এ থেকে বঞ্চিত। জানি না, আগামী বছর বাঁচব কি না কিংবা বাদ পড়া রোযাগুলো রাখতে পারব কি না? তাঁর কাছে যদি এভাবে শক্তি চায় তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এমন হৃদয়ের অধিকারীকে খোদা তা'লা শক্তি দান করবেন"। (মলফুযাত ২য় খণ্ড, নবসংস্করণ, পৃ: ৫৬৩)

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) লিখেন, ফিদিয়া দিলেই রোযা মাফ হয়ে যায় না বরং দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো, এই বরকতময় দিনগুলোতে শরীয়তের অনুমদিত কোন বৈধ কারণে অন্যান্য মুসলমানদের সাথে একত্রে রোযা রাখা সম্ভব হয়। এই যে ছাড়, এটি দু'ধরণের হয়ে থাকে, একটি সাময়ীক, আরেকটি স্থায়ী। ফিদিয়া সাধ্যানুসারে উভয় অবস্থায় দেয়া উচিত। এক কথায় কেউ ফিদিয়া দিলেও এক বছর, দু'বছর বা তিন বছর পর যখনই তার স্বাস্থ্য অনুমতি দেয়, তাকে পুনরায় রোযা রাখতে হবে। কিন্তু যদি এমন হয় যে, পূর্বের রোগ সাময়িক ছিল আর স্বাস্থ্য লাভের পর তার রোযা রাখার সিদ্ধান্ত নিতে নিতেই যদি পুনরায় সে স্থায়ীভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে তাহলে সে ফিদিয়া দেবে। বাকী যে খাবার খাওয়ানোর সামার্থ্য রাখে সে যদি অসুস্থ হয়, বা মুসাফির হয় তাহলে তার জন্য আবশ্যক হবে রমযান মাসে একজন মিসকিনকে ফিদিয়া স্বরূপ খাবার

খাওয়ানো আর বছরের অন্য সময় সে রোযা রাখবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর রীতি এটিই ছিল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সব সময় ফিদিয়াও দিতেন পরে আবার রোযাও রাখতেন আর অন্যদেরকেও এই তাকিদপূর্ণ নির্দেশই দিতেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে একটি প্রশ্ন করা হয়, যে ব্যক্তি রোযা রাখার সামর্থ্য রাখে না বা যে সক্ষম নয় তার এর বিনিময়ে মিসকীনকে খাবার খাওয়াতে হয়, এ খাতে যা ব্যয় হয় তা এতিম ফান্ডে বা এতিম তহবিলে অথবা জামাতের ব্যবস্থাপনার হাতে সেই অর্থ দেয়া বৈধ কি না? হুযূর বলেন, একই কথা, শহরে মিসকীনকেও খাওয়াতে পারে বা এতিম ও মিসীকন তহবিলেও দিতে পারে, কোন পরিচিত ব্যক্তির যদি রোযা খোলাতে চায় বা ইফতার করাতে হয় তাহলে তাও করা যেতে পারে।

অজান্তে পানাহার করলে রোযা ভাঙ্গে না, এই বিষয়ে তাঁর সামনে (এক ব্যক্তির) একটি চিঠি উপস্থাপন করা হয়, রমযান মাসে সেহেরির সময় অজান্তে ভেতরে বসে খাওয়া অব্যাহত রাখি আর বাহিরে এসে দেখি যে, ফর্শা হয়ে গেছে, আমার জন্য সেই রোযা পরে রাখা আবশ্যক কি না? উত্তরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, অজান্তে খেলে বা পান করলে সেই রোযার স্থলে আরেকটি রোযা রাখা আবশ্যক নয়। ভুলবশতঃ খেলে কোন অসুবিধা নেই।

বয়সের প্রশ্ন, কোন্ বয়সে রোযা রাখা উচিত, অনেক বাচ্চাও জিজ্ঞেস করে আর বয়স্করাও। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, স্মরণ রাখা উচিত, শরীয়ত অপ্রাপ্ত বয়স্কদের রোযা রাখতে বারণ করেছে কিন্তু যৌবনের প্রারম্ভে রোযা রাখার অভ্যাস অবশ্যই করা উচিত। তিনি (রা.) বলেন, আমার যতটা মনে পড়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাকে ১২ বা ১৩ বছর বয়সে প্রথম রোযা রাখার অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু কোন কোন নির্বোধ ৬/৭ বছরের শিশুদের রোযা রাখতে বাধ্য করে আর মনে করে, আমরা পুণ্যের ভাগী হব। এটি পুণ্য নয় বরং এটি একটি অন্যায়। কেননা এটি দৈহিক উন্নতি ও বিকাশের বয়স। অবশ্য যৌবনে পদার্পনের নিকটবর্তী সময়ে, যখন রোযা আবশ্যক হওয়ার সময় ঘনিয়ে আসে তখন রোযারাখার চর্চা অবশ্যই করানো উচিত।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অনুমতি ও রীতিকে যদি দেখা হয় তাহলে ১২/১৩ বছর বয়সে কিছুটা অভ্যাস করানো উচিত এবং প্রত্যেক বছর কয়েকটি রোযা রাখানো উচিত যতদিন না বয়স ১৮ হয়, যা আমার মতে রোযার জন্য পূর্ণ বয়স। প্রথম বছর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাকে শুধু একটি রোযা রাখার অনুমতি দিয়েছেন, অর্থাৎ ১২/১৩ বছর বয়সে হুযূর শুধু ১টি রোযা রাখার অনুমতি দিয়েছেন। এ বয়সে শুধু রোযার একটা উৎসুক্য থাকে, সেই আগ্রহের কারণে বাচ্চারা বা ছেলে-মেয়েরা বেশি রোযা রাখতে চায়, তখন পিতা-মাতার উচিত তাদের বারণ করা। এরপর বয়সের এক পর্যায়ে বাচ্চাদের উৎসাহ যোগানো উচিত যেন

রমযানে যারা রোযা রাখতে পারে না এবং ফিদিয়া দেয় এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "একবার আমার হৃদয়ে প্রশ্নোদয় হলো, ফিদিয়া নির্ধারণের কারণ কি? তখন জানতে পারলাম, এটি সামর্থ লাভের উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ এর মাধ্যমে যেন রোযা রাখার সামর্থ অর্জিত হয়। খোদা তা'লার পবিত্র সত্তাই শক্তি যুগিয়ে থাকে, তাই সবকিছু তাঁর কাছেই চাওয়া উচিত। খোদা তা'লা সর্বশক্তির আধার। তিনি চাইলে একজন যক্ষ্মা-রোগীকেও রোযা রাখার সামর্থ দিতে পারেন। ফিদিয়ার উদ্দেশ্যই হলো, সেই শক্তি লাভ করা আর এটি খোদার কৃপাগুণেই লাভ হয়। অতএব আমার মতে এভাবে দোয়া করলে খুব ভাল হয়, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! এটি তোমার আশিসপূর্ণ একটি মাস, অথচ আমি এ থেকে বঞ্চিত। জানি না, আগামী বছর বাঁচব কি না কিংবা বাদ পড়া রোযাগুলো রাখতে পারব কি না? তাঁর কাছে যদি এভাবে শক্তি চায় তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এমন হৃদয়ের অধিকারীকে খোদা তা'লা শক্তি দান করবেন"।

(মলফুযাত ২য় খণ্ড, নবসংস্করণ, পৃঃ ৫৬৩)

কয়েকটি হলেও তারা রোযা রাখে। কিন্তু শৈশবে বারণ করা উচিত, বেশি রোযা রাখতে দেয়া উচিত নয়। আর যখন যৌবনে পদার্পণ করে তখন উৎসাহিত করা উচিত, একই সাথে এটিও দেখা উচিত, বেশি রোযা যেন না রাখে। আর যারা দেখে তাদের আপত্তি করা উচিত নয় যে, সব রোযা কেন রাখে না।

কেননা কিশোর-কিশোরীরা যদি এই বয়সে সবগুলো রোযা রাখে তাহলে পরে আর রাখতে পারবে না, অনুরূপভাবে কোন কোন ছেলে-মেয়ে গঠনগত দিক থেকে দুর্বল হয়ে থাকে। আমি দেখেছি অনেকেই তাদের ছেলে-মেয়েদের সাক্ষাতের জন্য আমার কাছে নিয়ে আসে, আর বলে, এর বয়স ১৫ বছর অথচ দেখতে মনে হয় ৭/৮ বছর বয়স্ক। আমার কাছেও এমন অনেকেই আসে। তিনি (রা.) বলেন, আমি মনে করি এমন ছেলে মেয়ে হয়ত ২১ বছর বয়সে রোযার জন্য সাবালক হবে। পক্ষান্তরে এক সুঠাম বালককে হয়ত ১৫ বছর বয়সেই ১৮ বছরের মনে হয় কিন্তু যদি আমার এই শব্দগুলো নিয়ে যদি সে সঠতা প্রদর্শন করে যে, রোযার জন্য উপযুক্ত হওয়ার বয়স হলো ১৮ তাহলে সে আমার ওপরও যুলুম করবে না আর খোদার বিরুদ্ধেও অন্যায় করবে না, বরং নিজ প্রাণের ওপর নিজেই অন্যায় করবে। অনুরূপভাবে কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকা যদি রোযা না রাখে আর মানুষ তার সমালোচনা করে তাহলে এমন সমালোচনাকারী নিজের বিরুদ্ধেই অন্যায় করবে।

হযরত নওয়াব মোবারেকা বেগম সাহেবা যিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বড় জ্যেষ্ঠ দুহিতা ছিলেন, তিনি বলেন, যৌবনে পদার্পণের পূর্বে স্বল্প বয়সে তিনি (আ.) রোযা রাখানো পছন্দ করতেন না, দু'একটি রোযা রাখাকেই যথেষ্ট মনে করা হতো। হযরত আম্মাজান আমার প্রথম রোযা রাখিয়েছেন, মানুষকে ইফতারির দাওয়াত দিয়েছেন, জামাতের সব মহিলাদের ডেকেছেন। এই রমযানের পর দ্বিতীয় বা তৃতীয় রমযানে আমি আবার রোযা রাখি, আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে বলি, আজকে আমি আবার

সেহেরি খেয়ে রোযা রাখা আবশ্যক। মহানবী (সা.) আমাদেরকে এই নির্দেশই দিয়েছেন। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি (সা.) বলেছেন, রোযার সময় সেহেরি খেয়ো কেননা, সেহেরি খেয়ে রোযা রাখাতে কল্যাণ নিহিত আছে।

রোযা রেখেছি। তিনি কক্ষেই ছিলেন, পাশের টুলে দু'টো পান ছিল, খুব সম্ভব হযরত আম্মাজান বানিয়ে রেখেছিলেন। তিনি একটি পান হাতে নিয়ে আমাকে বলেন, নাও এই পান খাও, তুমি দুর্বল, রোযা রাখবে না, রোযা ভেঙ্গে ফেল। আমি পান খেয়ে ফেলি, একই সাথে বলি, সালেহা অর্থাৎ ছোট মামার স্ত্রীও রোযা রেখেছেন, তিনিও স্বল্প বয়স্কাই ছিলেন, তার রোযাও ভাঙ্গিয়ে দিন। মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, তাকে ডাক। আমি তাকে ডেকে নিয়ে আসি। তিনি আসলে মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাকে দ্বিতীয় পান ধরিয়ে দেন আর বলেন খাও, তোমার রোযা নেই, আমার বয়স হয়ত তখন ১০ বছর হবে।

অনুরূপভাবে তারাবী সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করা হয়। গোলেকীর আকমল সাহেব লিখিতভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে জিজ্ঞেস করেন, রমযান শরীফে রাতে উঠা এবং নামায পড়ার তাকিদ রয়েছে, কিন্তু সচরাচর পরিশ্রমী মজদুর বা শ্রমিক ও কৃষকরা এমন কাজের ক্ষেত্রে আলস্য দেখায়, তাদেরকে রাতের প্রথম প্রহরে যদি তাহাজ্জুদের পরিবর্তে ১১ রাকাত নামায পড়িয়ে দেয়া হয় তাহলে তা বৈধ হবে কি না? হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, কোন অসুবিধা নেই, তারা পড়ে নিতে পারে।

তারাবী সম্পর্কে নিবেদন করা হয় যে, এটি যেহেতু তাহাজ্জুদ তাই ২০ রাকাত পড়া সম্পর্কে হুযূরের মতামত কি? তাহাজ্জুদ তো বেতেরসহ ১১ বা ১৩ রাকাত। তিনি বলেন, মহানবী (সা.)-এর স্থায়ী রীতি হলো ৮ রাকাত পড়া, তিনি তাহাজ্জুদের সময়ও তা-ই পড়তেন আর এটিই উত্তম। কিন্তু রাতের প্রথম প্রহরে পড়াও বৈধ, তাহাজ্জুদের সময় উঠে ৮ রাকাত পড়াই যুক্তিযুক্ত বা যথোচিত, কিন্তু রাতের প্রথম প্রহরে পড়লেও তা বৈধ, অর্থাৎ ঘুমানোর পূর্বে। আরেকটি রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তিনি রাতের প্রথম প্রহরে এটি পড়েছেন। ২০ রাকাত পরে পড়া হয়েছে কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর রীতি তাই ছিল যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। ২০ রাকাত বা বেশি রাকাত সংক্রান্ত কথাগুলো পরের। মহানবী (সা.)-এর সুন্নত বা রীতি হলো ৮ রাকাত তাহাজ্জুদ পড়া।

এক ব্যক্তি হুযূরের কাছে একটি পত্র লিখে যার সারাংশ হলো, সফরে কীভাবে নামায পড়তে হয় আর তারাবী সম্পর্কে কি নির্দেশ? তিনি(আ.) বলেন, সফরে দু'রাকাত নামায পড়াই সুন্নত, আর তারাবীও সুন্নত, তাও পড়ুন, ঘরে একাও পড়তে পারেন। তারাবী আসলে তাহাজ্জুদ, নতুন কোন নামায নয়। আর বেতের যেভাবে পড়ে থাক সেভাবেই পড়।

অতএব, রমযান সংক্রান্ত এই কয়েকটি কথা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তাক্বওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে খোদার সন্তুষ্টিকে অগ্রগণ্য করে রমযানের রোযা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার সামর্থ্য দান করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।

জুমুআর খুতবা

সকল প্রকার বৃথা কার্যকলাপ থেকে মুক্ত থাকার নির্দেশ

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, এই পৃথিবীতে অনেক মানুষ অনেক কথা অযথা এবং অকারণেই বলে। অনেকেই এমন আছে যারা হাসি-ঠাট্টার ছলে কাউকে কোন বাজে কথা বলে বসে এবং এর ফলে ঝগড়া বিবাদের সূত্রপাত হয়। অনেক সময় বিভিন্ন মিটিং বা বৈঠকে এমন সব কথা বলা হয় যা বৃথা হয়ে থাকে বা কেবল কথার খাতিরে কথা বলা হয়। অনেক সময় এমন ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপাত্মক কথাও বলা হয় যার ফলে অন্যের কষ্ট হয় অথবা এমন অলাভজনক বা বৃথা কথাবার্তা হয় যা কোন অর্থেই কারও জন্য লাভজনক হয় না। এটি সম্পূর্ণরূপে সময় নষ্ট করা বৈ আর কিছু নয়। 'লাগাভ' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, বৃথা এবং অলাভজনক কথাবার্তা বলা বা অবিবেচকের মতো কথাবার্তা বলা, অনর্থক কথা বলা আর নির্বোধের মতো কথা বলা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদের 'লাগাভ' কর্মকান্ড থেকে বারণ করেছেন।হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এক জায়গায় খোদা তা'লার এই নির্দেশের

ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বরাতে একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। তিনি বলেন,

وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

(সূরা আল্ ফুরক্বান: ৭৩) এখানে মু'মিনের লক্ষণস্বরূপ বলা হয়েছে যে, সে যখন কোন বৃথা কার্যকলাপ দেখে তখন সসম্মানে তা এড়িয়ে যায়। এখানে তিনি মহিলাদের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে বলেন, কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, মহিলারা সবসময় বৃথা কার্যকলাপের প্রতিই আকৃষ্ট থাকে, যদিও আজকাল পুরুষদের অবস্থাও এমনই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তারা বিনা অকারণে পরস্পরকে জিজ্ঞেস করে বেড়ায় যে, এই কাপড় কত টাকা দিয়ে ক্রয় করেছ? এই গয়না কোত্থেকে বানিয়েছ? ইত্যাদি ইত্যাদি। এই যে, ছোট ছোট কথা এগুলোও বৃথা কাজ। এই কথাগুলো নিছক বস্তুবাদিতা, এর কোন লাভজনক দিক নেই। অনেক সময় পাশে যেসব মহিলা বসে থাকে তাদের ওপরও এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। তিনি বলেন, মহিলারা যতক্ষণ এর পুরো ইতিহাস এবং আদ্যপান্ত উদঘাটন না করবে ততক্ষণ স্বস্তি পায় না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন, একজন মহিলা একটি আংটি বানিয়েছিল, কিন্তু কেউ সেই আংটির প্রতি দৃষ্টিপাতই করেনি। সেটি খুবই আকর্ষণীয় একটি স্বর্ণের আংটি ছিল। অবশেষে সে বিরক্ত হয়ে নিজেই নিজের ঘরে অগ্নি সংযোগ করে। মানুষ তাকে জিজ্ঞেস করে, আগুন থেকে আদৌ কিছু রক্ষা পেয়েছে কি? সে বলে, এই আংটি ছাড়া আর কোন কিছুই রক্ষা পায়নি। তখন আরেকজন মহিলা তাকে জিজ্ঞেস করে, বোন! এই আংটি তুমি কবে বানিয়েছ? এটি তো খুবই সুন্দর এক আংটি। সে তখন বলে, তুমি যদি এই কথাটি আমাকে পূর্বে জিজ্ঞেস করতে তাহলে আমার ঘরই পুড়তো না।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, এই বদভ্যাস কেবল মহিলাদের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়, পুরুষদেরও এমন বদভ্যাস রয়েছে। বিনা অকারণে অনেক সময় অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে আরম্ভ করে। যেমন সালামের পর জিজ্ঞেস করে, কোত্থেকে এসেছ, কোথায় যাবে, কত আয় কর? প্রশ্ন হলো, এমন বিষয়ে অন্যের নাক গলানোর প্রয়োজনই বা কী? এরপর তিনি পাশ্চাত্যের বিভিন্ন জাতির দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে ইংরেজদের কথা বলেন, ইংরেজদের ক্ষেত্রে কখনও এমনটি হয় না যে, তারা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করবে, তুমি কোথায় চাকরী কর, তোমার শিক্ষাগত যোগ্যতা কি, বেতন কত পাও ইত্যাদি, ইত্যাদি। এভাবে খুটিয়ে খুটিয়ে কথা জিজ্ঞেস করার ধারণাই তাদের মাথায় আসে না।

অতএব 'লাগাভ' শুধু এমন বিষয় নয় যা অন্যের জন্য ক্ষতিকর বরং প্রতিটি অলাভজনক কথাই 'লাগাভ' এর শ্রেণীভুক্ত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক জায়গায় বিষয়টি এভাবেও ব্যাখ্যা করেন যে, "এমন কাজ করা যা না করলে বিশেষ কোন লাভ বা ক্ষতি হয় না তা-ই 'লাগাভ' বা বৃথা কাজ।" অতএব মু'মিন হওয়ার জন্য শর্ত হলো, তার সবসময় উদ্দেশ্য প্রণোদিত কথাবার্তা বলা এবং সকল প্রকার বৃথা কার্যকলাপ থেকে মুক্ত থাকা। কিন্তু আমরা যদি যাচাই করি তাহলে দেখা যায়, অনেক মানুষ এমন আছে যারা অহেতুক কথাবার্তা বলে থাকে।

এখন আমি আপনাদের সামনে আরে কিছু শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করেছেন আর যা হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) উপস্থাপন করেছেন। তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একটি চুটকি বা কৌতুক শোনাতেন। একজন মেথর ছিল। সে একবার লাহোরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে গ্রামে বসবাস করত, শহরের আবর্জনা ইত্যাদি পরিষ্কার করতো। সে দেখলো যে, শহরে প্রচন্ড হৈ-চৈ হচ্ছে, হিন্দু ও মুসলমান নর-নারী সবাই ক্রন্দনরত। সে কাউকে এর কারণ জিজ্ঞেস করে। তাকে জানানো হয়, মহারাজা রঞ্জিত সিং মৃত্যু বরণ করেছেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, সেই সময় শিখদের রাজত্ব ছিল আর তাদের মাঝে এমন অনেক রাজাও ছিল যাদের অনেক দুর্নাম রয়েছে। কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই আর আমিও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে বারংবার শুনেছি যে, মহারাজা রঞ্জিত সিংয়ের রাজত্বকালে এখানে শান্তির রাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি অশান্তির কারণগুলো অনেকটাই দূরীভূত করেছিলেন। মুসলমানদের ওপর শিখদের অত্যাচারের যেসব ঘটনা বর্ণনা করা হয়ে থাকে তা অন্যান্য বাদশাহ্দের যুগের, যখন দেশের রাজত্ব ছিল বহুধা বিভক্ত, লুটপাট হচ্ছিল আর সর্বত্র নৈরাজ্য বিরাজ করছিল। মহারাজা রঞ্জিত সিং সর্বদা শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চেষ্টা করতেন এবং মুসলমানদের সাথেও অনেকটা ভালো ব্যবহার করতেন। তিনি (রা.) এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, তার মন্ত্রীদের মাঝে মুসলমানরাও ছিল।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমাদের দাদাও অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পিতা, তার তার একজন জেনারেল ছিলেন। তার যুগে অনেক মুসলমান বড় বড় পদে অধিষ্ঠিতছিল। তার কারণে দেশে যে শান্তি বিরাজমান ছিল তার ওপর দৃষ্টিপাতে আর তার পূর্বে বিরাজমান নৈরাজ্যকে স্মরণ করে সবাই তার মৃত্যুর কারণে দুঃখ ভারাক্রান্ত ছিল এবং মানুষ কাঁদছিল। সেই মেথর এই হৈ-হুল্লোড় এর কারণ জিজ্ঞেস করলে কেউ তাকে বলে, মহারাজা রঞ্জিত সিং মৃত্যু বরণ করেছেন। এতে সে অবাক হয়ে সেই ব্যক্তির মুখের দিকে তাকিয়েথাকে এবং জিজ্ঞেস করে, মানুষ তার মৃত্যুতে এত ব্যাকুল কেন? আমার পিতার মতো মানুষ যেখানে মারা গেছেন সেখানে মহারাজা রঞ্জিত সিং মারা গেলে সমস্যা কোথায়? এই চুটকি বা কৌতুক শুনিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন, যার কাছে যে জিনিসের মূল্য থাকে সেটিই তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। সেই মেথরের পিতা যেহেতু তাকে অনেক ভালোবাসতো তাই তার কাছে সে-ই প্রিয় ছিল। আর মহারাজা রঞ্জিত সিংলক্ষ লক্ষ মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করলেও এই ব্যক্তি যেহেতু সেই লক্ষ মানুষের অন্তর্ভুক্ত ছিল না আর তার চিন্তা ধারার গন্ডিও যেহেতু ব্যাপক ছিল না, যার ফলে সে বুঝতে পারতো যে, দেশের কল্যাণ এবং নিরাপত্তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর ব্যক্তিগত স্বার্থ এর সামনে কোন অর্থই

রাখে না, তাই তার দৃষ্টিতে প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যায়নের যোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন তার পিতা এবং তাকেই মূল্যায়ন করা উচিত। তিনি যেহেতু এখন মারা গেছেন তাই মহারাজা রঞ্জিত সিং মারা গেলে কিইবা আসে যায়।

অতএব পৃথিবীতে নিজের প্রয়োজনের গুরুত্বের নিরিখে অনেক ছোট জিনিসও বড় হয়ে যায় আবার অনেক বড় জিনিসকেও জ্ঞান হীনতার কারণে মানুষ অবজ্ঞা করে। একজন শিশুকে খুবই মূল্যবান হীরা দিয়ে দিলেও সে এর কিইবা মূল্য বুঝবে। অতএব একজন মু'মিনকে তার আচার-আচরণ এবং আচার ব্যবহারের মাধ্যমে বা অন্যের উপকারে আসার মাধ্যমে এবং অন্যের ওপর অনুগ্রহ করে নিজের গুরুত্ব পৃথিবীর সামনে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। তার দৃষ্টি যেন সীমিত না থাকে, কেবল তার নিকটাত্মীয়রাই যেন তার জন্য না কাঁদে বরং সে যেখানে থাকে, যে সমাজে বাস করে সেখানে যেন তার গুরুত্ব গৃহীত ও স্বীকৃত হয়। সবারই নিজস্ব একটি কর্মগন্ডি আছে আর সেই গন্ডিতে কোন আহমদীর পরিচিতি বা সুপরিচিতির গন্ডি শুধু তার নিজের ব্যক্তিসত্তা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না বা কেবল তার জন্যই কল্যাণকর হয় না বরং জামাতের জন্যও তা সুনাম বয়ে আনে আর এভাবে তবলীগের পথও উন্মোচিত হয়। একজন আহমদী যদি নেক প্রভাব বিস্তারকারী হয় তাহলে পৃথিবীর মানুষ জানতে পারবে যে, ইসলামের প্রকৃত অর্থ এবং মর্ম কী, আর পৃথিবীর শান্তি এবং নিরাপত্তার জন্য এযুগে ইসলামী শিক্ষাই হলো একমাত্র শিক্ষা যা প্রকৃত নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারে। অতএব পৃথিবীর মানুষের জ্ঞানের যে অভাব রয়েছে বা জ্ঞানশূন্যতা রয়েছে সেই জ্ঞান সৃষ্টির জন্য আমাদের সবার উচিত স্ব-স্ব গন্ডিতে অবদান রাখা।

অনেকেই সামান্য ত্যাগ স্বীকার করে এই আত্মপ্রসাদ নেয় যে, আমরা অনেক কিছু করে ফেলেছি, বা অনেকেই এমনও থেকে থাকে যারা কোন কুরবানী না করেই মনে করে, আমরা কুরবানী করেছি বা অন্যের ওপর অনুগ্রহ করেছি। এমন লোকদের সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একটি ঘটনা বর্ণনা করতেন।এক ব্যক্তি কাউকে নিমন্ত্রণ করে আর সাধ্যানুসারে তার সেবায় কোন প্রকার ত্রুটি করেনি। অতিথি যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন ঘরের মালিক তার কাছে ক্ষমা চাইতে গিয়ে বলে, আমার স্ত্রী অসুস্থ ছিলেন এবং আরও কিছু সমস্যা ছিল বলে আপনার পুরোপুরি সেবা করা সম্ভব হয়নি। আশা করি আপনি আমায় ক্ষমা করবেন। একথা শুনে অতিথি বলে, আমি জানি তুমি কোন উদ্দেশ্যে একথা বলছো। আমি তোমার প্রশংসা করি এবং তোমার অনুগ্রহের কথা স্বীকার করি– এটিই তুমি চাও। এই ছিল অতিথির চিন্তাধারা। সেই অতিথি বলে, কিন্তু আমার কাছে এই আশা রেখো না বরং আমার অনুগ্রহ তোমার স্বীকার করা উচিত। মেযবান বলেন, আমার উদ্দেশ্য মোটেই এটি দেখানো নয় যে, আপনার ওপর কোন অনুগ্রহ করেছি। আমি সত্যিই লজ্জিত যে, ভালোভাবে আপনার সেবা-যত্ন করা সম্ভব হয়নি, তবে আমার প্রতি আপনার যদি কোন অনুগ্রহ থেকে থাকে তাহলে তাও আপনি বলতে পারেন, আমি এর জন্য আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো। তখন অতিথি বলে, তুমি যাই বল, তোমার মনের খবর আমার ভালভাবে জানা আছেঅর্থাৎ হৃদয়ে কি আছে তাও উদঘাটন করে নিয়েছে।

মেহমান তাকে বলে, স্মরণ রেখ!আমাকে শুধু খাবারই খাইয়েছ এর বেশি তুমি আর কী করেছ আমার জন্য। কিন্তু তোমার প্রতি আমার অনুগ্রহ অনেক বড়। তুমি তোমার এই কক্ষ বা কামরার দিকে তাকাও যে কক্ষে আমাকে বসিয়েছ অর্থাৎ এই ড্রয়িংরুম, এতে বেশ কয়েক হাজার রুপির আসবাবপত্র পড়ে আছে। তুমি যখন খাবার আনার জন্য ভেতরে গিয়েছিলে আমি চাইলে দিয়াশলাই এর আগুনে এসব পুড়ে ভস্মীভূত করে দিতে পারতাম। এখন তুমিই বল, আগুন লাগিয়ে দিলে এক পয়সার জিনিসও কি রক্ষা পেত? কিন্তু আমি এমনটি করিনি। আমার এই অনুগ্রহ কি কোনভাবে খাটো করে দেখার মতো? একথা শুনে গৃহকর্তা বলেন, সত্যিই আপনার অনুগ্রহ অনেক বড়, আমি এর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, আপনি আমার ঘর জ্বালিয়ে দেননি। অতএব দেখ! এমন মানুষও আছে যারা অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহকে বোঝা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পরিবর্তে মনে করে, আমি এর প্রতি অনুগ্রহ করছি বা ইহসান করছি। অতএব একজন মু'মিনের অনুগ্রহকারীর প্রতি সত্যিকার অর্থেই কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, এই ব্যক্তির মতো অকৃতজ্ঞ হওয়া উচিত নয়।

এক জায়গায় হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) মুরুব্বী ও মুবাল্লিগদেরকে নসীহত করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বর্ণিত একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন, এক বাদশাহ্ ছিল যে কোন পীরের গভীর ভক্ত এবং অনুরক্ত ছিল আর মন্ত্রীকে বলতো, আমার পীরের সাথে সাক্ষাৎ কর। কিন্তু মন্ত্রী যেহেতু তার পীরের স্বরূপ জানতো তাই তাকে এড়িয়ে চলতো। অবশেষে একদিন পীরের কাছে যাওয়ার সময় বাদশাহ্ মন্ত্রীকেও সাথে নিয়ে যায়। পীর সাহেব বাদশাহ্‌কে সম্বোধন করে বলে, বাদশাহ্ সালামত! ধর্মসেবা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। আলেকজান্ডার বাদশাহ্ ইসলামের অনেক সেবা করেছেন যার ফলে আজ পর্যন্ত তার সুখ্যাতি রয়েছে। (পূর্বেও অন্য কোন বরাতে আমি এটি বর্ণনা করেছি।) একথা শুনে মন্ত্রী বলেন, দেখুন হুযূর! পীর সাহেব ওলী হওয়ার পাশাপাশি ইতিহাসেরও অনেক পারদর্শী। আলেকজান্ডার তো ইসলামের (আবির্ভাবের) অনেক পূর্বেই অতিবাহিত হয়েছেন অথচ পীর সাহেব তার কথাই বলছেন। অর্থাৎ পীর সাহেব কেবল ওলী আল্লাহ্‌ই নন বরং মনে হচ্ছে তিনি অনেক বড় ঐতিহাসিকও কেননা; তিনি নতুন ইতিহাস রচনা করছেন। এর ফলে বাদশাহ্‌র হৃদয়ে পীরের বিরুদ্ধে ঘৃণা জন্মে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই কাহিনী বর্ণনা করার পর বলতেন, বৈঠকে আলোচিত বিষয়ের জ্ঞান যদি না থাকে তাহলে মানুষ অন্যদের দৃষ্টিতে হেয় বা তুচ্ছ প্রমাণিত হয়। একইভাবে সভার নিয়ম কানুন বা আদবেরও জ্ঞান থাকা চাই। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কোন পরামর্শ সভা চলাকালে একজন বড় আলেম যদি সেখানে গিয়ে সবার সামনে শুয়ে পড়ে তাহলে কেউ তার জ্ঞানের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না বরং মানুষের মনে তার সম্পর্কে

বিরুপ ধারণা সৃষ্টি হবে। তাই যে সভাই হোক না কেন বা যেমন সভাই হোক না কেন একজন মুবাল্লিগ এবং মুরুব্বী যখন সেই সভায় যোগ দিবে তার সেই বৈঠক সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

তাই প্রত্যেক মুবাল্লিগের ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, চিকিৎসা শাস্ত্র, কথা বলার রীতি নীতি, বৈঠকের নিয়ম কানুন ইত্যাদির অন্ততঃপক্ষে ততটুকু জ্ঞান থাকা আবশ্যক যতটা ভদ্রলোকদের বৈঠকে অংশ গ্রহণের জন্য আবশ্যক। আর এটি কঠিন কিছু নয়। স্বল্প পরিশ্রমেই তা আয়ত্তহতে পারে। তাই জ্ঞানের সব শাখার প্রারম্ভিক পুস্তক-পুস্তিকা পড়ে নেয়া উচিত। এছাড়া আজকাল আমাদের মুরুব্বী ও মুবাল্লিগদের যুগের চলমান অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় বা কারেন্ট এফেয়ার্স সংক্রান্ত প্রশ্ন করা হয়। আর অনেক সময় যেহেতু রীতিমত পত্র পত্রিকা পড়া হয় না তাই সঠিক জ্ঞানও থাকে না বা খবরও শুনে না তাই জ্ঞান থাকে না অথবা কোন বিষয়ের যেহেতু গভীরে অবগাহন করে না তাই অনেক সময় বৈষয়িক মনমানসিকতার অধিকারী ব্যক্তিদের ওপর এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে থাকে। অনেক স্থান থেকে এমন অভিযোগও আসে। তাই চলমান ঘটনাবলী সম্পর্কে জ্ঞান রাখা আর যেই সভায় যায় সেই সভা সংক্রান্ত কিছুটা জ্ঞান অবশ্যই অর্জন করে যাওয়া উচিত।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। তিনি বলতেন, এক ব্যক্তির দুই পুত্র ছিল। সেই ব্যক্তি তাদের উভয়ের মাঝেতার ধন-সম্পদ বন্টন করে দেয়। ছোট ছেলে তার সব সম্পদ নিয়ে সুদূর কোন এলাকায় চলে যায় আর পুরো সম্পদ অপকর্মে নষ্ট করে। অবশেষে সে কোন ব্যক্তির রাখাল হিসেবে চাকরী নেয়। তার সবকিছু হারিয়ে যায়। অবশেষে তাকে মজদুরী করতে হয়। এমতাবস্থায় তারমনে পড়ে, আমার পিতার ঘরে কতই না এমন শ্রমিক বা মজদুর রয়েছে যারা বেহিসাব খাবার খাচ্ছে আর আমি এখানে মজদুরি করা সত্ত্বেও ক্ষুধায় মারা যাচ্ছি। তাই পিতার কাছে গিয়ে আমি একথা কেন বলি না যে, আমাকেও শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত করুন। এরপর সে তার পিতার কাছে যায়। পিতা তাকে দেখে খুবই আনন্দিত হয় এবং তাকে বুকে টেনে নেয় আর চাকর-বাকরদের বলে, মোটা তাজা বাছুর এনে জবাই কর যেন আমরা তা উপভোগ করতে পারি। তার দ্বিতীয় ছেলে যাকে সম্পদ দেয়া হয়েছিল এবং যে ভালো ব্যবসা করছিল, এটি দেখে তার খুবই মন খারাপ করে। সে ভাবে, যে সবকিছু উড়িয়ে এসেছে তারই এত সেবা-যত্ন হচ্ছে। সে তার পিতাকে বলে, আমি এত বছর ধরে আপনার সেবা করছি, কোন সময় আপনার নির্দেশ অমান্য করিনি, কিন্তু আপনি কখনও একটি ছাগলের বাচ্চাও এই মর্মে দেননি যে, বন্ধুদের নিয়ে এটি উপভোগ কর। কিন্তু আপনার এই ছেলে যে আপনার পুরো সম্পদ বিলাসিতায় নষ্ট করে এসেছে তার ফিরে আসার পর আপনি আপনার পালিত বাছুর জবাই করিয়েছেন। তার পিতা তখন বলেন, তুমি সবসময় আমার কাছে আছ, আমার যা কিছু আছে সবই তোমার। তোমার এই ভাইয়ের আগমনকে আমরা এজন্য উদযাপন করছি যে, সে মৃত ছিল, এখন জীবন ফিরে পেয়েছে, হারিয়ে গিয়েছিল, এখন তাকে ফিরে পেয়েছি।

অতএব কোন ব্যক্তি যদি ভুল করে আর ভুলের পর আল্লাহ্‌র দরবারে ফিরে আসে এবং আল্লাহ্ তা'লার সামনে বিনত হয়ে নিজের ভুল স্বীকার করে আর অনুশোচনা করে তখন আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই এমন ব্যক্তির তওবা গ্রহণ করেন এবং তার প্রতি পূর্বের চেয়ে অধিক করুণা প্রদর্শন করেন। অতএব এক মু'মিন যে চায়, খোদা তালাও আমার সাথে এমন ব্যবহার করুন তারও উচিত খোদার এই বৈশিষ্ট্যাবলী ধারণ, গ্রহণ এবং অবলম্বন করে যেখানে সে দেখবে যে, তার ভাই, এমন ভাই যারা কোন ভুল ত্রুটি করেছে, যদি প্রকৃত আন্তরিকতার সাথে ক্ষমা চায় এবং ভুল ত্রুটি স্বীকার করে তাহলে তাদের মার্জনা করা উচিত। একই সাথে তাদের জন্য দোয়াও করা উচিত। আর যারা ক্ষমা চায় না তাদের জন্যও দোয়া করা উচিত যাতে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরও আর আমাদেরও ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করেন এবং আমাদেরকেও মার্জনা করুন।

মানুষের চরিত্র সবসময় সুদৃঢ় এবং উন্নত হওয়া উচিত। এমন হওয়া উচিত নয় যে, কখনও এক প্রকার আচরণ করব আর কখনও ভিন্ন আচরণ। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন, এক রাজা একবার বেগুন খেয়ে খুবই স্বাদ পায়। অনেকেই এই গল্প শুনে থাকবেন। দরবারে এসে সে বলে, বেগুন কতই না ভাল বা সুস্বাদু। রাজার একজন মোসাহেব ছিল, সেও বেগুনের প্রশংসা করতে আরম্ভ করে। সে বলে, বাকি কথা বাদই দিলাম। এর চেহারা দেখুন! কত সুন্দর। আর মাথা এমন যেন কোন পীর সবুজ পাগড়ী পরে রেখেছে। আর তার নিলাভ পোশাকের সামনে আকাশের রঙও যেন ম্রিয়মান। আর গাছের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় একে এমন মনে হয় যেন কোন যুবরাজ দোল খাচ্ছে। সে এইভাবে বেগুনের প্রশংসা করতে থাকে এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে বেগুনের যত উপকারি দিক ছিল তার প্রতিটি তুলে ধরে। এসব কথা শুনে রাজার আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং কিছুদিন পর্যন্ত সে কেবল বেগুনই খেতে থাকে। বেগুন যেহেতু গরম হয়ে থাকে তাই কষ্ট আরম্ভ হয় এবং রাজা অসুস্থ হয়ে পড়ে।এরপর একদিন রাজা বলে, বেগুন খুবই বাজে জিনিস। একই মোসাহেব বা সহচর তখন বেগুনের কুৎসা আরম্ভ করে। সে বলে, এর চেহারা দেখুন! কত কুৎসিত এবং কালো আর পা নীল। এরচেয়ে বেশি আর কি বলা যেতে পারে যে, কেউ যেন তাকে উল্টো লটকিয়ে রেখেছে যেভাবে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন প্রত্যেক জিনিসের উপকারী এবং অপকারী উভয় দিকই থাকে; সেই মোসাহেব বা সহচরও তখন চিকিৎসা শা একজন বলে, ব্যাপার কি, সেদিন তো বেগুনের খুবই প্রশংসা করছিলে আর আজ এর কুৎসা করছো। অন্ততঃপক্ষে সত্য কথা বলা শিখ। সেই মোসাহেব উত্তর দেয়, আমি রাজার চাকর, বেগুনের চাকর নই। অধুনা মুসলমান বিশ্বে সচরাচর এমনটিই চোখে পড়ে আর এদেরকে দেখে আমাদেরও শিক্ষা নেয়া উচিত। চরিত্রের দিক থেকে বা আচার আচরণের দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে উন্নত চরিত্র মুসলমানের হওয়া উচিত কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ এরাই চরিত্রের দিক

থেকে সবচেয়ে হীন এবং সবচেয়ে অধঃপতিত। সত্যের ওপর অবিচল থাকার তো প্রশ্নই উঠে না।যেখানেই স্বার্থ দেখে তার পেছনেই ছুটে, তা সে কোন নেতা হোক বা কোন সাধারণ মানুষই হোক না কেন। সত্যের ওপর অবিচল থাকার দাবি হলো, সঠিক এবং ভ্রান্তকে সামনে রেখে সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরামর্শ দেয়া এবং কোন মতামত ব্যক্ত করা

এরপর আমি আরো একটি ঘটনা বর্ণনা করছি, খোদার সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে। আল্লাহ্‌র সাথে সু-সম্পর্ক স্থাপনই সমস্যার সমাধান বয়ে আনে আর এই সম্পর্ক সুদৃঢ় হয় তাক্বওয়া বা খোদাভীতির কল্যাণে। আমরা আহমদীরা, যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মেনে সঠিক ইসলামী শিক্ষা অনুসারে জীবন যাপন করার দাবি করি, আমাদের এই জীবনের জন্য সর্বাবস্থায় খোদার দিকেই চেয়ে থাকা উচিত, খোদাতেই দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকা উচিত, তাঁর সাথেই সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত। আমাদের সাফল্য কখনও জাগতিক কথাবার্তায় আসতে পারে না। অতএব আমরা যদি নিজেদের হৃদয়ে খোদাভীতি এবং তাক্বওয়া সৃষ্টি করি তবেই আমরা সাফল্য পাব। এমনটি যদি হয় তাহলে ফিরিশ্‌তারা আমাদের চলার পথ সুগম করবে, ইনশাআল্লাহ্।

অতএব আমাদের সবার একথা ভাবতে হবে, আমাদের তাক্বওয়া সৃষ্টির চেষ্টা করতে হবে এবং খোদার সাথে আমাদের সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। আমাদের অভিজ্ঞতা হলো, একজন দুনিয়াদার মানুষের সাথে সম্পর্ক যেখানে একজন জগৎ-পূজারীর জন্য কল্যাণকর হয়ে থাকে সেখানে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক তার চেয়ে হাজার বরং লক্ষ গুণ বেশি উপকারী হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একটি গল্প বা কাহিনী বর্ণনা করতেন, এক ব্যক্তি কোন সফরে যাত্রার পূর্বে কাজীর কাছে কিছু রুপি আমানতস্বরূপ রেখে যায়, দীর্ঘদিন পর ফিরে এসে সে যখন রুপি ফেরত চায়, কাজীর রূপী ফেরত দেয়ার ইচ্ছা বদলে যায়, সে বলে, মিঞাঁ বিবেক বুদ্ধি খাটাও, কোন রুপির কথা বলছ, আমার কাছে কখন রুপি রেখেছিলে? তার কাছে লিখিত কোন প্রমাণ ছিল না, কেননা সে মনে করতো, কাজী সাহেবের ব্যক্তিত্বই প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট। কাজী সাহেব বলে, যদি কোন রুপি রেখে গিয়ে থাক তাহলে প্রমাণ নিয়ে আস, কোন রশীদ দেখাও বা কোন স্বাক্ষী নিয়ে আস। সে স্মরণ করানোর অনেক চেষ্টা করে কিন্তু কাজী বলে, কিছুই রাখনি, তোমার কাণ্ড-জ্ঞান লোপ পেয়েছে, কোন রুপি রেখে যাও নি। অবশেষে সে বাদশাহ্‌র কাছে অভিযোগ করে।

বাদশাহ্ বলে, আমি বিচারিক দৃষ্টিকোণ থেকে তোমার পক্ষে কিছুই করতে পারব না, তোমার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত দিতে আমি বাধ্য, কেননা লিখিত কোন প্রমাণ নেই আর স্বাক্ষীও নেই, হ্যাঁ, একটি কৌশল তোমাকে বাতলে দিচ্ছি, যদি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে তাতে তোমার উপকার হতে পারে। অমুক দিন আমার শোভাযাত্রা বের হবে আর কাজীও তার বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে, বাদশাহ্ শহরে ঘুরবেন। তুমিও তার সাথে কোন স্থানে দাঁড়িয়ে যেয়ো। আমি তোমার কাছে পৌঁছে তোমার সাথে অকৃত্রিমভাবে কথা-বার্তা বলব, যেমন বলব যে তুমি আমার সাথে দেখা করতে কেন আসনি, দীর্ঘকাল সাক্ষাৎ হয়নি, এ ধরণের কথা বলব। আর তুমি আমাকে বলো, কিছু দুঃশ্চিন্তা ছিল, সমস্যা ছিল, তাই উপস্থিত হতে পারি নি। সেই ব্যক্তি কার্যতঃ এমনটিই করে। শোভাযাত্রার দিন সে কাজী সাহেবের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়, বাদশাহ্ আসেন এবং কাজী সাহেবের পরিবর্তে সেই ব্যক্তিকে সম্বোধন করে কথা বলা আরম্ভ করেন।

তিনি বলেন, তুমি চলে গিয়েছ, দীর্ঘদিন সাক্ষাৎ হয়নি, সফরের পুরো বৃত্তান্ত সে শোনায়। এরপর বাদশাহ্ বলে, ফিরে এসে কেন দেখা কর নাই? সে বলে, কিছু সমস্যা ছিল, কিছু উসুলী ইত্যাদির কাজ ছিল।

বাদশাহ্ তাকে বলেন, তোমার তবুও দেখা করা উচিত ছিল, ঘন ঘন সাক্ষাতের জন্য এসো। বাদশাহ্‌র শোভাযাত্রা যখন চলে যায় তখন কাজী সাহেব সেই ব্যক্তিকে বলে, মিঞাঁ কথা শোন! তুমি সেদিন আমার কাছে এসেছিলে আর কোন আমানতের কথা বলছিলে, আমি এখন বয়োবৃদ্ধ মানুষ, স্মৃতিশক্তি খুব একটা কাজ করে না, আমাকে কিছু লক্ষণাবলীর কথা স্মরণ করাও, তাহলে মনে পড়তে পারে।

পূর্বে কাজী সাহেবের সাথে যেসব কথা হয়েছিল তিনি সেসব কথারই পুনরাবৃত্তি করে। কাজী সাহেব তখন বলে আচ্ছা, অমুক ধরণের থলি ছিল তোমার যা আমার কাছে পড়ে আছে, এসে নিয়ে যাও, আর এনে তাকে রুপি দিয়ে দেয়। এই কাহিনী শুনিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন, এই পৃথিবীর বিরোধিতার কিসের ভয়, বড় থেকে বড় কোন জেনারেলও তরবারী বা গুলি ইত্যাদি দ্বারাই ক্ষতি সাধন করতে পারে কিন্তু এসব এসবই আমাদের খোদার।যদি তিনি বলেন, এভাবে আঘাত করো না তাহলে কে করতে পারে? অতএব খোদার সাথেই বান্দার বন্ধুত্ব করা উচিত, তাঁকেই ভালোবাসা উচিত, ভয় করলে বা মরলে মারলে কোন কার্য সিদ্ধি হতে পারে না। উন্নতির রহস্য হলো, নিজেকে খোদার হাতে সমর্পণ করা আর তিনি যে দিকে নিয়ে যেতে চান সেদিকে ধাবিত হওয়া।

একজন প্রকৃত মু'মিনের পরিচয় কী? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সত্যিকার মু'মিনের তুলনা করতেন সত্যিকার বা প্রকৃত বন্ধুর সাথে, তিনি বলতেন, কোন এক সম্পদশালী ব্যক্তি ছিল, তার ছেলের কিছু ভবঘুরে বা বাউন্ডলে বন্ধু ছিল। তার পিতা তাকে বুঝায়, এরা তোমার প্রকৃত বন্ধু নয়, এরা শুধু লোভের বশবর্তী হয়ে তোমার কাছে আসে, নতুবা তাদের একজনও এমন নেই যে তোমার প্রতি বিশ্বস্ত। কিন্তু সেই ছেলে পিতাকে উত্তর দেয়, মনে হয় যেন আপনি জীবনে কোন সত্যিকার বন্ধু পান নি, তাই সবার সম্পর্কে একই ধারণা পোষণ করেন। আমার বন্ধুরা এমন নয়, তারা পরম বিশ্বস্ত, আমার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেও তারা প্রস্তুত। পিতা তাকে বুঝান, সত্যিকার বন্ধু পাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার।

পিতা বলেন, সারা জীবনে আমি একজন মাত্র সত্যিকার বন্ধু পেয়েছি। কিন্তু সেই ছেলে তার হঠকারিতায় ছিল অনড়। কিছু দিন পর সে পিতার কাছে খরচের কিছু

টাকা চায়, পিতা বলে, আমি তোমার খরচ চালাতে পারব না, তোমার বন্ধুদের কাছে চাও, আমার কাছে এখন কিছুই নেই। সত্যিকার অর্থে পিতা ছেলের বন্ধুদের পরীক্ষা করার কোন সুযোগ খুঁজছিলেন। পিতার না করে দিয়েছে এটি যখন বন্ধুরা জানতে পারে যে, ঘর থেকে তাকে না করে দেয়া হয়েছে তখন বন্ধুরা তার কাছে যাতায়াত বন্ধ করে দেয়, মেলা-মেশা ছেড়ে দেয়।

অবশেষে নিরূপায় হয়ে এই ছেলে নিজেই বন্ধুদের সাথে সাক্ষাতের জন্য তাদের ঘরে যায়। কিন্তু যে বন্ধুর দরজায়ই কড়া নাড়তো সে ভেতর থেকে সংবাদ পাঠাতো যে, সে ঘরে নেই, কোথাও বাইরে গিয়েছে বা সে অসুস্থ এখন দেখা করা সম্ভব নয়। এভাবে সে সারা দিন ঘুরে বেড়ালেও কোন বন্ধুই তার সাথে দেখা করার জন্য বাহিরে আসে নি, অবশেষে সন্ধ্যা বেলা বাসায় ফিরে আসে। পিতা তখন জিজ্ঞেস করেন, বন্ধুরা কি উত্তর দিয়েছে? সে বলে, সবাই হারাম খোর, অকৃতজ্ঞ, কেউ কোন বাহানা করেছে, কেউ অন্য কোন অজুহাত দেখিয়েছে।

পিতা বলেন, আমি কি তোমাকে পূর্বেই একথা বলিনি যে, এরা বিশ্বস্ত নয়। ভাল হয়েছে, তোমারও একটা অভিজ্ঞতা হলো। এসো এখন আমার বন্ধুর সাথে তোমার সাক্ষাৎ করাই। এরপর তারা পাশেই এক জায়গায় যায় যেখানে তার এক বন্ধু বসবাস করতো। সেই বন্ধু কোন জায়গায় সিপাহী হিসেবে কাজ করত। পিতা-পুত্র উভয়ে তার ঘরে পৌঁছে দরজার কড়া নাড়ে। ভেতর থেকে আওয়াজ আসে যে, আমি আসছি। অনেক সময় পার হয়ে গেলেও দরজা খোলার জন্য কেউ আসেনি। তখন ছেলের হৃদয়ে বিভিন্ন চিন্তাধারার উদয় হতে থাকে, সে তার পিতাকে বলে, আব্বু! মনে হয় আপনার বন্ধুও আমার বন্ধুদের মতই। তিনি বলেন, কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। এরপর আরও কিছুটা সময় কেটে যায়। এরপর দরজা খুলে সেই বন্ধু যখন বাহিরে আসে তখন তার গলায় একটি তরবারী ঝুলছিল, এক হাতে ছিল একটি থলি আর অন্য হাতে ছিল স্ত্রীর বাহু।

দরজা খুলেই সে বলে, আমায় ক্ষমা করবেন, আপনার কষ্ট হয়েছে, আমি তাড়াতাড়ি আসতে পারি নি, দ্রুত আসতে না পারার কারণ হলো, আপনি যখন কড়া নাড়েন তখনই আমি বুঝতে পেরেছি, নিশ্চয় বিশেষ কোন কারণ আছে যে কারণে আপনি নিজেই এসেছেন নতুবা আপনি কোন চাকরকেও পাঠাতে পারতেন। আমি যখন দরজা খুলতে চাইলাম তখন হঠাৎ করে আমার মনে পড়লো, হয়তো কোন সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমার কাছে এই তিনটি জিনিসই ছিল, একটি তরবারী আর একটি থলি যাতে আমার এক বছরের খরচ রয়েছে, কয়েকশত রুপি আছে, আর আমার স্ত্রী এজন্য এসেছে যে, হয়তো আপনার ঘরে কোন সমস্যা হয়েছে তাই সে খিদমতের জন্য এসেছে। আর দেরী হওয়ার কারণ হলো আমার এই থলিটি মাটির নিচে পুঁতে রাখা ছিল যা বের করতে সময় লেগেছে। এরপর ভাবলাম, হয়তো এমন কোন সমস্যার উদয় হয়েছে যেখানে কোন সাহসী ব্যক্তি কাজে আসতে পারে তাই তরবারী সাথে নিয়ে এসেছি, জীবনের যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমার জীবনও যেন উৎসর্গ করতে পারি। এরপর আমি ভাবলাম, যদিও আপনি সম্পদশালী কিন্তু হয়তো এমন কোন সমস্যা দেখা দিয়েছে যার ফলে আপনার সকল সম্পদ হারিয়ে গেছে আর আমি হয়তো অর্থের মাধ্যমে আপনার সাহায্য করতে পারি, এ কারণেই এই থলি সাথে এনেছি। এরপর ভাবলাম, রোগ-ব্যাধি মানুষের নিত্য সাথী, হতে পারে আপনার ঘরে বা আপনার স্ত্রীর কোন সমস্যা হতে পারে, তাই আমার স্ত্রীকেও সাথে নিয়ে এসেছি যেন সে সেবা করতে পারে। সেই সম্পদশালী ব্যক্তি বলেন, হে আমার বন্ধু! আমার এখন কোন সাহায্যের প্রয়োজন নেই আর আমি এমন কোন সমস্যারও সম্মুখীন নই বরং আমি কেবল আমার ছেলেকে শেখাতে নিয়ে এসেছি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন, এটিই হলো প্রকৃত বন্ধুত্ব আর এর চেয়েও ঘনিষ্ট বন্ধুত্ব মানুষের আল্লাহ্‌র সাথে স্থাপন করা উচিত এবং নিজ প্রাণ, সম্পদ এবং যাকিছু আছে তার সব কিছু উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। এক বন্ধু যেভাবে কখনও মানায় আবার কখনও মানে, অনুরূপভাবে মানুষের জন্য আবশ্যক হলো, আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহ্ তা'লার পথে ত্যাগ স্বীকার অব্যাহত রাখা। খোদা তা'লা আমাদের কত কথা মানেন। দিবা-রাত্র আমরা তাঁর প্রদত্ত নিয়ামতরাজি ভোগ করি। তিনি আমাদের আরাম-আয়েশের জন্য যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সেসব আমরা ব্যবহার করি। কোন্ অধিকার বলে আমরা এগুলোকে উপভোগ করছি বা ভোগ করছি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কত বাসনা পূর্ণ করেন। দু'একবার আমাদের ইচ্ছা-পরিপন্থী কিছু হলে মানুষ খোদা সম্পর্কে কত ঘৃণ্য কু-ধারণা পোষণ করতে আরম্ভ করে। আসল বিষয় হলো, স্বাচ্ছন্দ্য হোক বা অস্বাচ্ছন্দ্য আর সুখ হোক বা দুঃখ, সর্বাবস্থায় অবিচল থাকা উচিত, সে যেন দোদুল্যমান না হয়।

অতএব যারা যথাযথভাবে নামায পড়ে না তাদের আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত। এমন মানুষ যারা ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার অঙ্গীকার রক্ষা করে না তাদের আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত। এমন মানুষ যারা আহমদীয়াতের কল্যাণে এখানে এসেছে কিন্তু এখানে এসে ভুলে গেছে যে, আহমদীয়াতের সুবাদেই তারা এখানে থাকার এবং নাগরিক সুযোগ-সুবিধার অধিকার পেয়েছে। এমন লোকদের জামাতের খিদমতের জন্য এগিয়ে আসা উচিত। কিন্তু এটি তারা ভুলে যায় এবং আপত্তিও করতে আরম্ভ করে। এমন মানুষ ভালো ইবাদতকারীও নয় এবং বিশ্বস্তও নয়। বিশ্বস্ততা হলো যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, স্বাচ্ছন্দ্য-অস্বাচ্ছন্দ্য, সুখ-দুঃখ উভয় অবস্থায় এর উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। খোদা তা'লার জন্য সর্বাবস্থায় এবং সর্বদা তাঁর দ্বারে উপস্থিত থেকে কুরবানীর জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখা উচিত। নবীগণ এবং খোদার বান্দাদের ক্ষেত্রে বন্ধুত্বের দাবি রক্ষাকারী যেই ব্যক্তির ঘটনা আমি এই মাত্র শুনিয়েছি তা কীভাবে প্রযোজ্য হয় তাও হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) খুব সুন্দরভাবে এবং চিত্তাকর্ষক ও আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরেছেন। যেখানে ভালোবাসা থাকে সেখানে যুক্তি প্রমাণ চাওয়া হয় না, সেখানে মানুষ প্রথমে আনুগত্যের ঘোষণা

দেয় এরপর চিন্তা করে, এই নির্দেশ আমি কীভাবে পালন করতে পারি। নবীদের অবস্থা এমনই হয়ে থাকে।

খোদার প্রথম বাণী যখন অবতীর্ণ হয় তখন তাদের হৃদয়ে খোদাপ্রেম এমন পর্যায়ে উপনীত থাকে যে, তারা কোন যুক্তি প্রমাণ দাবি করে না আর খোদার বাণী যখন তাদের কানে পৌঁছে তারা এ কথা বলেন না যে, হে খোদা! তুমি কি আমাদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করছ, কোথায় আমরা আর কোথায় এই কাজ, বরং তারা বলেন, হে আমাদের প্রভু! খুব ভাল কথা এবং একথা বলেই সেই কাজের জন্য দন্ডায়মান হয়ে যায়। এরপর চিন্তা করে, এখন কি কর্মপন্থা নির্ধারণ করা উচিত। মহানবী (সা.) একথাই করেছেন। আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-ও সে রাতে এমনটিই করেছেন যে রাতে আল্লাহ্ তা'লা বলেছিলেন, উঠ এবং পৃথিবীর হিদায়াতের জন্য দন্ডায়মান হও। আর তিনিসঙ্গে সঙ্গে দন্ডায়মান হন এবং এরপর চিন্তা করতে আরম্ভ করেন, এ কাজ কীভাবে সাধিত হতে পারে।

অতএব আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পূর্বে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) যখন একথা বলছিলেন, তখন পঞ্চাশ বছর ছিল কিন্তু আজকে এই কথার প্রায় ১২৫ বছর কেটে গেছে বরং ১২৬ বা ১২৭ বছর হবে। তিনি (রা.) বলেন, আজ থেকে ৫০ বছর পূর্বের সেই ঐতিহাসিক রাত যা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নির্ধারণের ক্ষেত্রে সফল অস্ত্র প্রমাণিত হবে, যা ভবিষ্যৎ জগতের জন্য প্রথম রাত এবং প্রথম দিন আখ্যা পাওয়ার কথা, সেই রাতের কথা যদি আমারা চিন্তা করি তাহলে আমাদের হৃদয় এই আনন্দকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখবে। আমাদের ক'জন এমন আছে যারা চিন্তা করে যে, এই আনন্দ কোন্ বিশেষ মুহূর্তে বা কি কারণে তারা লাভ করেছেন? অর্থাৎ যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছেন।

এই আনন্দ এবং প্রশান্তিপূর্ণ মাহেন্দ্রক্ষণ কোন বরকতময় মুহূর্তের সুবাদে লাভ হয়েছে? কোন অমানিশার পর তাদের জীবনে সফলতার এই প্রভাতউদিত হয়েছে? অনেকেই মসীহ্ মওউদের অপেক্ষায় এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে কিন্তু যারা গ্রহণ করেছে এবং গ্রহণের সুযোগ পেয়েছে তারা এভাবে চিন্তা করে যে, এই আনন্দ, এই প্রশান্তি, এই সফলতা এবং এই সাফল্য সেই বিশেষ মুহূর্ত এবং রাতের কল্যাণে লাভ হয়েছে যখন এক নিঃসঙ্গ বান্দা যিনি পৃথিবীর দৃষ্টিতে তুচ্ছ এবং সমস্ত জাগতিক উপায় উপকরণ থেকে বঞ্চিত ছিলেন, তাকে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, উঠ এবং বিশ্ববাসীর হিদায়তের জন্য দন্ডায়মান হও। তিনি উত্তর দেন, হে আল্লাহ্! আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। এই ছিল সেই বিশ্বস্ততা, এটি ভালোবাসার সেই পরম বহিঃপ্রকাশ ছিল যেটিকে খোদা তা'লা গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা দিয়েছেন এবং নিজ অপার করুণায় তা গ্রহণ করেছেন। হাসি এবং ক্রন্দন উভয়টি খোদা তা'লার সত্তার ক্ষেত্রে অকল্পনীয়, খোদা হাসেনও না কাঁদেনও না, কিন্তু ভালোবাসার সংলাপে, ভালোবাসার আলাপচারিতায় এমন কথা এসেই যায়। যেভাবে হাদীসেও আছে, একজন সাহাবী আতিথ্য করেন খোদা তা'লা তাদের কাজে আনন্দিত হন এবং হাসেন।

যাহোক তিনি বলেন, আমি বলছি, খোদারও যদি কাঁদার রীতি থাকতো বা হাসার রীতি থাকতো তাহলে আল্লাহ্ তা'লা যখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে বলেছিলেন যে, আমি তোমাকে জগদ্বাসীর সংশোধনের জন্য দন্ডায়মান করছি এবং তিনি (আ.) তাৎক্ষণিকভাবে দাঁড়িয়ে যান এমনকি তিনি ভাবেনও নি যে, এ কাজ আমার হাতে কীভাবে সাধিত হতে পারে? যদি তখন খোদার জন্য কাঁদার রীতি থাকত তাহলে আমি নিশ্চিত, খোদা কেঁদে উঠতেন আর খোদার জন্য যদি হাসার নিয়ম থাকত তাহলে অবশ্যই তিনি হেসে উঠতেন। তিনি হাসতেন বাহ্যতঃ এই নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত দাবির কারণে যে, সারা পৃথিবীকে মোকাবিলা করার দাবি করছে এক দুর্বল এবং অক্ষম বান্দা, আর তিনি কাঁদতেন সেই ভালোবাসার প্রেরণা দেখে যা সেই নিঃসঙ্গ এবং সহায় সম্বলহীন ব্যক্তি প্রকাশ করে। এই প্রকৃত বন্ধুত্বই খোদার দরবারে গৃহীত হয়েছে।

অতএব সত্যিকার বন্ধুত্বই অর্থাৎ এমন প্রকৃত বন্ধুত্বই পৃথিবীতে কাজে আসে। দুই বন্ধুর যে ঘটনা আমি শুনিয়েছি অর্থাৎ ধনী ও দরিদ্র ব্যক্তিরঘটনা আমি বর্ণনা করেছি তা তিনি এরপরবর্ণনা করেন। তিনি বলেন, পৃথিবীর মানুষের ভাষায় এটি বন্ধুত্বের এক উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। আর এমন আন্তরিকতা দেখে মানুষ হৃদয়ে এক প্রবল আবেগ ও উচ্ছাস অনুভব না করে পারে না কিন্তু এরূপ বন্ধুত্বের বহিঃপ্রকাশ সেই বন্ধুত্বের মোকাবিলায় কিছুই নয়, যা নবী, আল্লাহ্ তা'লার জন্য প্রকাশ করে থাকেন। সেখানে প্রতিটি পদক্ষেপে থাকে সমস্যা। সেখানে প্রতিটি পদক্ষেপে ত্যাগ স্বীকার করতে হয় আর প্রতিটি পদক্ষেপে সমস্যায় জর্জরিত হতে হয়। অতএব নবীরা খোদাকে এমনই উত্তর দেন বরং তার চেয়েও অনেক মহান হয়ে থাকে যা সেই দরিদ্র ব্যক্তি ধনী ব্যক্তিকে দিয়েছেন। আমরা সামগ্রীক দৃষ্টিকোণ থেকে যদি তাকাই আর যুক্তির নিরিখে যদি তার সম্পর্কে ভাবি, তাহলে সেই দরিদ্র ব্যক্তির আচরণ নিঃসন্দেহে হাস্যস্কর মনে হয়।

কেননা সেই ধনী ব্যক্তির সহস্র সহস্র কর্মচারী ছিল, তাদের বর্তমানে তার স্ত্রী অতিরিক্ত কি আর সেবা দিতে পারত। এছাড়া তার লক্ষ লক্ষ রূপি ছিল, একশ' বা দেড়শ' রুপির থলিতে তার কিইবা লাভ হতো?। এছাড়া তার অনেক পাহারাদার এবং নিরাপত্তারক্ষী ছিল এই লোকের তরবারী তাকে এমন আর কি অতিরিক্ত নিরাপত্তা দিতে পারত? কিন্তু ভালোবাসার আতিশয্যে সে একথা চিন্তা করেনি যে, আমার তরবারী কি কাজে আসবে? আমার সামান্য রুপি নিলে কি লাভ হবে? আমার স্ত্রী কিইবা সেবা করবে? সে শুধু একথাই চিন্তা করেছে যে, আমার কাছে যা কিছু আছে তা নিয়েই আমার হাজির হওয়া উচিত।

অতএব ভালোবাসার পরম আবেগ যখন মাথাচাড়া দেয় বিবেক সেখানে কোন কাজে আসে না, ভালোবাসা বিবেককে তখন ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আর ভালোবাসা দুঃশ্চিন্তাকেও দূরে ছুঁড়ে ফেলে এবং ভালোবাসা বা প্রেম নিজেসামনে এসে যায়। যেভাবে চিল যখন মুরগীর ছানার ওপর হামলা করে মুরগী-ছানাকে একত্রিত করে নিজ ডানার নিচে লুকিয়ে রাখে।

আমরা এ কারণে তাঁর হাতে বয়আতের এই অঙ্গীকার করি যে, আমরা তাঁর কাজে তাঁর সাহায্যকারী হব, তাহলে আমাদেরকেও সমস্ত শক্তি সামর্থ্য দিয়ে, যাই আছে আমাদের মাঝে, তা স্বল্প হোক বা বেশি, তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসা উচিত এবং আল্লাহ্‌র প্রতিও, তাঁর রসূলের প্রতিও এবং তাঁর মসীহ্‌র প্রতিও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ করা উচিত।

অনেক সময় ভালোবাসা মানুষের হাতে এমন কাজ করায় যে, দুনিয়ার মানুষ সেটিকে উন্মাদনা-প্রসূত কাজ আখ্যায়িত করে কিন্তু সত্যিকার অর্থে সেই উন্মাদনা পৃথিবীর সকল বিবেক বুদ্ধির চেয়ে বেশি মূল্যবান হয়ে থাকে। পৃথিবীর সকল বিবেক বুদ্ধি এক উন্মাদনা প্রসূত-কাজের জন্য উৎসর্গ করা যেতে পারে। প্রকৃত বিবেক-বুদ্ধি সেটিই যা ভালোবাসার ফলে সৃষ্টি হয়। নবী যখন আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এই আওয়াজ পান যে, আল্লাহ্ তা'লা আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, খোদা তা'লা সম্মান এবং মাহাত্ম্যের স্রষ্টা, খোদা তা'লা বাদশাহ্‌দের ফকির আর ফকিরদের বাদশাহ্ বানানোর মালিক, তিনি রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা বা রাজত্ব ধ্বংসকারী খোদা, তিনি সম্পদদাতা এবং সম্পদ প্রত্যাহারকারী খোদা, তিনি রিয্‌ক দাতা এবং জীবিকা প্রত্যাহারকারী খোদা, তিনি আকাশ এবং পৃথিবীর প্রতিটি অণুপরমাণু এবং পুরো বিশ্ব জগতের খোদা।

তিনি এক দুর্বল ও অক্ষম মানুষকে আওয়াজ দেন যে, আমি সাহায্যের মুখাপেক্ষী, আমাকে সাহায্য কর, তখন সেই দুর্বল এবং উপায়হীন বা নিরূপায় ব্যক্তি যুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন না, তিনি একথা বলেন না যে, হুযূর!কি বলছেন? আল্লাহ্ তা'লা কি সাহায্যের মুখাপেক্ষী, হে আল্লাহ্ তুমি কি সাহায্যের মুখাপেক্ষী, তুমি তো আকাশ এবং পৃথিবীর স্রষ্টা। আমি কাঙ্গাল, দরিদ্র এবং অক্ষম মানুষ, আমি তোমাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি? সে এসব কথা বলে না বরং সেই দুর্বল, অক্ষম এবং জীর্ণ-শীর্ণ দেহ নিয়ে সে দাঁড়ায় আর বলে, আমি উপস্থিত, হে আল্লাহ্! আমি উপস্থিত। কে আছে, যে এই আবেগের গভীরতার কথা ধারণাও করতে পারে, শুধু সেই ব্যক্তি ব্যতিরেকে যে এই প্রেমের স্বাদ কিছুটা হলেও পেয়েছে।

তিনি বলেন, আজ থেকে ৫০ বছর পূর্বে, তখন ছিল ৫০ বছর পূর্বে কিন্তু আজকের নিরিখে ১২৬ বছর পূর্বে একই খোদা পুনরায় এই আওয়াজ উত্তোলন করেন এবং কাদিয়ানের নিভৃত এক কোণে বসবাসকারী এক ব্যক্তিকে বলেন, আমার সাহায্যের প্রয়োজন, আমাকে পৃথিবীতে লাঞ্ছিত করা হয়েছে আর পৃথিবীতে আমার কোন সম্মান নেই, পৃথিবীতে আমার নাম নেওয়ার কেউ নেই, আমি সহায় সম্বলহীন এক অসহায় সত্তা।

হে আমার বান্দা! আমাকে সাহায্য কর। তখন সেই বান্দা এই কথা চিন্তা করেননি যে, কে কথা বলছেন আর যাকে সম্বোধন করা হচ্ছে সে কে, তার যুক্তি বা বুদ্ধি এই প্রশ্ন উঠায়নি যে, যিনি আমাকে ডাকছেন তাঁর কাছে তো সর্বশক্তি রয়েছে, আমি কীভাবে তাকে সাহায্য করতে পারি? তার প্রেম তার হৃদয়ে এক প্রকার অগ্নি সঞ্চার করে অর্থাৎ যখন খোদার পয়গাম পান তখন খোদার ভালোবাসা তার হৃদয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। তিনি পাগলপ্রায় হয়ে এবং খালি হাতে, আবেগের আতিশয্যে দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, হে আমার আল্লাহ্! হে আমার প্রভু! আমি উপস্থিত, হে আমার প্রভু! আমি উপস্থিত। আমি ধর্মকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করব।

অতএব আজ আমরা যারা খোদার ভালোবাসায় নিবেদিত এবং খোদার বাণীকে পৃথিবীময় প্রচারের অঙ্গীকার নিয়ে দন্ডায়মান এই ব্যক্তিকে মানার দাবি করি, আজকে আমরা আল্লাহ্ তা'লার প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ দাসের হাতে যারা বয়আতের দাবি করি, যদি আজকে আমরা মনে করি, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমণের মাধ্যমে খোদার প্রতিশ্রুতি রক্ষা হয়েছে এবং মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে আর ইসলাম রেনেঁসার যুগে প্রবেশ করেছে, এখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে এটি পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছবে।

যদি আমরা এ কারণে তাঁর হাতে বয়আতের এই অঙ্গীকার করি যে, আমরা তাঁর কাজে তাঁর সাহায্যকারী হব, তাহলে আমাদেরকেও সমস্ত শক্তি সামর্থ্য দিয়ে, যাই আছে আমাদের মাঝে, তা স্বল্প হোক বা বেশি, তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসা উচিত এবং আল্লাহ্‌র প্রতিও, তাঁর রসূলের প্রতিও এবং তাঁর মসীহ্‌র প্রতিও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ করা উচিত। নিজেদের জীবনে, ব্যবহারিক অবস্থায় পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করা উচিত, নিজেদের বিশ্বস্ততার মান উন্নত করা উচিত, আর সেভাবেই সকল ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকা উচিত যেভাবে সেই দরিদ্র বন্ধু তার ধনী বন্ধুর জন্য সবকিছু উজাড় করে দিতে প্রস্তুত ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

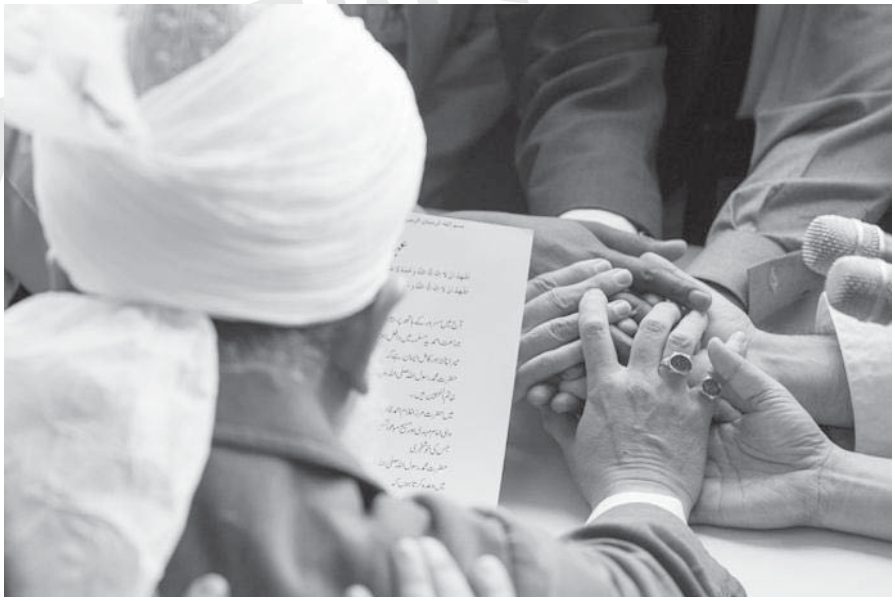

বয়আতের শর্তসমূহ এবং একজন আহমদীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

প্রবৃত্তির তাড়না থেকে বাঁচো

বয়'আতের দ্বিতীয় শর্তের মাঝে এদিকটায়ও মনোনিবেশ করা হয়েছে যে, স্থূল কামনা-বাসনা জেগে উঠলেই এর বশ হয়ে যেয়ো না। হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন:

আধ্যাত্মিক অবস্থার চতুর্থ স্তর সেইটি যা খোদা তা'লা এই আয়াতে করীমায় উল্লেখ করেছেন:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝

[সূরা আল মু'মিনূন, ২৩:৬]

অর্থাৎ- তৃতীয় স্তর থেকে উন্নতি লাভকারী মু'মিন সে, যে স্বীয় সত্তাকে কামনা-বাসনার অবৈধ লালসা থেকে রক্ষা করে চলে। এই স্তর তৃতীয় স্তরের চেয়ে এজন্য উন্নততর যে, তৃতীয় স্তরের মু'মিন তো কেবল ধন-সম্পদ যা তার কাছে অতি প্রিয় ও পছন্দনীয় খোদা তা'লার পথে সে তা দিয়ে দেয়, কিন্তু চতুর্থ স্তরের মু'মিন সেই জিনিসও খোদা তা'লার পথে উৎসর্গ করে দেয়, ধনসম্পদের চেয়েও বেশী পছন্দনীয় যা, খোদা তা'লার পথে সে তা-ও দিয়ে দেয়, কিন্তু চতুর্থ স্তরের মু'মিন সেই জিনিসও খোদা তা'লার পথে উৎসর্গ করে দেয়, যা জাগতিক সম্পদের চেয়েও বেশী পছন্দনীয় প্রিয়তর অর্থাৎ প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা।

কেননা, মানুষ স্বীয় কামোদ্দীপনার প্রতি এত বেশী লালায়িত থাকে যে, সে তার কাম-লালসা পুরো করতে ধন-সম্পদ বিনষ্ট করে ফেলে। আর সেই কাম-লালসা মেটাতে গিয়ে অর্থ-কড়িকে মূল্যবান কোন কিছু মনে করে না। যেমন দেখা যায়, এক নোংরা স্বভাবের কৃপন ব্যক্তি রয়েছে। সাহায্য মুখাপেক্ষী ক্ষুধার্ত ও বস্ত্রহীন কোন ব্যক্তিকে নিজের অত্যধিক কৃপণতার কারনে সে এক কানা-কড়িও দিতে পারে না, কিন্তু কাম উদ্দীপ্ত লালসার মধ্যে পড়ে সেই কৃপণ ব্যক্তিটি দেহবিক্রীকারী পতিতা নারীকে হাজার হাজার টাকা দিয়ে দিচ্ছে, উজাড় করে ফেলছে নিজের ঘর।

অতএব জানা গেল যে, কাম লালসার প্রাবল্য এত তপ্ত আর তেজী যে অতিশয় কৃপন আর হীন এক ব্যক্তিকেও তা ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এজন্য এটা অত্যন্ত মন্দ স্বভাবই বটে। তুলনামূলকভাবে প্রচণ্ড বলবান ওই ঈমানী শক্তি, যার মাধ্যমে কৃপণতা দূর হয়, মানুষ তার প্রিয় ধন-সম্পদ খোদার জন্য দিয়ে থাকে, সেই ঈমানী শক্তিই যা মানুষ কামলোলুপতার ঝড় 'শয়তান'-কে মোকাবেলা করে পায়, তা অত্যন্ত সুদৃঢ় সুস্থ ও সুস্থিত, কেননা, তার কাজ এক পুরোনো শয়তান, অজগর সদৃশ আত্মাকে- 'নাফসে আম্মারা'কে পদতলে পিষ্ট করে ফেলা।

এক কৃপণতো আত্মপ্রচারণা চালানো এবং খ্যাতি অর্জন করার উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করতেই পারে, তবে কাম-লালসা চরিতার্থ করার এই তুফান যা কাম প্রাবল্যে সৃষ্টি হয় তা খুবই বিপদজনক-ভয়ঙ্কর এক ঝড় বিশেষ, মহান খোদার রহম (দয়া) ছাড়া কোন ভাবেই তা দূর হতে পারে না। মানবদেহের দৈহিক কাঠামোতে অস্থি যেভাবে মজবুত ও টেকসই আর দীর্ঘস্থায়ী, অনুরুপভাবে এই তুফান দূরীভূতকারী ঈমানী শক্তিও খুবই বলশালী আর এর আয়ুস্কালও লম্বা হয়ে থাকে যাতে এমন শত্রুকে দীর্ঘকাল মোকাবেলা করে পরাভূত করতে পারে অবশ্য তা-ও আবার খোদা তা'লারই দয়ায়। কেননা কাম-লালসার তুফান এত ভয়ানক বিস্ফোরন উন্মুখ যে **'হযরতে আহদীয়ত'** এর বিশেষ অনুগ্রহ ছাড়া তা নির্বাপিত হতে পারে না। এজন্যই হযরত ইউসুফ (আ.)-কে বলতে হয়েছে-

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ

[সূরা ইউসুফ, ১২:৫৪]

অর্থাৎ, আমি নিজ আত্মাকে কলুষিত করি

না। বাসনা (নফস) খুবই হীন স্তরের মন্দ সাধনের নির্দেশদাতা আর এর আক্রমণ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া অসম্ভব, তবে অসম্ভবও সম্ভব হয় যদি খোদা তা'লা স্বয়ং রহম (দয়া) করেন। এই আয়াতের কথা **ইল্লা মা রাহিমা রাব্বি**-তে তেমনটা বলা হয়েছে। নূহ (আ.)-এর প্লাবনের উল্লেখকালেও এরই সদৃশ বাক্য রয়েছে, কেননা সেখানে আল্লাহ তা'লা বলেন-

لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ

[সূরা হুদ, ১১:৪৪]

অতএব, এখানে সেই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে কাম-লালসার এই প্লাবন তার অবস্থাগত বিশেষত্বে নূহের তুফানের সাথে সাদৃশ্য রাখে। [বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম খন্ড, রূহানী খাযায়েন ২১তম খন্ড, পৃষ্ঠা: ২০৫-২০৬]

একথার সংক্ষিপ্তসার এভাবে বর্ণিত হয়েছে, কাম-লালসা সর্বদা তোমাদের ওপর জয়লাভের চেষ্টা চালাবে। তবে তোমরা সর্বদা আত্মরক্ষা করে চলো, আল্লাহ তা'লার সমীপে দয়া ভিক্ষা করে এথেকে বাঁচো। আজকালের এ যুগে এর বহুবিধ রাস্তা খুলে গিয়েছে এজন্য আল্লাহর প্রতি অধিকতর ঝুঁকবার আর তাঁর রহম (দয়া) যাচনা করবার আবশ্যকতা অপরিহার্য।

أَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ۚ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ أَوْلِيَآءَ ۘ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ إِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ۚ إِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۗ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ ۝

[সূরা আল-যুমার, ৩৯:৪]

অর্থাৎ- সাবধান! একান্তভাবে নিবেদিত ধর্মই আল্লাহ তা'লার সমীপে মহিমামন্ডিত হয় আর ওই সব লোক যারা তাঁকে বাদ দিয়ে বন্ধু গ্রহণ করে নিয়েছে (বলে থাকে যে) আমরা এতদুদ্দেশ্য ছাড়া এর উপাসনা করি না যে, সে আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে নৈকট্যের উচ্চ মার্গ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিবে। অবশ্যই আল্লাহ তাদের মাঝে মীমাংসা করবেন যাতে তারা মতভেদ করতো। আল্লাহ নিশ্চয় তাকে হেদায়াত দেন না, যে মিথ্যুক, খুবই অকৃতজ্ঞ।

হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন:

সেই খোদাকেই মান্য করো যার সত্তার প্রতি তওরাত ও ইঞ্জিল এবং কুরআন তিনটিই অভিন্ন একমত প্রকাশ করে। কোন এমন খোদা নিজেদের পক্ষ থেকে বানিয়ে নিও না, যার সত্তা এই তিন ধর্মগ্রন্থের সম্মিলিত সাক্ষ্য দ্বারা সাব্যস্ত হয় না। সেই কথা মেনে নাও, যা বিবেকবুদ্ধি সম্মত আর ঐশী গ্রন্থাবলী যার ওপর ঐকমত্য রাখে। খোদাকে এমনভাবে মেনো না, যে মান্য করায় খোদার কিতাবে কালিমার দাগ পড়ে যায়। ব্যভিচার করো না, মিথ্যা বলো না, কুদৃষ্টি দিও না আর প্রত্যেক অযথা কর্ম, ছিদ্রান্বেষণ, আর নির্যাতন নিপীড়ন, প্রতারণা, দাঙ্গা-হাঙ্গমা ও বিদ্রোহের পথ থেকে আত্মরক্ষা করো। আর কাম প্রবৃত্তির উত্তেজনায় বশীভূত হয়ে যেও না আর পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করো যেমন মানবীয় প্রকৃতিতে পাঁচ প্রকারের পরীক্ষা আপতিত হয়। আর তোমাদের একান্ত আপন নবী করীম (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করো কেননা অন্ধকার যুগের পর তিঁনিই নবভাবে খোদা শনাক্তের পথ দেখিয়েছেন ও শিখিয়েছেন।"

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আরও বলেন:

"এটা আমার সিলসিলার নীতি যা এই সিলসিলার পার্থক্য সূচক চিহ্ন যে, মানবদরদী হওয়া আর মানবসন্তানের প্রতি বিদ্বেষ পরিহার করা আর সরকারের বিরুদ্ধাচরণ না করা-এই সিলসিলার ভিত্তিস্বরূপ। অন্য মুসলমানদের মধ্যে এ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান নেই। নিজেদের অগণিত ভুল-ভ্রান্তির কারনে ও এরই ফলশ্রুতিতে তাদের নীতি ভ্রান্ত, যার বিশদ বর্ণনার অবকাশ নেই আর না এখানে সেই সুযোগ রয়েছে"। [যামীমা তিরইয়াকুল কুলুব, রূহানী খাযায়েন, ১৫তম খন্ড, পৃষ্ঠা: ৫২৪-৫২৬]

বয়আত গ্রহণের তৃতীয় শর্ত

বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, সাধ্যানুযায়ী তাহাজ্জুদ নামায পড়বে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দরূদ পাঠ করবে, প্রত্যেহ আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নিজের পাপসমূহের ক্ষমা প্রার্থনা করবে আর প্রতিনিয়ত ইস্তেগফার করায় মনোনিবেশ করবে। ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাঁর অপার অনুগ্রহ স্মরণ করে তাঁর প্রশংসা ও বড়াই করবে।

পাঁচ ওয়াক্ত নামায সযত্নে লালন করো

বয়আত গ্রহণের এই শর্তে যে বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে তাতে নামায তো এমনই এক বিষয় যে, আল্লাহ্ ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্তের নামায বিনা ব্যতিক্রমে আদায় করবে। "নির্দিষ্ট সময়ে নামায আদায় করো"- আল্লাহ্ ও রসূল (সা.)-এর এ নির্দেশ নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য অবশ্য পালনীয় আর সেই সব ছেলেমেয়েদের জন্যও যাদের বয়স দশ বছরে উপনীত হয়েছে। পুরুষদের জন্য এ নির্দেশ রয়েছে যে জামা'তের (বা-জামা'ত) সাথে নামায আদায়ের বন্দোবস্ত করো, মসজিদে যাও আর তা ...জনাকীর্ণ করে রাখো, এর আশিস অন্বেষণ করো, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ব্যাপারে কোন ছাড় নেই। তবে ভ্রমণকালে কিছুটা ছাড় তো রয়েছেই আর রোগাক্রান্ত অবস্থায়ও ছাড় আছে আর বলা হয়েছে যে 'জমা' করে নাও– 'কসর' পড়ো। অধিকন্তু রোগাক্রান্ত অবস্থায় মসজিদে না যাওয়ার যে ছাড়টি রয়েছে তা থেকে ধারণা হয়ে যাওয়া উচিত যে, বা-জামা'ত নামায আদায় করার তাৎপর্য

কতটা ব্যাপক। এর তাৎপর্যের বিষয়ে আমি এখন বিস্তারিত কিছু উদ্ধৃতি পাঠ করছি তবে এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাইছি যে, প্রত্যেক বয়'আতকারীর আত্ম-বিশ্লেষণ করা উচিত, 'আমি নিজ সত্তাকে রক্ষা করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছি বটে তবে আমি কী সেভাবে কুরআনের নির্দেশাবলী পালনে যথার্থ আজ্ঞানুবর্তিতাও করছি!' প্রত্যেক আহমদী নিজ আত্মার সংশোধনার্থে নিজেই নিজের অভিভাবক, নিজেই নিজের হিসাব নিন, নিজেই নিজেকে অভিনিবেশ সহকারে দেখুন। যদি আমরা নিজেরাই নিজ সত্তাকে, নিজ অন্তরাত্মাকে যাচাই করতে লেগে যাই তাহলে এক মহা বিপ্লব সাধিত হতে পারে।

কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন:

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

অর্থাৎ, আর নামায প্রতিষ্ঠিত করো ও যাকাত আদায় করো এবং রসূলের আনুগত্য করো যাতে তোমাদের প্রতি রহম করা যায়। (সূরা আন নূর, ২৪:৫৭)

আবার সূরা ত্বাহা-এর ২০:১৫ আয়াতে রয়েছে–

اِنَّنِيْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِيْ ۙ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ ۝

অর্থাৎ, অবশ্যই আমি আল্লাহ্, আমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। তাই আমারই ইবাদত করো, আমার যপ-গাঁথা করতে নামায প্রতিষ্ঠা করো।

আর এভাবে নামায সম্পর্কে অসংখ্যবার কুরআন মজীদে নির্দেশাবলী এসেছে। এ প্রসঙ্গে আমি একটি হাদীস উপস্থাপন করছি। এতে হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেছেন– আমি আঁ হযরত (সা.)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, নামায পরিত্যাগ করা, মানুষকে শির্ক (অংশীবাদিতা) ও কুফর (অস্বীকার)-এর নিকটবর্তী করে দেয়। [মুসলিম কিতাবুল ঈমান, বাব বয়ানুত্বালাক্ব ইসমিল কুফরি আ'লা মিন তরকিস্‌সালাত]

আঁ হযরত (সা.) বলেন, নামাযে আমার নয়ন জুড়ায়।

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেন– আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, 'কিয়ামত' -এর দিনে সবার আগে যে জিনিসের হিসাব বান্দার কাছ থেকে নেয়া হবে তা হলো নামায। এ হিসাব সঠিক থাকলে সে সফলতা লাভ করে পরিত্রাণ পেয়ে গেলো। আর এ হিসাব যদি নষ্ট হয়, ত্রুটিপূর্ণ বা ত্রুটিযুক্ত হয় তবে সে বিফল হয়ে ঘাটতিতে পড়ে রইলো। তার ফরযে (অবশ্য আদায়যোগ্য নামাযে) কোন ঘাটতি থেকে গেলে আল্লাহ্ তা'লা বলবেন, 'দেখো! আমার বান্দার নফলও কিছু আছে'। নফল থেকে থাকলে, ফরযের ঘাটতি সেই নফল দ্বারা পুরা করে দেয়া হবে। একই ভাবে তার অন্যান্য আ'মল সমূহেরও পর্যালোচনা করা হবে আর এর হিসাব-নিকাশ নিরূপিত হবে। [তিরমিযি, কিতাবুস্‌সালাত, বাব ইন্না আওওয়ালা মাইইউহাসাবু বিহিল আ'বিদ]

হাদীসে আরও বর্ণিত হয়েছে:

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন– আমি আঁ হযরত (সা.)-কে এ কথা বলতে শুনেছি, 'তোমরা কী ভাবতে পারো যে কারো দোরগোড়ায় যদি ঝরণা বয়ে চলে আর তাতে সে দিনে পাঁচ বার গোসল করে নেয় তবে তার দেহে কী ময়লা থেকে যাবে?' সাহাবাগণ (রাযি.) নিবেদন করলেন, 'হে রসূলুল্লাহ্ (সা.)! কোন ময়লাই থাকবে না'। তিনি (সা.) বললেন, 'পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের উপমাও এইরূপ। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা পাপ মার্জনা করে থাকেন এবং দুর্বলতাসমূহ দূর করে দেন।' [বুখারী, কিতাব মুয়াক্বিয়াতুস সালাত, বাব আস সালাতুল খমসে কাফফারাতুল লিল খিত্বা']

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন:

"নামায পড়ো! নামায নিয়মিত আদায় করো, কারণ এটা হলো সামগ্রিক কল্যাণ ও সৌভাগ্যের চাবি"। [ইযালায়ে আওহাম, পৃষ্ঠা ৮২৯ প্রথম সংস্করণ]

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরও বলেন:

"নামাযের মস্তিস্ক আর আত্মা উভয়ই হলো দোয়া-ই।" [আইয়্যামুস্ সুলেহ, রূহানী খাযায়েন ১৪তম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৪১]

তিনি (আ.) আরও বলেন:

"ওহে লোক সকল! যারা নিজেদেরকে আমার জামা'তভুক্ত বলে গণ্য করে থাকো, আবারো বলছি তোমরা কেবল তখনই আমার জামা'তভুক্ত বলে পরিগণিত হবে যখন তোমরা সত্যিকারভাবে তাক্ওয়ার (খোদাভীতির) পথে অগ্রসর হবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের নামায এরূপ ভীতির সাথে এবং নিবিষ্টচিত্তে আদায় করবে যে, তোমরা যেন আল্লাহ্ তা'লাকে সামনেই দেখতে পাচ্ছো। নিজেদের রোযাও তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নিষ্ঠার সাথে পালন করবে। যাকাত আদায়ের যোগ্যতাসম্পন্ন যারা, তারা যাকাত দিবে। যাদের ওপর হজ্জ অবশ্যই পালনীয় আর তা পালনে কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকলে তারা হজ্জ করবে –সমুদয় পূণ্যকর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করবে এবং পাপকর্ম ঘৃণার সাথে বর্জন করবে। নিশ্চিতভাবে স্মরণ রেখো! তাক্ওয়া নেই এমন কোন কর্ম আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। প্রত্যেক পুণ্য কর্মের মূল তাক্ওয়া। যেই কর্মে এ মূল অক্ষত থাকে, সেই কর্ম কখনও ধ্বংস হবে না"। [কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন ১৯তম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৫]

তিনি (আ.) আরও উল্লেখ করেছেন:

"নামায কী? এটা হলো দোয়া, যা **তস্‌বীহ্** (মহিমাগীতি), **তাহমীদ** (প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন), **তাক্বদিস** (পবিত্রতা ঘোষণা) এবং **ইস্তেগফার** (নিজ দুর্বলতা স্বীকার করে শক্তি প্রার্থনা) ও **দরূদ** (হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি আশিস কামনা করা)-সহ সবিনয় ও সকাতরে নিবেদন করা হয়। অতএব, যখন তোমরা নামায আদায় করো তখন দোয়া-তে অজ্ঞ লোকদের ন্যায় কেবলমাত্র আরবী শব্দ ব্যবহারেই সীমাবদ্ধ থেকো না। কারণ তাদের নামায এবং ইস্তেগফার সবই

বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপমাত্র যাতে কোন সারবস্তু নেই। কিন্তু তোমরা যখন নামায পড়ো তখন খোদা তা'লার কালাম কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণীতে বর্ণিত কতিপয় প্রচলিত দোয়া ছাড়াও নিজেদের অন্যান্য যাবতীয় সাধারণ দোয়া নিজ ভাষাতেই করো, এমনভাবে নিবেদন জানাও যাতে সকাতর সেই যাচনার সুপ্রভাব তোমাদের হৃদয়ে পতিত হয়। [কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন ১৯তম খন্ড, পৃষ্ঠা ৬৮-৬৯]

অন্যত্র তিনি (আ.) আরও বলেন:

নামায এমন প্রভাব বিস্তারী যে, এর দ্বারা আকাশ মানবের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে। 'নামায'এর হক্ব আদায়কারী এমনটাই ভাবে যে, 'আমি মরে গেছি' আর তার আত্মা বিগলিত হয়ে খোদার আস্তানায় গড়াগড়ি খাচ্ছে.....যে গৃহে এমনতর নামায আদায় করা হবে, সে গৃহ কখনও ধ্বংস হবে না। হাদীস শরীফে রয়েছে, নূহ (আ.)-এর যুগে 'নামায' থাকলে সেই জাতি কখনও ধ্বংস হতো না। 'হজ্জ'ও মানুষের ওপর শর্তভেদে পালনীয়, 'রোযা'ও শর্তাধীনে ফরয আবার 'যাকাত'ও তাই, কিন্তু নামায আদায় ফরয হওয়াটা শর্তযুক্ত নয়। অন্যান্য সব ইবাদত এক বছরে একবার করে নির্ধারিত তবে এর (নামাযের) ক্ষেত্রে প্রতিদিন পাঁচবার করে আদায় করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এজন্য যতক্ষণ পুরোপুরিভাবে নামায প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে ততক্ষণ সেই কল্যাণও লাভ হতে পারে না, যা এ থেকে অর্জিত হওয়া নির্ধারিত আর না ঐরূপ বয়'আত করায় কোন মঙ্গল লাভ হয়। [মালফুযাত ৩য় খন্ড, পৃ: ৬২৭, নব সংস্করণ]

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন:

"নামায প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয (অর্থাৎ অবধারিত রূপে পালনীয়) হাদীস শরীফে এসেছে, আঁ হযরত (সা.) এর কাছে ইসলাম গ্রহণকারী কতিপয় লোক এলো ও নিবেদন করলো, হে রসূলুল্লাহ্ (সা.)! আমাদেরকে নামায আদায় করার বাধ্য-বাধকতা থেকে রেহাই দেয়া হোক, কারণ আমরা ব্যবসায়ী মানুষ 'পশুর পাল' কেনা-বেচা করে থাকি। গবাদি পশু ইত্যাদির বর্জ্যের জন্য আমাদের পরনের কাপড়-চোপড় পবিত্র থাকছে কি'না তার ভরসা রাখা যাচ্ছে না, তার ওপর আমাদের আবার সময়-সুযোগও হয়ে ওঠে না। তিনি (সা.), এর প্রত্যুত্তরে তাদের বললেন–দেখো! নামায-ই যদি না থাকে তবে রইলোটা কী? 'নামায' না থাকলে সেটা 'ঈমান'-ই নয়।

নামায কী? নিজেকে নিঃস্ব করে দিয়ে নিজের দুর্বলতা ও অসহায়ত্বকে স্বীকার করে নিয়ে খোদা তা'লার সমীপে নিজেকে সঁপে দেয়া আর নিজের চাহিদা পূরণে তাঁরই দ্বারস্থ হওয়া। কখনও তাঁর বিশালত্বের সামনে তাঁর নির্দেশ প্রতিপালনার্থে সোজা-সরলভাবে দাঁড়িয়ে যাওয়া, আবার কখনওবা পরিপূর্ণভাবে বিনম্র বিলাজে সেজদাবনত হয়ে তাঁর সমীপে পড়ে থাকা। যাবতীয় চাওয়া-পাওয়া তাঁরই সমীপে নিবেদন করা, এই-ই হলো নামায। এক ভিক্ষুকের ন্যায় নামাযে সেই দাতার বিশাল করুণা ও অপার মহীমার এমন প্রশংসা-গীতি করা যে– এতো এতো মহিমান্বিত তুমি।

মহাপরাক্রমশালী প্রবল প্রতাপান্বিত ক্ষমতাধর স্বত্ত্বা তিঁনিই, তাঁরই সকাশে করুণা ভিক্ষা করতে থাকা। অতএব যে ধর্মে এটা (এমন নিবেদিত ইবাদত) নেই, তা আবার কেমন ধর্ম!

আবার যে ব্যক্তি নামায থেকে অব্যাহতি পেতে চায়, চতুস্পদ জন্তুর চেয়ে সে বেশী আর কি হলো? সে-ই পানাহার করা আর শুয়ে থাকা–এটা তো অবশ্যই ধর্ম নয়। এটা তো 'কাফির' (অস্বীকারকারী)-এর বৈশিষ্ট বরং উদাসীনতার সেই মুহূর্ত–কাটানো সেই ক্ষণকাল, পুরোপুরি কাফির অবস্থারই নামান্তর–একথাটি সুস্পষ্ট ও সঠিক"। [তফসীর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.), ৩য় খন্ড, পৃ: ৬১১-৬১২, রাবওয়ায় মুদ্রিত, নব সংস্করণ]

নামাযে স্বাদ ও রুচি লাভের উপায় কী– এ প্রসঙ্গে হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন:

"হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে দেখছো যে আমি কেমন অন্ধ ও দৃষ্টিহীন আর আমি এখন পুরোপুরি মৃতাবস্থায় পতিত। আমি জানি যে স্বল্পকাল পরই আমার ডাক আসলে আমি তোমার সকাশে এসে যাবো। সেকালে কেউ আমাকে আটকিয়ে রাখতে পারবে না, কিন্তু আমার অন্তরাত্মা দ্যুতিহীন অন্ধকারে ছেয়ে আছে। তুমি এমন জ্যোতির্ময় আলোক রশ্মি এর ওপর সম্পাতিত করো যেন তাতে তোমার অনুরাগপূর্ণ ভালবাসার উন্মেষ ঘটে। তুমি আমার ওপর করুণা বর্ষণ করো যেন আমি দৃষ্টিহীন অবস্থায় উত্থিত হয়ে অন্ধদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে না পড়ি!

এ ধরনের দোয়া যাচনায় লেগে থেকে স্থায়িত্ব লাভ হলে পর দোয়াকারী তার মাঝে এমন এক মুহূর্তের আগমন প্রত্যক্ষ করবে যে, স্বাদ ও রুচিহীন ওই নামাযে আকাশ থেকে এমন একটা কিছুর অবতরণ ঘটবে যা রুচিকর সুপ্রিয় সুমিষ্ট স্বাদ সৃষ্টি করে দেবে।" (মালফুযাত ২য় খন্ড, পৃ: ৬৬১, নব সংস্করণ]

(চলবে)

ভাষান্তর: **মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্**

পবিত্র মাহে রমযানের ফিতরানা ও ফিদিয়ার হার

১। এ বছর ফিতরানা ধার্য হয়েছে ১০০/- (একশত) টাকা। প্রত্যেকের জন্য এমনকি নবজাতক শিশুর জন্যও ফিতরানা প্রদান করা আবশ্যকীয়। যারা অসচ্ছল তারা অর্ধেক হারে ফিতরানা প্রদান করতে পারেন।

২। যারা একান্ত অপারগতার জন্য রোযা রাখতে পারবেন না তারা অবশ্যই ফিদিয়া প্রদান করবেন। এ বছর শহরের জামা'তের জন্য নূন্যতম ফিদিয়ার হার ১৫০০/– (একহাজার পাঁচ শত) টাকা এবং গ্রামের জামা'তের জন্য নূন্যতম ফিদিয়ার হার ১২০০/- (এক হাজার দুইশত) টাকা ধার্য করা হয়েছে। যারা সামর্থ্যবান তারা রোযা রাখা সত্ত্বেও ফিদিয়া প্রদান করতে পারেন।

সেক্রেটারী তরবিয়ত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

যাকাত ও আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়

অনুবাদ– **মরহুম মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান**

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও তাঁর ভালবাসা লাভের জন্যে নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করা যেখানে একটি অতি বড় পুণ্য ও মঙ্গল এবং দেশেরও মঙ্গল লাভের একটি বড় প্রত্যাশা সেখানে এটা একটি আর্থিক ইবাদতও বটে।

যে জাতি মজুদ্‌দারী ও ধন-সম্পদ জমা করতে অভ্যস্ত হয়ে যায় আর জাতীয় প্রয়োজন এবং জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ডে উদার মনে ব্যয় করতে ইতস্তত করে, ধ্বংস ও বিনাশ এর দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকে। ফিৎনা-ফাসাদ এবং নিরাপত্তাহীনতা ও বিশৃঙ্খলা তাদের ললাটের লিখন হয়ে যায়। এতেও কৃপণ জাতি হাবুডুবু খেতে থাকে। মানুষ যে ধন-সম্পদ লাভ করে তা আল্লাহ্‌ই দিয়ে থাকেন। আর এটা তাঁর আমানত। আল্লাহ্‌ তা'লা যদি এ আমানত থেকে কিছু নিতে চান আর বান্দাকে তাঁর দেয়া সম্পদ থেকে তাঁর পথে ব্যয় করতে বলেন তাহলে আনন্দ ও পূর্ণ প্রশান্তির সাথে আল্লাহ্‌ তা'লার এ আদেশকে মান্য করা এবং তাঁর পথে ব্যয় করা মানুষের বড়ই সৌভাগ্য ও তাঁর পক্ষ থেকে আরও কল্যাণ লাভকারী হওয়ার সুনিশ্চিত ও অকাট্য মাধ্যম।

আল্‌ খলক্বু আয়ালূল্লাহ্‌ (সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহ্‌র পরিবার) হাদীসের অধীনে জীবনের দিক থেকে সব মানুষ আল্লাহ্‌র সকাশে একই রকম অধিকার ও মর্যাদার অধিকারী। আর বিশ্বের সম্পদরাজিতে সবাই একই রকম অংশীদার। যদিও নিজ নিজ উপায় উপকরণ এবং সামর্থ্যের দিক থেকে সকলের মালিকানার পরিমাণ এক নয়। বরং অবস্থার প্রেক্ষিতে কারও কারও নিকট সম্পদ বেশি থাকে এবং কারও নিকট কম। একজন রুজি-রোজগারের পদ্ধতি ভালভাবে জানে। আবার অন্য একজন এ ব্যাপারে আনাড়ি বা অদক্ষ। উপায় উপকরণও নেই। কিন্তু এ পার্থক্যের কারণে দুর্বল, উপায়হীন ও নিঃস্ব নিজ মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে না। কুরআন করীমের আয়াত ওয়া ফী আমওয়ালিহিম হাক্কুল্লিস্‌সায়িলি ওয়াল মাহ্‌রূম (আর এদের ধন-সম্পদে যারা চায় এদের অধিকার ছিলো আর যারা চাইতে পারে না তাদেরও অধিকার ছিলো (সূরা যারিয়াতঃ ২০)-এ এই তাৎপর্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছে।

অতএব বিত্তবানদের কর্তব্য, তাদের সম্পদে অন্যদের যে অধিকার রয়েছে তা যেন সানন্দে ও পূর্ণ আন্ত-রিকতার সাথে আদায় করে। এতে তাদের নিজেদের মঙ্গল ও তাদের তহবিলে যে অর্থ আছে এর প্রকৃত সংরক্ষণের রহস্য নিহিত। দরিদ্র ও নিঃস্বদের প্রতি নির্দেশ, তারা অন্যদের ধন-সম্পদের প্রতি ঈর্ষা, লালসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতার নিয়্যতে যেন না তাকায়। আর অবৈধ পন্থায় হাতিয়ে নেয়ার ও এর ওপর শক্তিপ্রয়োগে দখল করার পথ যেন অবলম্বন না করে। অন্যদিকে বিত্তবানদের প্রতি নির্দেশ তারা সমাজের দরিদ্র ও নিঃস্বদের প্রতি যেন দৃষ্টি রাখে এবং জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিষ যেমন, খাবার, পোষাক, বাসস্থান প্রভৃতির সমস্যায় এদেরকে এমন অবস্থায় ছেড়ে না দেয়, যা এতই করুণ যে বলার অপেক্ষা রাখে না। আর এতে তাদের সংকীর্ণতা ও বাধার সম্মুখীন হতে হয়।

অতএব যদি ধনী ও বিত্তবানরা চায়, দরিদ্ররা আল্লাহ্‌ তা'লার এ আদেশ পালন করুক অর্থাৎ অন্যের ধন-সম্পদ জবরদখল না করার যে নির্দেশ তাদেরকে দেয়া হয়েছে, তাহলে তাদেরও (অর্থাৎ ধনীদের) কর্তব্য তারাও আল্লাহ্‌ তা'লার এ নির্দেশ যেন পালন করে এবং নিষ্ঠার সাথে এর প্রতি কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়। পৃথিবী থেকে পরমুখাপেক্ষিতা দূর করার লক্ষ্যে এবং একে নিম্নতম পর্যায়ে আনার লক্ষ্যে আল্লাহ্‌ তা'লার পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে তাদেরকে সে নির্দেশই দেয়া হয়েছে।

বর্তমানে পৃথিবীতে অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু সবচে' বড় সমস্যা হল ধন-সম্পদের অসম বন্টনের বিষয়টি। একটি গোষ্ঠী যেমন প্রাচুর্যের মাঝে গড়াগড়ি যাচ্ছে তেমনি একটি গোষ্ঠী চরম দারিদ্র ও নিঃস্ব অবস্থায় কালাতিপাত করছে। এ আকাশচুম্বি ব্যবধানের কারণে উভয় গোষ্ঠীর মাঝে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হচ্ছে। আর এভাবেই এদের মাঝে হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, বিদ্বেষ ও প্রতিশোধের স্পৃহা বারে বারে অস্থিতিশীল অবস্থা ও বিপ্লবী স্লোগানের শিকারের কারণে পরিণত হচ্ছে। বিশ্ব এখন পর্যন্ত এথেকে মুক্তি লাভ করতে পারে নি।

ধনী-দরিদ্রের এ ব্যাপক সমস্যা সমাধানের উত্তম মাধ্যম হলো আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়। আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়ের অভ্যাস থেকে এ

আবেগ জাগ্রত হয় এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করে যে, প্রত্যেকের সঠিক অধিকার লাভ করা আবশ্যক। আর কাউকে লুটতরাজের অধিকার ও কারও মাঝে বঞ্চনার অনুভূতি সৃষ্টি হতে দেয়া উচিত নয়। ইসলাম যেখানে (আল্লাহ্‌র পথে) অর্থ ব্যয়ের ভরপুর আহ্বান জানিয়েছে সেখানে এর উদ্দেশ্যও নির্ধারিত করে দিয়েছে। অর্থাৎ ব্যয় করেন যিনি তার উদ্দেশ্য কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ। এর পেছনে পার্থিব কোন উদ্দেশ্য কাজ করে না। নইলে আত্ম-তুষ্টি, লালসা, অবৈধ আয়ের প্রলোভন আর অন্যদের প্রতি অনুগ্রহের কথা বলে অহমিকাপূর্ণ কুঅভ্যাস থেকে মুক্তি লাভ কষ্টকর হবে। আর সেই উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না যার লক্ষ্যে নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করতে এতটা তাগিদপূর্ণ আহ্বান জানানো হয়েছে।

আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়ের শ্রেণীভেদ

ইসলামী পরিভাষায় আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়ের অপর নাম সদকা। আর সদকার কয়েকটি শ্রেণীভেদ রয়েছে, যেমন ঃ

(১) জাতীয় ও সার্বজনীন প্রয়োজনে অর্থ ব্যয় করা। এর জন্যে প্রয়োজন একটি শর্ত। সার্বজনীন ক্ষয়-ক্ষতি দেখা দিলে আর ধর্মীয় নেতৃত্ব থেকে দাবী করা হলে, যার কাছে যা আছে তা নিয়ে আসুক যেন এ ক্ষয়-ক্ষতির মোকাবেলা করা যায়। তখন যার কাছে যা আছে তা নিয়ে উপস্থিত হওয়া সকলের অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। ঐশী নির্দেশ হলো ঃ ইন্নাল্লাহাশ্‌তারা মিনাল মু'মিনীনা আনফুসাহুম ও আমওয়ালাহুম বিআন্না লাহুমুল জান্নাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনের কাছ থেকে তাদের প্রাণ ও তাদের ধন-সম্পদ এ অঙ্গীকারের বদলে ক্রয় করে নিয়েছেন যেন তাদের জান্নাত লাভ হয় (সূরা তাওবা ঃ১১)। এতে এ তাৎপর্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(২) সঞ্চয় ও প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ থেকে ব্যয় করা। এর আবার দু'টি শ্রেণী রয়েছে ঃ (ক) মানুষ স্বেচ্ছায় নিরুপণ করে এমন ব্যয়। যেমন ঐচ্ছিক সদকাসমূহ যেসব মানুষ অভ্যন্তরীণ তাক্‌ওয়ার সিদ্ধান্তের ওপর ছেড়ে দেয়। অনুগ্রহের বদলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, উপহার ও সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নের খাতিরে বিভিন্ন প্রকার ব্যয়ও ঐচ্ছিক ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

(খ) লাযেমী বা অবশ্য দেয় চাঁদা, একজন মুসলামান সাধারণত যা ব্যয় করতে বাধ্য, যেমন সামগ্রিক অবশ্য দেয় চাঁদাগুলো যা সাধারণ সামাজিক ব্যবস্থাপনা ও ইসলামের প্রচার কাজ অব্যাহত রাখার জন্যে যুগ-খলীফার পক্ষ থেকে আহূত মজলিসে মুশাভিরাত (পরামর্শ সভা) প্রস্তাব করে এবং যুগ-খলীফা এর অনুমোদন দেন।

(গ) সরকারের পক্ষ থেকে প্রবর্তিত ট্যাক্সসমূহ এর অধীনে আসে।

(ঘ) এছাড়াও নিকটবর্তী লোকদের জন্যে ব্যয় , সেবার দায়িত্ব পালন, ঈদুল ফিতরের সদকা, ফিদিয়া, কাফ্‌ফারা ও নযর বা মানত সম্বন্ধীয় ব্যয়ও দেয় চাঁদার অন্তর্ভুক্ত।

(ঙ) আল্লাহ্‌র পথে একটি আবশ্যিক খরচ এর বিশেষ ও পরিভাষাগত নাম যাকাত। আর এ ব্যয়ের বিস্তারিত কথা এখন দৃষ্টিপটে রয়েছে ঃ

সঞ্চয় থেকে আবশ্যিক খরচের মাঝে যাকাত সবচে' বিশেষ স্থান দখল করে আছে। কেননা, এটা আল্লাহ্‌র পথে নিম্ন পর্যায়ের ব্যয়। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির খাতিরে প্রত্যেক 'সাহেবে নিসাব' মুসলমানের জন্য এটা ব্যয় করা ফরয। সমাজের এটা প্রয়োজন হোক বা না হোক অবশ্যই এ ব্যয়টি জরুরী। এ কারণেই যাকাতের আদায় সেই সময়ও প্রয়োজনীয় হবে যখন সমাজের সব রকমের জাতীয় ও ব্যক্তিগত প্রয়োজন অন্য মাধ্যমে সহজে পূরণ হতে থাকবে। কেননা, এ অর্থ ব্যয় প্রকৃতপক্ষে এ উদ্দেশ্যে প্রবর্তন করা হয়েছে যেন আল্লাহ্‌র পথে ব্যক্তির ব্যয় করার অভ্যাসটা চিরস্থায়ী হয়। সংকীর্ণতা, কৃপণতা ও ঈর্ষার মূলোৎপাটন হতে থাকে। আর ঐশী বাণী কাইলা ইয়াকূনা দূলাতাম্ বায়নাল আগনিয়া-ই মিনকুম (সূরা হাশ্‌ র ঃ ৮) অর্থাৎ যেন এটা তোমাদের বিত্তশালীদের মাঝে চক্রাকারে আবর্তিত না হয়– এর উদ্দেশ্য সাধিত হয় আর সমাজে জালেম ও কৃপণ ব্যক্তিদের শোষণ থেকে সুরক্ষা লাভ করে।

যাকাত দেয়া অবশ্য-কর্তব্য

ইসলাম টাকা-পয়সা আয় করতে নিষেধ করে নি। অবশ্য টাকা-পয়সা আটকে রাখতে বা খরচ না করতে নিষিদ্ধ করেছে। এরপরও যদি কোন ব্যক্তি নিজের ভবিষ্যত প্রয়োজনের খাতিরে সাবধানতাবশত কিছু অর্থ সঞ্চয় করে আর পড়ে থাকতে থাকতে অনেকটা বছর এভাবে কেটে যায় তাহলে টাকা-পয়সার ওপর যাকাত প্রদান অবশ্য-কর্তব্য হয়ে যাবে। এর প্রতি ইঙ্গিত করতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন–

খুয্ মিন আমওয়ালিহিম সদক্বাতান তুত্বাহহিরুহুম তুয্‌কীহিম অর্থাৎ হে রসূল! এদের ধন-সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করো এভাবেই ওগুলো পাক এবং ওগুলোর পবিত্রতার উপকরণ সৃষ্টি করে দেবে (সূরা তাওবাঃ ১০৩)

যাকাতের ধন-সম্পদ

যাকাতের ধন-সম্পদ দু'প্রকারের হয়ে থাকে। গুপ্ত ধন-সম্পদ ও বাহ্যিক ধন-সম্পদ। গুপ্ত ধন-সম্পদ নগদ অর্থ, সোনা-রূপা যে আকারেই হোক না কেন, অলংকারাদি হোক বা ব্যবহৃত আর কোন জিনিস।

(ক) বাহ্যিক ধন-সম্পদ ঃ গবাদি পশু । যেমন উট, গাভী, মোষ, ভেরা, ছাগল জাতীয় পশু। শর্ত এই যে, বাইরে সরকারী চারণ ক্ষেত বা এজমালী গ্রাম্য স্থানে চরে খায় আর এদেরকে বেঁধে রীতিমত খাবার দেয়ার প্রয়োজন হয় না।

(খ) জমিতে উৎপন্ন ফলাদি। যেমন , গম, যব, জোয়ার , ধান-চাল, বজরা, খেজুর, আঙ্গুর, বনের মধু যা কেউ সংগ্রহ করেছে।

(গ) যেসব ধাতব পদার্থ ব্যক্তির নিকট মজুদ আছে যেমন, লোহার খনি, তামার খনি, টিনের খনি, তেলের খনি প্রভৃতি।

(ঘ) ব্যবসায়-বাণিজ্যে ব্যবহৃত সম্পদ ঃ শিল্প কারখানার ব্যবহৃত পূঁজি।

(ঙ) বাহ্যিক ধন-সম্পদ থেকে আসলে যাকাত সংগ্রহ করার অধিকার সরকারের। এর কারণে যে, যেসব জমি থেকে সরকার রাজস্ব আদায় করে বা যেসব শিল্প-কারখানার প্রতি ইনকামট্যাক্স (আয়কর) আরোপ করে এর ওপর অতিরিক্ত যাকাত নেই; কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্র ছাড়া যেখানে সরকারী ট্যাক্স যাকাতের নির্ধারিত হার থেকে কম।এক্ষেত্রে যে পার্থক্য এর হিসেবে নিজ থেকে অথবা সরকারের দাবী অনুযায়ী সানন্দে যাকাত আদায় করা কল্যাণ ও মঙ্গলের কারণ আর পুণ্যেরও কারণ।

(চ) গুপ্ত ধন-সম্পদের তদারকি সরকারের পক্ষ থেকে হতে পারে না। যেভাবে জমাকৃত নগদ অর্থ মূল্যবান অলংকারাদি, বিভিন্ন

প্রকার মূল্যবান পাথর পদ্মরাগ, জমরূদ (এক প্রকারের মূল্যবান সবুজ পাথর)। এসব সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করা একজন সত্যিকারের মুসলমানের ব্যক্তিগত দায়িত্ব। এ যাকাত গরীব মিসকিন অভাবী ব্যক্তিদেরকে স্বয়ং নিজের ইচ্ছায় দিতে পারে আর ধর্মীয় আঞ্জুমান ইশাআতে ইসলামের জন্য কেন্দ্রীয় অফিসাদির মাধ্যমেও বন্টন করা যেতে পারে। অধিকতর উত্তম ও প্রত্যেক দিক থেকে কল্যাণকর পদ্ধতি এই, এ ধরনের সবটা যাকাত যেন যুগ-খলীফার কাছে পাঠানো হয় যাতে গোটা জামাতের গরীব মিসকীন ও অভাবীদের এ সম্পদ থেকে অংশ লাভ হয়। কারণ এটাই, উম্মতের সব আলেম এ নিয়মকে স্বীকার করেছেন। যাকাত বন্টন করা যুগ-ইমামের অধিকার (তশরীহে যাকাত, পৃষ্ঠা ১৩৬)।

যাকাতের আবশ্যক শর্তাবলী

জমি থেকে উৎপন্ন ফসলাদি যেমন, বিভিন্ন প্রকারের শস্য, খেজুর, আঙ্গুর, মধু, এদের বেলায় তখন যাকাত অবশ্য দেয় হয় যখন এগুলো পাকার উপযুক্ত হয় আর এর নিসাব পূর্ণ হয়। এরপর এ উৎপন্ন দ্রব্য যত বছরই পড়ে থাকুক না কেন এর ওপর যাকাত প্রবর্তিত হবে না।

অন্য রকমের সম্পদ যেমন নগদ অর্থ, সোনা, রূপা, ব্যবসায়ের মালামাল, গবাদি পশু এগুলোর ওপরে যাকাত তখন অবশ্য-কর্তব্য হবে যখন তা নির্ধারিত নিসাব-এর সমান হয় আর সারা বছর অধীনে থাকে। যত বছর অধীনে থাকবে প্রত্যেক বছর এগুলোর ওপর যাকাত অবশ্য-দেয় হবে। গবাদি পশুর জন্যে একটি বিশেষ শর্ত এটাও। এরা বাইরে সরকারী চারণ ক্ষেত্র, জঙ্গল এবং গ্রাম্য চারণ ক্ষেত্রে চরে আর এর ওপর তাদের জীবন নির্বাহ হয়, তাদের স্বয়ং খাবার দিতে হয় না। তদুপরি ওগুলো হালে জোতার এবং বোঝা বহনের কাজেও লাগে না।

গবাদি পশুর যাকাত প্রকৃতপক্ষে এমন দেশ ও এলাকার সাথে সম্পর্ক রাখে যেখানে বিস্তীর্ণ চারণ ক্ষেত্র সহজে পাওয়া যায়। সেখানে হাজার হাজার লাখ লাখ ভেড়া-বকরী ও গাভী পাওয়া যায়। এর উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জন ও দুধ বা মাংস রপ্তনী করা হয়ে থাকে অথবা কোন প্রকারের অন্যান্য ব্যবসায় ও বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে পেশা হিসেবে পশু পালন করা হয়ে থাকে। যাকাতের নিসাব ও নিয়মাবলী ঃ

নগদ অর্থ, সোনা, রূপা এবং অন্যান্য সব রকমের মূলধনের জন্যে নিসাবের নিরিখ হলো রূপা অর্থাৎ যার নিকট ৫২ তোলা ৬ মাসা অর্থাৎ সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা থাকে বা এত রূপা বা সোনা থাকে যা দিয়ে এ পরিমাণ রূপা কেনা যায় তখন এর যাকাত দেয়া অবশ্য-কর্তব্য হবে। যাকাতের বিষয় হলো পুরো মূলধনের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ বা আড়াই (২.৫%)শতাংশ যেমন, ৫২ তোলা ৬ মাসা রূপার মূল্য যদি ১০,৫০০ টাকা হয় আর এত অর্থ তার নিকট থাকে তাহলে ২.৫% হিসেবে নিশ্চিত তাকে ১৬২.৫০ টাকা যাকাত দিতে হবে।

এটা সেই সম্পদের যাকাত যার জন্যে নিসাবের নিরিখ রূপা আর নিসাবের নিরিখ জানার জন্যে ওজন হলো মাধ্যম।

মহিলাদের বক্তিগত ব্যবহারে থাকে এমন সোনা ও রূপার অলংকারাদির বেলায় এবং কখনও কখনও চাওয়ার পরে তারা গরীব স্ত্রীলোকদের ব্যবহার করতে দেয় এর ওপরে যাকাত হবে না। সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম বলেছেন, 'যে অলংকার ব্যবহারে রয়েছে এর যাকাত নেই।' আর রেখে দেয়া হয় এবং কখনও কখনও পরা হয় এর যাকাত দেয়া আবশ্যক। যে অলংকার পরা হয় আর কখনও কখনও দরিদ্র মহিলাদেরকে ব্যবহার করতে দেয়া হয়, কোন কোন লোকের এ ব্যাপারে ফতওয়া এই যে, এর যাকাত নেই। আর যে অলংকার পরা হয় এবং অন্যকে ব্যবহারের জন্য দেয়া হয় না এর যাকাত দেয়া ভাল। কেননা, এ নিজের জন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আমাদের ঘরে এর ওপর ও নিজেদের বর্তমান অলংকারের ওপর যাকাত দেয়া হয় আর যে অলংকার টাকা পয়সার মত রাখা হয় এর যাকাত দেয়ার প্রসঙ্গে কারও মতভেদ নেই" (মযমুআ ফাতাওয়া আহমদীয়া, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮৭, আল্ হাকাম, ১৭ নভেম্বর, ১৯০৫)।

ব্যবসায়ে বিনিয়োগকৃত মূলধনের ওপর যাকাত আদায় করার আসল অধিকারী যদিও সরকার আর নিজেদের প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রেখে তারা ট্যাক্সের পরিমাণও নির্ধারণ করেন। তবুও দিক-নির্দেশনার জন্যে উম্মতের আলেমগণ মূলধনের ওপর যাকাত নির্ধারণের যে নীতি প্রস্তাব করেছেন এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিলে অপকার হবে না।

শিল্প-বাণিজ্যে বিনিয়োগকৃত মূলধন থেকে কেবল সেই মূলধনের ওপর যাকাত প্রদেয় যা ব্যবসায়ের আবর্তনে রয়েছে অর্থাৎ মালামাল আনতে ও মালামাল বিক্রি করতে ও মালামাল তৈরী করতে হয়। যে পুঁজি বিনিয়োগকৃত কারখানার মেশিনারী, দালান-কোঠা, প্রয়োজনীয় অফিসাদি, ফার্নিচার ও হিসাব কিতাবের রেজিষ্টার বই খাতা এবং ফাইল ইত্যাদিতে ব্যয় হয়েছে এর ওপর যাকাত প্রদেয় হবে না। এভাবে বাস, ট্রাক, টেক্সি ও ভাড়া দেয়ার নিমিত্তে নির্মাণকৃত দোকান-পাট ও ঘর-বাড়ী নির্মাণের ব্যয়কৃত মূলধনও যাকাত থেকে রেয়ায়েত হবে। এমনিভাবে এসব জিনিষ যা মানুষের আসল প্রয়োজন মিটাতে ব্যয় হয় যেমন থাকার বাড়ী, পরার কাপড়-চোপড়, ঘরের আসবাবপত্র, ফার্নিচার, আসা-যাওয়ার গাড়ী, লাইব্রেরীর পুস্তক ইত্যাদি-এর যতই মূল্য হোক না কেন, লক্ষ লক্ষ টাকারই হোক না কেন এর ওপরও যাকাত প্রদেয় হবে না।

মোটকথা যাকাত চলমান ব্যবসায় বিনিয়োগকৃত মূলধনের প্রতি। যাকাতের হিসাব এভাবে হতে পারে। যত টাকা যে যে মাসে ব্যবসায় বিনিয়োগ করা হয় তত টাকা সেই সেই মাসে উল্লেখ করে সবটা একত্র করে নেয়া হয় আর ১২ দিয়ে ভাগ করে যে সংখ্যা বের হয় এর চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসেবে দিতে হয়। যেমন, ২৫০.০০ টাকা বছরের প্রথম ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করা হলো যা বছরের শেষ পর্যন্ত বার মাস ঘটলো। ২ মাস পরে ২০ টাকা আরও বিনিয়োগ করা হলো যা ১০ মাস ব্যবসায় ঘাটলো। এর ২ মাস পরে ৫০০.০০ টাকা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করা হলো যা বছরের শেষ হওয়া পর্যন্ত এভাবে হিসাব করা হয় ২৫০.০০ টাকা ১২ মাস, ২০.০০ টাকা ১০ মাস, ৫০০.০০ টাকা ৮ মাস খাটানো হয়েছে।

এজন্যে	টাকা	মাস	মোট
☐	২৫০ X	১২	= ৩,০০০
☐	২০ X	১০	= ২০০
☐	৫০০ X	৮	= ৪,০০০
☐☐☐			৭,২০০/-

সমস্ত বিনিয়োগকৃত মূলধনের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ৭,২০০/= টাকা। একে ১২ দিয়ে

ভাগ করলে ৭,২০০/১২= ৬০০। এর চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ১৫/= যাকাত ধার্য হবে।

পশুর নিসাব ও যাকাত আদায়ের নিয়ম

যাকাতের পশু অর্থে গৃহপালিত পশু যেমন, উট, গাভী, মোষ, বলদ, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা প্রভৃতি। ঘোড়া খচ্চর ও গাধার প্রসঙ্গে মতভেদ আছে। কোন কোন ফিকাহ্‌বিদ একে যাকাতের মাল হিসাবে গণ্য করেছেন আবার কেউ কেউ করেন নি। তদুপরি গৃহপলিত পশুর ওপর তখন যাকাত অবশ্য-দেয় হবে যখন এরা প্রাকৃতিক চারণ ক্ষেতে চরবে ও লালিত-পালিত হবে এবং ঘরে তাদের খাবার সরবরাহ করার প্রয়োজন হবে না।

নিসাব

উটের যাকাতের নিসাব পাঁচ। কারও নিকট যদি ৫টি থেকে কম উট থাকে তাহলে এর ওপর যাকাত অবশ্য-দেয় হবে না।

প্রতি ৫ থেকে ৯টি উটের যাকাত ১টি ছাগল বা এর মূল্য। এর পর অতিরিক্ত প্রতি ৪০টি উটের জন্যে দু'বছর বয়সের ১টি উটনী এবং ৫০টি উটের জন্যে ৩ বছর বয়সের ১টি উটনী যাকাত হিসেবে দিতে হবে।

গাভী ও মোষের যাকাত

গাভী ও মোষ একই শ্রেণীভুক্ত। আর এতে বলদ ও পুরুষ মোষও অন্তর্ভুক্ত। অতএব এদের নিসাব ও যাকাতের পরিসীমা এর সম্মিলিত সংখ্যার ওপর নির্ণিত হয়। প্রত্যেক পশুর আলাদা আলাদা সংখ্যার ওপর নয়; তা কোন একটির সংখ্যা নিসাবের সংখ্যা থেকে কম হোক না কেন। এসব পশুর (গাভী ও মোষ) যদি সম্মিলিত সংখ্যা নিসাবের সমান সমান হয় তাহলে যাকাত দেয়া অবশ্য-কর্তব্য। এরপর যেখানে 'গাভী' শব্দ ব্যবহৃত হবে এতে গাভী, বলদ, পুরুষ মোষ ও স্ত্রী মোষ প্রভৃতি সবই অন্তর্ভুক্ত হবে।

গাভীর নিসাব ৩০টি। ৩০টির কম পশুর জন্য যাকাত নেই। আর এসব জন্তর যাকাতের নিয়ম প্রতি ৩০টি পশুর জন্য এক বছর বয়সের ১টি গাভী আর প্রতি ৪০টি পশুর জন্যে ২ বছর বয়সের একটি গাভী প্রতি ৩০ থেকে ৩৯টি গাভী পর্যন্ত যাকাত হবে ১ বছর বয়সের ১টি গাভী বা এর সমমূল্য।

ছাগল ভেড়ার যাকাত

ছাগল, ভেড়া বা এ জাতীয় পশু আর দুম্বা একই শ্রেণীতে গণ্য করা হয়। আর এদের নিসাব ও যাকাতের পরিসীমাও এদের সম্মিলিত সংখ্যার ওপর নির্ধারিত হবে। পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেক পশুর ওপর হবে না। পরে যেখানে 'ছাগল' শব্দ ব্যবহৃত হবে এতে ছাগল, পাঠা, ভেড়া, ভেড়ী, দুম্বা, দুম্বী সব অন্তর্ভুক্ত হবে। ছাগলের নিসাব হলো ৪০টি। এর কম সংখ্যার জন্য যাকাত দিতে হবে না। প্রতি ৪০ থেকে ১২০ টি ছাগল পর্যন্ত যাকাত হবে ১টি ছাগল বা এর সমমূল্য। এর বেশি হলে প্রতি ১০০ ছাগলের জন্য একটি ছাগল যাকাত দিতে হবে। (ফিকাহ্‌ আহমদীয়া পৃষ্ঠা ৩৬২-৩৬৫)।

বিভিন্ন মসলা-মাসায়েল
বিভিন্ন নিসাব সম্বলিত সম্পদ

কারও কাছে যদি বিভিন্ন রকমের পৃথক পৃথক যাকাতের নিসাবসম্বলিত সম্পদ থাকে কিন্তু ওগুলোর কোনটাই স্বয়ং নিসাব পরিমাণ নয় বরং কম ; এমনকি সবগুলোর সম্মিলিত মূল্য হাজার টাকায় পৌঁছলেও যাকাত অবশ্য-দেয় হবে না। যেমন কারো নিকট ৪টি উট, ২৬টি গাভী, ৩৯টি ছাগল, ৫১ তোলা রূপা আছে এক্ষেত্রে কোনটির ওপরই যাকাত দেয়া হবে না আর সম্মিলিত মূল্যের ভিত্তিতেও যাকাত আদায় করা যাবে না। কেননা, এর মাঝে প্রত্যেক সম্পদের যাকাতের নিসাব আলাদা আলাদা আর তা এ সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত।

প্রশ্ন ঃ সোনা থাকলে এর যাকাত কীভাবে আদায় করা যায় অর্থাৎ এর নিসাব কী?

উত্তর ঃ সোনার ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিতে রূপা হলো মাপকাঠি। অর্থাৎ কারো কাছে যদি ৫২.৫ তোলা রূপার সম মূল্যের সোনা থাকে তাহলে এর যাকাত আদায় করা আবশ্যক। তবে শর্ত এই যে, সোনা এমন অলংকার আকারে না হয় যা সাধারণত নিজে ব্যবহার করা হয় আর কখনও কখনও পরে চাইলে কাউকে ব্যবহার করতে দেয়া হয় আর কৃপণতা দেখানো হয় না।

প্রশ্ন ঃ বছরের প্রথমে নিসাব পরিমাণ ধন-সম্পদ ছিলো পরে বছরের মাঝামঝি সময়ে এতে প্রবৃদ্ধি ঘটলে এরকম আধিক্যের কারণে যাকাতের ব্যাপারে আদেশ কী?

উত্তর ঃ বছরের মাঝামাঝি যদি মূলধনে প্রবৃদ্ধি যেমন, ১০ পরিণত হয় ১৫ হাজারে তাহলে যাকাত ১৫ হাজারের ওপরে ধার্য হবে, এমনকি ৫,০০০/= টাকার ব্যাপারটি এমন হয় যে, বছর শেষ হওয়ার এক দু'দিন পূর্বে পাওয়া গেলেও। মোটকথা অতিরিক্ত আয় আগেই মূলধনের অধীন হবে আর এর জন্যে বছর শেষ হওয়ার কোন শর্ত প্রয়োজন হবে না।

প্রশ্ন ঃ সিকিউরিটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, মেয়াদি আমানত (ফিক্সডডিপোজিট) যাকাত দেয়া থেকে রেয়ায়েতযোগ্য। কারেন্ট একাউন্টের কী আদেশ রয়েছে?

উত্তর ঃ ঋণ, মেয়াদী আমানত, সিকিউরিটি জমা প্রভৃতি খাতে বিনিয়োগকৃত অর্থ এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডের ওপর যাকাত ধার্য হবে না। তবে যে বছর এসব টাকা পাওয়া যাবে সে বছর এর যাকাত আদায় করতে হবে।

ইমাম মালেক নিজ কিতাব মুয়াত্তা-তে লিখেনঃ

"আমাদের (অর্থাৎ মদীনার আলেমদের) দৃষ্টিতে এ মসলা মুত্তাফাকুন আলায়হে অর্থাৎ সবার একমত যে, ঋণীর নিকট কয়েক বছর ধরে ঋণ রয়েছে এর ওপর যাকাত নেই। যে বছর এ ঋণ আদায় হবে কেবল সেই বছরের যাকাত আদায় করতে হবে (শরাহ্‌ মুয়াত্তা মালেক, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮৫)

ঋণের বেলায় যে নীতি, মেয়াদি আমানত, সিকিউরিটি জমা প্রভৃতির বেলায় তা-ই। ইমাম মালেক তাঁর চিন্তাধারার সমর্থনে হাদীসও উপস্থাপন করেছেন।

এছাড়াও যাকাত প্রদানের আর একটি উদ্দেশ্য এই ধন-সম্পদ মালিকের কুক্ষিগত হয়ে না থাকে। বরং মূলধনকে বাধ্য হয়ে ব্যবসায়ে খাটায় বা অন্য কাউকে এথেকে উপকৃত হতে দেয় নতুবা যাকাত তার ধন-সম্পদকে শেষ করে দেবে। বাস্তবত ঋণ মেয়াদি আমানত প্রভৃতির ক্ষেত্রে এ উদ্দেশ্য পুরো হয়ে যায়। এজন্য এমন মূলধনের ওপর যাকাত ধার্য হয় না। তদুপরি এমতাস্থায় যদি যাকাত আবশ্যকীয় হয় তখন কিছু দিন পরে গোটা ঋণ, সব আমানত যাকাত দিতে দিতে শেষ হয়ে যাবে অথচ শরিয়তের উদ্দেশ্য তা নয়।

(পুনর্মুদ্রণ)

ই'তিকাফ

নিজেকে উৎসর্গ করতে এক নির্জনবাস
মু'মিন আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে হয় ধন্য
মমত্ববোধের চেতনায় হয় উজ্জীবিত

মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্‌

ই'তিকাফ কী

রমযানের শেষ দশ দিন কোন কোন রোযাদার নিজেকে পুরোপুরি আল্লাহ্‌ তা'লার যিকরে (যপগাঁথায়) নিমগ্ন রাখার উদ্দেশ্যে মসজিদে এসে অবস্থান নেন। এরূপ আল্লাহ্‌-র স্মরণে একনিষ্ঠভাবে বিভোর থাকতে মসজিদকে আবাসনের স্থান হিসেবে গ্রহণ করাকে ই'তিকাফ বলা হয়।

প্রকৃতপক্ষে ই'তিকাফ এক আশারা বা এক দশক সময় কালের জন্য হয়ে থাকে। কোন এক রমযান মাসে রোযার সংখ্যা ২৯ (উনত্রিশ) হবে না ৩০ (ত্রিশ), যেহেতু তা পূর্ব থেকে জানা থাকে না এ কারণে এক দশক সংখ্যা পুরা করতে মহানবী (সা.) রমযানের শেষ দশক-এর একদিন পূর্ব থেকেই ই'তিকাফ শুরু করতেন।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কখন থেকে ই'তিকাফ শুরু করেন ও কীভাবে শুরু করেছেন আর কতদিন ধরে ই'তিকাফ করেছেন তা এই নিবন্ধে তুলে ধরা উদ্দেশ্য, এ থেকে পাঠকবৃন্দ উপকৃত হবেন, ইনশাআল্লাহ্‌!

ই'তিকাফের মৌলিক উদ্দেশ্য

বিশ্ব-জগত সৃষ্টির সূচনাকাল থেকেই অর্থাৎ মানবজাতি এক আল্লাহ্‌-র উপাসনা যে কাল থেকে শুরু করেছে, সেই কাল থেকেই ই'তিকাফ' অবিচ্ছেদ্যভাবে ইবাদতের সাথে সম্পর্কিত হয়ে আছে।

সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ্‌-র ইবাদতের উদ্দেশ্যে ভূপৃষ্ঠে সর্বপ্রথম যে গৃহটি নির্মিত হয়েছে তা হলো পবিত্র কা'বা গৃহ আর এ গৃহ নির্মাণের অন্তর্মূলেই 'ই'তিকাফ' এর চেতনা বিদ্যমান। বিশ্বে যত ধর্মমত প্রচলিত আছে তার প্রত্যেকটিতেই কোন না কোন রঙে 'ই'তিকাফ' এর ভাবাদর্শ দেখতে পাওয়া গেলেও ইসলামের ধর্ম-বিধানে তা স্থায়ীরূপে পরি-পূর্ণতা লাভ করেছে।

ই'তিকাফ বৈরাগ্য অবলম্বনের শিক্ষা দেয় না

সাধারণ অর্থে ই'তিকাফ বলতে জাগতিকতার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌'র স্মরণে সময় কাটানোকে বুঝায়। কোন কোন ধর্মে এর চরমভাবাপন্ন দৃষ্টান্ত দেখা যায়। যেমন– খ্রীষ্টান ধর্মযাজকেরা এবং হিন্দু সান্যাসীরা নিজেদেরকে জাগতিক সর্বপ্রকার সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে সারাটা জীবন বৈরাগ্যে কাটিয়ে দেয়।

ইসলাম কারো পুরো জীবনকাল বৈরাগ্য অবলম্বন করাকে সমর্থন করে না। খ্রীষ্টধর্মে প্রচলিত সন্ন্যাসবাদ আল্লাহ্‌ প্রদত্ত কোন শিক্ষা নয় বরং এটা পরবর্তীকালে ধর্মের নামে প্রক্ষিপ্ত এক ব্যবস্থা, যা মানবের জন্য প্রজ্ঞাপূর্ণ ধর্মীয় বিধানের ও জীবনাচারের সাথে মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

ই'তিকাফ'-এর অন্তর্নিহিত মর্ম

পবিত্র কুরআনের শিক্ষা সার্বজনীন ও সর্বকালের জন্য। এক খোদার ইবাদতের জন্য তৌহিদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত করতে আদর্শিকভাবে পবিত্র কাবাগৃহ নির্মাণের সাথে এর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। অতএব, পবিত্র কুরআন প্রদত্ত শিক্ষার অংশ হিসাবে এটা নিশ্চিত যে পবিত্র কাবাগৃহের সাথে ই'তিকাফ'এর সম্পর্ক আদি ও অকৃত্রিম।

ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর বর্ণনা, আরবের প্রত্যেক গোত্রের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত একটি দল নবী করীম (সা.)-এর সাহচর্য্যে থাকতো আর যেসব বিষয় আগে থেকে তাদের অজানা ছিল সেসব ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতো, আর এভাবে তারা জ্ঞান তথা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতো, সমস্যা ও সঙ্কটের প্রজ্ঞাপূর্ণ সমাধান শিখে নিজ ধর্মের ওপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতো। এভাবে **তাফাক্কুহ্‌ ফিদ্বীন** অর্জন করে নিতো। পরবর্তীতে ফিরে গিয়ে অন্যদেরও তা শেখাতো। ইসলামের ইতিহাসে বিস্তারিত বিবরণসহ ওইসব দলের উল্লেখ পাওয়া যায়, যারা ওই উদ্দেশ্য ও আদেশকে কার্যকর করতে মদীনায় নবী করীম (সা.)-এর সান্নিধ্যে উপস্থিত হতো, ধর্ম শিখতে সেখানে কিছু দিন কাটাতো, একদল বিদায় হওয়ার পর দ্বিতীয় দল, পরে তৃতীয়দল, এরপর পুণরায় আরেক দল– এভাবে আসতেই থাকতো। এক ধারাবাহিকতা চলতে থাকতো আর এ ধারাবাহিকতায় ধর্মের স্থায়ীত্ব ও মজবুতির উপকরণ নিহিত রাখা হয়েছিল।

ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি, ধর্ম শেখার উদ্দেশ্যে বাহরাইন থেকে একবার চৌদ্দজন প্রতিনিধির একটি দল এসেছিল। অনুরূপভাবে, হাযরে মাওত (ইয়েমেন) থেকে আশি জনের প্রতিনিধিদল এসেছিল। এভাবে বনু তমহীম গোত্রের সত্তুর-আশি

জনের একটি দলও এসেছিল। এসব দল **বাকাও বিল মদীনাতে মুদ্দাতাঁই ইয়া তাআ'লামুনাল কুরআনা ওয়াদ্ দীনা ছুম্মা খারাজু ইলা কাওমিহিম**– ধর্ম শিখেছে, শিক্ষাপ্রাপ্তরা পরবর্তীতে নিজ জাতির কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকে ধর্ম শিখিয়েছে।

এভাবে যথেষ্ট সংখ্যায় লোকদের কেন্দ্রে আসতে হবে, তবেই যথার্থরূপে ইসলাম ধর্মের সেবা করা সম্ভব হবে। পবিত্র কাবাগৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্য সংশ্লিষ্ট যে সব কর্তব্য ও দায়িত্ব রয়েছে তা জানা সহজতর হবে।

وَعَهِدْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ

(সূরা বাকারা: ১২৬)

অর্থাৎ- আর আমরা ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে (এ মর্মে) তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছিলাম, 'তোমরা উভয়ে আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী এবং রুকুকারী (ও) সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রেখো।'

ওয়াল আকিফিন-এ সেই উদ্দেশ্যেই বর্ণিত হয়েছে। পবিত্র কাবাগৃহ এ কারণেই নবরূপে নির্মাণ করা হয়েছে যে, এর মাধ্যমে এমন এক জাতি সৃষ্টি করা লক্ষ্য যারা নিজেদের জীবন খোদা তা'লার পথে উৎসর্গকারী হয়ে 'বায়তুল্লাহ্' নির্মাণের উদ্দেশ্য পূর্ণ করবে। এমন এক সার্বজনীন জাতির উদ্ভব ঘটানোর উল্লেখ এখানে রয়েছে, যাদের মাঝে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন দেশের প্রতনিধিরা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এ উদ্দেশ্যটি কেবল মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে।

'ওয়া আনতুম আ'কিফুনা ফিল মাসাজিদ' (সূরাতুল বাকারা ঃ আয়াত ১৮৮)। এতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে তোমাদের ব্যাপারে এধারণা পোষণ করা হচ্ছে তোমরা মসজিদে **ই'তিকাফ** (ইবাদতের জন্য নির্জনবাস)-এ বসবে। অর্থাৎ দুনিয়ার সকল পার্থিব বিষয় ও সম্পর্ক থেকে মুখ ফিরিয়ে কিছুদিন একাগ্রচিত্তে খোদার জন্য নিজ জীবনের প্রতিদিনের চব্বিশ ঘন্টা সময় কাটিয়ে যাও যাতে উৎসর্গকরণের স্পৃহাকে জীবন্ত করে নেয়া যায়। আর যেহেতু নবী করীম (সা.) বলেছেন, 'আমার জন্য সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে মসজিদ বানানো হয়েছে', এজন্য **ওয়া আনতুম আ'কিফুনা ফিল মাসাজিদ**-এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে আমার ভালোবাসায় উৎসর্গীকৃত হয়ে তোমাদের খন্ড খন্ড ভাবে কিছুটা করে সময় কাটাতে হবে; আল্লাহ্‌র ঘর পবিত্র কাবাগৃহ হলো কেন্দ্র-বিন্দু আর আমাদেরকে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে তোমাদেরকে এর প্রতিচ্ছায়াও নির্মান করতে হবে অর্থাৎ অকৃত্রিম ভাবে একই ধাঁচে একই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন করতে একই ধরনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পাক-পবিত্রতা সৃষ্টি করতে জায়গায় জায়গায় **ছায়া কেন্দ্র** খুলতে হবে, যেগুলো **বায়তুল্লাহ্‌র** প্রতিচ্ছবি হবে আর তা প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যও হবে তা-ই যা **বায়তুল্লাহ্** প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

আল্লাহ্ তা'লা এখানে এটাই বলেছেন যে **আনতুম আকিফুনা ফিল মাসাজিদ**– প্রত্যেক জায়গায় যেখানে উম্মতে মুসলেমা তাক্ওয়া (খোদাভীতি) এর ভিত্তিমূলে **বাযতুল্লাহ্‌র** প্রতিবিম্ব-প্রতিচ্ছায়া প্রতিষ্ঠিত করবে সেখানে তোমাদেরকে উৎসর্গীকৃত হয়ে ই'তিকাফে বসতে হবে, না হলে এই উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না।

কাবাগৃহ নির্মানের একটি উদ্দেশ্য এ-ও যে, জাতির উৎসর্গকারীগণ অর্থাৎ প্রত্যেক এলাকার, প্রত্যেক স্থানের, প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠীর যে উৎসর্গকারী রয়েছে তারা কেন্দ্রে বা ছায়া-কেন্দ্রে এসে সমবেত হতে থাকুক আর ইতিকাফে বসে যাক। লক্ষ্যণীয় যে 'উৎসর্গ' (ওয়কেফ্) ও 'দেশত্যাগ-দেশান্তর' (হিযরত) এ-দুয়ের মধ্যে খুবই সাযুজ্য পরিলক্ষিত হয়। ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পাই কেবল মক্কা থেকেই নয় বরং অন্যান্য এলাকা থেকেও বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিরা নিজেদের এলাকা পরিত্যাগ করে এমন কী নিজ গোত্রকে ছেড়ে দিয়ে সাধু-সন্যাসীর ন্যায় মদীনায় এসে বসে পড়তো আর এখানেই পড়ে থাকতো।

তাদের সে হিযরত ছিল (দেশত্যাগ) নিজ জাতি গোষ্ঠী ছেড়ে যাওয়া বা নিজ দেশ পরিত্যাগ করা– এটা সে রকমের ছিল না, যা ছিল মক্কা থেকে বিতাড়িত হয়ে সে স্থান ছেড়ে যাওয়ার হিযরত, তবে এমনটি করা এক উৎসর্গকারীর (ওয়াকেফ্) পক্ষেই সম্ভব হয়ে থাকে, যে নিজ এলাকা ছেড়ে, স্বীয় আত্মীয়তার বাঁধন ছেড়ে, আপন পরিবার-পরিজন ছেড়ে, নিজ সহায় সম্পদ ছেড়ে দিয়ে খোদার জন্য কেন্দ্রে এসে পড়ে থাকে আর পরবর্তীতে কেন্দ্রের নির্দেশনা অনুযায়ী পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে কাজ করতে বেরিয়ে পড়ে। যেমন– **ইয়েমেন'**-এ **আআ'রীয়্যাণ** নামে এক গোত্র ছিল। সেখানকার ধর্মপরায়ণ বিখ্যাত সাহাবী ছিলেন হযরত আবু মূসা আশআ'রী (রাযি.)। তাঁর সাথে আশি জন সদস্য হিযরত করে মদীনায় চলে আসেন। অনুরূপ আরও অনেক গোত্র রয়েছে। ইতিহাসে এদের উল্লেখ পাওয়া যায়। নবী আকরাম (সা.)-এর পবিত্র সাহচর্য লাভ করে উপকৃত হতে তারা মদীনায় চলে এসেছিলেন। এদের মধ্যে হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.)-ও রয়েছেন।

মহানবী (সা.) এর জীবনে ই'তিকাফ

আমরা মহানবী (সা.) এর পবিত্র জীবনাদর্শে 'ই'তিকাফ' এর প্রকৃত শিক্ষার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। আল্লাহ্ তা'লার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সুমহান আদর্শ আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছেন মহানবী (সা.)। তিনি (সা.) আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন জাগতিক ভাবে একেবারে বিচ্ছিন্ন বৈরাগ্যপূর্ণ জীবন-যাপন, দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাবলীকে ভয় পেয়ে পলায়ন প্রবৃত্তি বৈ অন্য কিছু নয়। মহানবী (সা.) এর জীবনাচার পরিপূর্ণ ভাবে কর্মমুখর থাকলেও তিনি ইহজাগতিক লালসাপূর্ণ আকর্ষণ থেকে নিজেকে এমনভাবে সরিয়ে রাখতেন, জাগতিক বিলাস-ব্যসন কখনই তাঁর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারতো না। প্রকৃত জিহাদ এটাই– এক মুজাহিদ 'জিহাদ' এর প্রতিটি প্রান্তরে অবস্থান করে বিপদাবলীর তুফানের মধ্যেও নির্ভিক দৃঢ়তার সাথে মুকাবেলা করবে তবুও সঠিক পথ থেকে সে বিচ্যুত হবে না।

এ হলো বাস্তব সম্মত সেই পথ যা দ্বারা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র সাথে মহানবী (সা.) সম্পর্ক গড়েছেন, 'সিরাতুল মুস্তাকীম' সহজ-সরল পথ, মধ্যম পন্থার পথ, যা মানবজাতির জন্য আল্লাহ্ তা'লা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অতএব তাদেরকে সেই পথে 'ইস্তেকামাত'-দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত থেকে আল্লাহ্ তা'লার সাথে গড়তে হবে নিবিড় সম্পর্ক, অটল-অটুট বন্ধনে নিজেদেরকে করতে হবে আবদ্ধ। ই'তিকাফের মূলতত্ত্ব হলো জাগতিক বিষয়াদি থেকে নিজেকে স্বল্পকালীন সময়ের জন্য দূরে রাখা এবং বৈশ্বিক দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাবলীকে

তুচ্ছ জ্ঞান করে পশ্চাতে রেখে দেয়া! লক্ষণীয় বিষয় হলো, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) 'ই'তিকাফ'কে উন্নত মানের ধার্মিকতা হিসাবে আখ্যায়িত করেন নাই বরং তিনি একে এক কুরবানী বা আত্মোৎসর্গ বলে চিহ্নিত করেছেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মহানবী (সা.) রমযানের মাঝখানে ই'তিকাফ শুরু করতেন এবং ২১ রমযানের রাত পর্যন্ত তা জারী রাখতেন। এভাবে কিছুকাল ধরে তিনি (সা.) ই'তিকাফ করতে থাকেন আর সাহাবাগণও (রা.) ধীরে ধীরে তাঁর সাথে যোগ দিতে থাকেন।

ই'তিকাফে রয়েছে আত্মোৎসর্গের অনুপ্রেরণা

মহানবী (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রীগণের মধ্য থেকে কেউ কেউ মসজিদে এসে নিজেদের 'হুজরা' স্থাপন করতেন। একবার মহানবী (সা.)-এর অনুমতিক্রমে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) মসজিদে তার 'হুজরা' বসালেন। উম্মুল মু'মিনীনগণ তা জানতে পেরে ধার্মপরায়ণতার এই কাজে অংশ নিতে তারাও আকাঙ্খী হলেন। মসজিদে এসে তারাও 'হুজরা' বসালেন, তবে এদের মধ্যে অনুমতি নিয়েছিলেন কেবলমাত্র হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)।

পরবর্তীতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মসজিদে এসে এতগুলো হুজরা যা উম্মুল মু'মিনীনগণ বসিয়েছিলেন, তা দেখে আশ্চর্যান্বিত হলেন। আশ্চর্য হয়ে তিনি বললেন, 'এটাই কি তাদের ধর্মপরায়ণতার মূলতত্ত্ব?' অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে তিনি (সা.) বললেন, ধর্মনিষ্ঠতা মানুষের অন্তর থেকে উৎসারিত হয় অন্যের দেখাদেখি বা অপরের সাথে রেষারেষি থেকে তা আসে না। তিনি এতটাই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, সেই রমযানে তিনি (সা.) মসজিদে আর ই'তিকাফ করেন নাই, সেই রমযানের পরবর্তী মাস অর্থাৎ শাওয়াল মাসে তিনি এই ক্ষতি পূরণ করে নেন।

এই ছিল মহানবী (সা.)-এর আলোকজ্জ্বল জীবনাচার পদ্ধতি। তিনি (সা.) তাঁর সহধর্মিণীগণকে বারণ করেন নাই বা তাদেরকে নিজেদের হুজরা সরিয়ে ফেলতেও বলেন নাই, কারণ তিনি নারীদেরকেও মসজিদে অবস্থান করার অনুমতি দিয়েছেন, যেমন হযরত আয়েশা (রা.) এ বিষয়ে পূর্ব থেকে অনুমতি প্রাপ্ত ছিলেন। অতএব অন্যান্য উম্মুল মুমিনীনদেরও সেই অনুমতি দানে অস্বীকৃতি জানানোর কোন কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এমন উদাহরণ থেকে একে অপরকে ডিঙ্গিয়ে যাবার প্রবণতা দৃষ্টিগোচর হয়। এ কারণেই এ বিষয়ে তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ছিল, নিজেকেই এমন অবস্থা থেকে সরিয়ে নেয়া। তিনি তাঁর সহধর্মিনীগণকে তিরস্কার করেন নাই আর স্ত্রীগণকেও লজ্জিত করেন নাই এইভাবে তিনি নারীর মর্যাদা সমুন্নত রেখেছেন আর ই'তিকাফ না করে স্বয়ং তিনি কষ্ট পেয়েছেন বটে, তবে শাওয়াল মাসে একাকী নির্জনে তাঁর সেই অতৃপ্ত বাসনা তিনি পুরণ করে নিয়েছেন।

এবারে প্রশ্ন উঠে রমযানের শেষ দশ দিন "ই'তিকাফ"-এর এই রীতি কোথা থেকে এলো? মহানবী (সা.) একবার বলেন, তিনি 'লাইলাতুল কদর'-সৌভাগ্যের রজনীর সন্ধান পেয়েছেন ২১ রমযানে, যখন তাঁর ই'তিকাফ সমাপ্ত হয়। তখন থেকে তিনি (সা.) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে রমযানের শেষ দশ দিন তিনি (সা.) মসজিদেই অবস্থান করবেন। ঐ এক বছর তিনি (সা.) দুই বার ই'তিকাফ পালন করেন, প্রথমটি রমযানের মাঝের ১০ দিন আর অপরটি শেষ দশ দিন।

ই'তিকাফকালীন মহানবী (সা.) এর অনুপম দৃষ্টান্ত

সেই থেকে মহানবী (সা.) প্রতি রমযানের শেষ দশ দিন মসজিদে অবস্থান করে ই'তিকাফ করতেন। ই'তিকাফ করা অবস্থায় অপ্রয়োজনীয় অহেতুক কোন কাজে জড়িয়ে যাওয়ার অনুমতি নেই, মসজিদের ভিতরেও নয় বাইরেও নয়। একান্ত প্রয়োজন দেখা দিলে তবেই বাইরে যেতে পারে আর সাজগোজ করা ও আত্মম্ভরিতা প্রদর্শনের অনুমতি মোটেই নাই।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়া (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) একবার মসজিদে ই'তিকাফরত থাকাকালে তিনি (রাযিআল্লাহু আনহা) তাঁর (সা.) সাথে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতে যান আর এমন আলাপ-আলোচনায় ই'তিকাফের অন্তর্নিহিত মর্মের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। তাকে (রা.) বিদায় দিতে মহানবী (সা.) স্বয়ং দরজা পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দেন। মহানবী (সা.) এর এমন প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার তাঁর (সা.) অসাধারণ চারিত্রিক মর্যাদারই পরিচায়ক অর্থাৎ ই'তিকাফ কালীন এই সময় মসজিদ ছিল মহানবী (সা.) এর সাময়িক আবাসনের স্থান। অতএব তিনি (সা.) তাঁর অতিথি সহধর্মিণীকে যতদূর সম্ভব এগিয়ে দিয়ে বিদায় জানান।

সেই সময় ২ জন মদীনাবাসী মুসলমান আনসার ঐ রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময়ে এই দৃশ্যটি দেখে। তারা মহানবী (সা.)কে 'সালাম' জানালে প্রত্যুত্তর দিয়ে মহানবী (সা.) তাদেরকে দাঁড়াতে বলেন, আর সেই সাথে জানালেন যে, তার সাথের মহিলা তাঁরই সহধর্মিণী সাফিয়া (রা.)। এতে দুই সাহাবী ব্যথীত হয়ে বললেন, 'হে রসূলুল্লাহ্ (সা.)! আমরা কি আপনার সম্পর্কে কোন মন্দ ধারণা করেছি? আপনি আমাদেরকে এর ব্যাখ্যা দিচ্ছেন কেন? উত্তরে মহানবী (সা.) বললেন, মানবদেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রক্ত যেমন সঞ্চালিত হয় শয়তানও তদ্রুপ চারিদিকে ঘুর-ঘুর করতে থাকে। আমি শংকিত যে, কোন কারণে তোমরা না তার চক্করে পড়ে যাও, এইজন্যই আমি তোমাদের কাছে বিষয়টি পরিস্কার করলাম।' এমনই অতুলনীয় মানসম্পন্ন ছিল মহানবী (সা.) এর ই'তিকাফ।

গভীর মনোনিবেশের সাথে তিনি (সা.) ইবাদত করতেন, নামাযে তাঁর (সা.) এই একাগ্রতা আরও বহুগুণে বৃদ্ধি পেত রমযানে, আবার শেষের দশ দিন তা যেতো আরো বেড়ে। ইবাদতে তাঁর এই একনিষ্ঠতা আর আত্মবিলীনতা তাঁর ওফাত প্রাপ্তির বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। মৃত্যুর বছর মহানবী (সা.) মসজিদে ২০ দিন ধরে ই'তিকাফ করেছেন। সম্ভবত তিনি তাঁর 'মৃত্যুবরণ' এর বিষয় আগাম জানতেন, তবে তিনি তা জনগণের সামনে প্রকাশ করেন নাই, কেননা তিনি (সা.) তাঁর সাহাবাদের কষ্ট দেখলে সইতে পারতেন না।

রাহমাতুল্লিল আ'লামীন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ই'তিকাফ কালে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের পরম আকুতি নিয়ে আর মানবকল্যাণের অপার মমতা বুকে ধারণ করে একান্তে মসজিদে যেভাবে সেজদা প্রণত হয়ে কাটাতেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও এই রমযানে সেই মানের ই'তিকাফ করার সৌভাগ্য দান করুন, আমীন!

কলমের জিহাদ

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হলো-
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'
- ইমাম মাহদী (আ.)

"ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নাই"
- আল কুরআন

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর–৫৩)

(খ) চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ সম্পর্কে হাদীসের বর্ণনা

এই গ্রহণ সম্পর্কে আহমদীয়া সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.) বলেনঃ

"সহী দারকুতনীতে একটি হাদিস আছে যে, ইমাম মোহাম্মাদ বাকের বলিয়াছেন, আমার মাহদীর জন্য দুটি নিদর্শন রহিয়াছে। যখন হইতে খোদা পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন তখন হইতে এই দুটি নিদর্শন অন্য কোন প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি ও রাসূলের সময়ে প্রকাশিত হয় নাই। ইহাদের মধ্যে একটি এই যে, প্রতিশ্রুত মাহদীর যুগে রমযান মাসে চন্দ্র গ্রহণ উহার প্রথম রাত্রিতেই হইবে, ত্রয়োদশ তারিখে এবং সূর্য–গ্রহণ উহার দিনগুলির মধ্যে মধ্যম দিনে হইবে–অর্থাৎ একই রমযান মাসের ২৮ তারিখে।"

এইরূপ ঘটনা পৃথিবীর শুরু হইতে কোন রসূল বা নবীর যুগে কখনো প্রকাশিত হয় নাই। কেবল মাহদীর যুগে ইহা হওয়া নির্ধারিত। সকল ইংরেজী ও উর্দু পত্রিকা এবং সকল দক্ষ জ্যোতির্বিদরা এই বিষয়ের সাক্ষি যে, আমার যুগেই, যাহার প্রায় ১২ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে, এই নির্ধারিত চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ রমযান মাসে সংঘটিত হইয়াছে। যেরূপে অন্য একটি হাদিসে বর্ণনা করা হইয়াছে তদ্রুপে এই গ্রহণ রমযানে দুইবার সংঘটিত হইয়া গিয়াছে [২১/০৩/১৮৯৪ (১৩ রমযান ১৩ হিঃ) এবং ০৬/০৪/১৮৯৪ (২৮ রমজান ১৩১১ হি-প্রবন্ধকার]। প্রথমে এই দেশে ও দ্বিতীয়বার আমেরিকায় হইয়াছে এবং দুইবার এই তারিখগুলিতে হইয়াছে, যাহার প্রতি হাদীস ইঙ্গিত করিতেছে। যেহেতু এই গ্রহণের সময় প্রতিশ্রুত মাহদী হওয়ার দাবিকারক আমি ছাড়া পৃথিবীতে অন্য কেহ ছিল না এবং আমার ন্যায় অন্য কেহ এই গ্রহণকে নিজের মাহদী হওয়ার নিদর্শন সাব্যস্ত করিয়া শত শত বিজ্ঞাপন এবং উর্দু, ফার্সী ও আরবী পুস্তক পৃথিবীতে প্রকাশ করে নাই, সেহেতু এই আসমানী নিদর্শন আমার জন্য নির্ধারিত হইল। এই ব্যাপারে দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে, এই নিদর্শন প্রকাশের ১২ বৎসর পুর্বে খোদা তা'লা ইহার সম্পর্কে আমাকে সংবাদ দিয়াছিলেন যে, এইরূপ নিদর্শন প্রকাশিত হইবে। এই নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার পুর্বে এই সংবাদ 'বারাহীনে আহমদীয়া' পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া লক্ষ লক্ষ মানুষের নিকট প্রকাশ করা হইয়াছে।"

[**নোটঃ** উল্লেখ্য যে, এই গ্রহণের বাস্তব সত্যতা সম্পর্কে সমকালীন পত্র–পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে– (১) লাহোর থেকে ৬/১২/১৮৯৫ তারিখে প্রকাশিত 'সিভিল এন্ড মিলিটারী গেজেট'। (২) লাহোর থেকে ৪/১২/১৮৯৫ তারিখে প্রকাশিত উর্দু আজাদ পত্রিকা, (৩) ১৮৯৪ সালের পঞ্জিকা এবং সমসাময়িক অন্যাণ্য পত্র–পত্রিকা দ্রষ্টব্য।]

চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে উত্থাপিত একটি আপত্তির জবাবে প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.) বলেন ঃ "বড়ই আক্ষেপ, আমার বিরুদ্ধবাদীরা কেবলমাত্র বিদ্বেষবশতঃ এই আপত্তি উত্থাপন করে। হাদীসের কথা এই যে, "চন্দ্র গ্রহণ প্রথম রাত্রিতে হইবে এবং সূর্য গ্রহণ মধ্যম দিনে হইবে ; কিন্তু এইরূপ হয় নাই।" অর্থাৎ তাহাদের ধারণা অনুযায়ী "চন্দ্রগ্রহণ হেলালের রাত্রিতে হওয়া উচিত ছিল, যাহা চান্দ্র মাসের প্রথম রাত্রি। সূর্য গ্রহণ চান্দ্র মাসের পনরতম দিনে হওয়া উচিত ছিল, যাহা মাসের মধ্যম দিন।"

কিন্তু এই ধারণা কেবলমাত্র লোকদের না বুঝার ফল। কেননা, যখন হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে তখন হইতে চন্দ্র গ্রহণের জন্য খোদা তা'লার বিধান তিনটি রাতকে নির্ধারিত করিয়াছে, অর্থাৎ ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ। খোদা তা'লার বিধান অনুযায়ী চন্দ্র গ্রহণের প্রথম রাত্রি ঐ চান্দ্র মাসের ত্রয়োদশ রাত্রি এবং খোদার বিধান অনুযায়ী সূর্য গ্রহণের জন্য তিন দিন নির্ধারিত আছে, অর্থাৎ চান্দ্র মাসের সাতাশ, আটাশ ও উনত্রিশতম দিন এবং সূর্যের তিন দিন গ্রহণের মধ্যে চান্দ্র মাসের দিক হইতে আটাশতম দিন মধ্যবর্তী দিন হয়।

অতএব নিদিষ্ট তারিখে হাদীসের বর্ণনানুযায়ী অবিকলভাবে রমযান মাসে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ হয়। অর্থাৎ চন্দ্রগ্রহণ রমযানের ত্রয়োদশ রাত্রিতে হইয়াছে এবং সূর্য গ্রহণ একই রমযানের আটাশতম দিনে হইয়াছে।

দ্বিতীয় আপত্তির জবাবে তিনি বলেন: "আরবী বাকধারায় প্রথম রাত্রির চাঁদকে কখনো 'কমর' বলা হয় না। বরং তিনদিন পর্যন্ত উহাকে 'হেলাল' বলা হইয়া থাকে।

কেহ কেহ উহাকে সাত দিন পর্যন্ত 'হেলাল' বলিয়া থাকে। দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, যদি আমরা ধরিয়া লই চাঁদের প্রথম রাত্রির অর্থ ত্রয়োদশ রাত্রি এবং সূর্যের মধ্যম দিনের অর্থ আটাশতম দিন তবে ইহাতে অস্বাভাবিক কি ঘটনা ঘটিল? রমযান মাসে কখনো কি চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হয় নাই? ইহার উত্তম এই যে, এই হাদীসের অর্থ এই নহে যে, রমযান মাসে কখনো এই দুইটি গ্রহণ একত্রিত হয় নাই।

বরং উহার অর্থ এই যে, রেসালত বা নবুওয়তের কোন দাবিকারকের যুগে কখনো এই দুইটি গ্রহণ একত্রিত হয় নাই। হাদিসের বাহ্যিক শব্দসমুহও ইহার প্রমাণ বহন করিতেছে। যদি কাহারো এই দাবি থাকে যে, নবুয়ত বা রেসালাতের কোন দাবিকারকের যুগে এই দুটি গ্রহণ রমযান মাসে কখনো কোন যুগে একত্রিত হইয়াছে তবে ইহার প্রমাণ দেওয়া তাহার অবশ্য কর্তব্য। বিশেষতঃ এই বিষয়টি কাহার জানা নাই যে, ইসলামী সাল অর্থাৎ তেরশত বৎসরে কয়েক ব্যক্তি কেবল মিথ্যার উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিশ্রুত মাহদী হওয়ার দাবিও করিয়াছে, বরং যুদ্ধও করিয়াছে। কিন্তু কে প্রমাণ করিতে পারে যে, তাহাদের যুগে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ উভয়টি রমযান মাসে একত্রিত হইয়াছিল। যতক্ষণ পর্যন্ত এই প্রমাণ পেশ না করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত নিঃসন্দেহে এই ঘটনা অস্বাভাবিক। কেননা, অস্বাভাবিক উহাকেই বলা হয় যে, উহার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে পাওয়া যায় না।

কেবল হাদীসই নহে, বরং কুরআন শরীফেও ইহার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছে, এবং চন্দ্রগ্রহণ লাগিবে এবং সূর্য ও চন্দ্র উভয়কে (গ্রহণে) একত্রিত করা হইবে–(আল কিয়ামাঃ ৯–১০)। (টিকাঃ খোদা তা'লা সংক্ষিপ্ত কথায় বলিয়া দিয়াছেন যে, শেষ–যুগের চিহ্ন এই যে, একই মাসে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ একত্রিত হইবে। এই আয়াতের পরের অংশে বলা হইয়াছে এই সময় মিথ্যাবাদী প্রতিপন্নকারীর পলায়নের কোন জায়গা থাকিবে না। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, ঐ চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ প্রতিশ্রুত মাহদীর যুগে হইবে। সংক্ষিপ্ত কথা এই যে, যেহেতু ঐ চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ খোদার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সংঘটিত হইবে সেহেতু মিথ্যাবাদী প্রতিপন্নকারীদের ওপর হুজ্জত (যুক্তি–প্রমাণ) পূর্ণ হইয়া যাইবে)।"

তৃতীয় আপত্তির জবাবে তিনি বলেনঃ "তৃতীয়ত এই আপত্তি পেশ করা হইয়া থাকে যে, এই হাদীস 'মারফু' অর্থাৎ 'মুত্তাসিল' নহে" (মারফু এমন হাদীস যার সনদে কোন বর্ণনাকারী বাদ পড়ে নাই এবং বর্ণনাকারী সরাসরি হযরত নবী করীম (সা.) হইতে হাদীসটি শুনিয়াছে–) এবং ইহা কেবল ইমাম মোহাম্মদ বাকের (রা.) এর কথা। ইহার উত্তর এই যে, আহলে বয়াতের ইমামগনের এই রীতিই ছিল যে, তাঁহারা নিজেদের ব্যক্তিগত মর্যাদার দরুন হাদীসের নাম ধরিয়া মহানবী (সা.) পর্যন্ত পৌছানো জরুরী মনে করিতেন না। তাঁহাদের এই রীতি সুপরিচিত। বস্তুতঃ শিয়া মযহাবে শত শত এই ধরনের হাদীস মজুদ আছে। স্বয়ং ইমাম দারকুতনী ইহাকে হাদীসরূপে লিখিয়াছেন।

(গ) গ্রহণ–সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী যথা–সময়ে পূর্ণ হয়েছেঃ

এ সম্বন্ধে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আ.) বলেনঃ এই হাদীস একটি অদৃশ্য বিষয়ের সহিত সম্পৃক্ত, যাহা তেরশত বৎসর পর প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার সার–সংক্ষেপ এই যে, যে সময় প্রতিশ্রুত মাহদী আবির্ভূত হইবেন তাঁহার যুগে রমযান মাসে ত্রয়োদশ রাত্রিতে চন্দ্রগ্রহণ হইবে এবং এই মাসেই আটাশতম দিনে সূর্যগ্রহণ হইবে এবং এইরূপ ঘটনা প্রতিশ্রুত মাহদীর যুগ ছাড়া অন্য কোন দাবিকারকের যুগে ঘটিবে না। বলাবাহুল্য, নবী ছাড়া এইরূপ সুস্পষ্ট অদৃশ্যের কথা বলা অন্য কাহারো কাজ নহে। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে বলেন, "আল্লাহ সম্মানিত রসূলগণ ছাড়া নিজ অদৃশ্য বিষয়ের খবর অন্য কাহাকেও অবহিত করেন না (সুরা আল্ জিন্ন- আয়াত ২৬-২৭)"।

অতএব যেক্ষেত্রে এই ভবিষ্যদ্বাণী নিজ অর্থ অনুযায়ী সামগ্রিকভাবে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, সেক্ষেত্রে ইহা একটি খোড়াঁ অজুহাত যে, হাদীস দুর্বল বা ইহা ইমাম মোহাম্মদ বাকেরের কথা। আসল কথা এই যে, এই সকল লোক নিশ্চয় চাহে না যে, মহানবী (সা.) এর কোন ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হউক, বা কুরআন শরীফের কোন ভবিষ্যদ্বানী পূর্ণ হউক। পৃথিবী শেষ হওয়ার কাছাকাছি সময় পর্যন্ত পৌছিয়াছে। কিন্তু তাহাদের কথা অনুযায়ী এখন পর্যন্ত শেষ–যুগ সম্পর্কে কোন ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নাই। এই হাদীসের চাইতে অধিক আর কোন্ হাদীস সত্য হইবে, যাহার শিরোভাগে মোহাদ্দেসগণের 'তানকিদ' (পর্যালোচনা)-এরও স্বীকারক্তি নাই। বরং উহা নিজের সত্য হওয়া সম্পর্কে প্রকাশ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছে যে, উহা সত্য হওয়ার উচ্চ মার্গে আছে। খোদার নিদর্শনাবলীকে গ্রহণ না করা ভিন্ন কথা। নতুবা ইহা একটি আযীমুশ্বান নিদর্শন। আমার পূর্বে হাজার হাজার আলেম ও মোহাদ্দিস ইহা ঘটার ব্যাপারে আশাবাদী ছিলেন।

(ঘ) রমযান মাসে কতবার গ্রহণ হয়েছে সেটাই একমাত্র বিষয় নয়।

এ সমন্ধে মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন ঃ "বিশ্বসৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত রমযান মাসে কতবার চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়েছে সেটি নিয়ে আমরা চিন্তিত নই। আমাদের উদ্দেশ্য এতটুকু উল্লেখ করা যে, এই বিশ্বে মানব সৃষ্টির পর থেকে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ নিদর্শন হিসেবে সংঘটিত হয়েছে শুধুমাত্র আমার যুগে আমার জন্য। আমার আগে, এ রকমটি কখনও হয়নি যে, একদিকে কোন ব্যক্তি নিজেকে মাহদী মাওউদ (প্রতিশ্রুত সংস্কারক) দাবি করেছেন আর তখন রমযান মাসে, নির্ধারিত দিনক্ষণে চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়েছে এবং সেই দাবিকারক গ্রহণের এই ঘটনাকে তার দাবির সমর্থনে নিদর্শন হিসেবে পেশ করেছেন। দারকুৎনির এই হাদীস এটি আদৌ বলে না যে, এর আগে কখনো চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণ হয়নি বরং এটি পরিস্কার ভাষায় বলে যে, এ ধরনের গ্রহণের ঘটনা কোন দাবিকারকের সত্যতার নিদর্শন হিসেবে সংঘটিত হয়নি।

কারণ, 'তাকুনা' শব্দটি এখানে ব্যাবহৃত হয়েছে যা স্ত্রী– লিঙ্গ (মুয়ান্নাস)। এর মানে হলো এ ধরনের নিদর্শন আগে প্রকাশিত হয়নি। যদি এটা বোঝানো হতো যে, এ ধরনের গ্রহণ এর আগে কখনো সংঘটিত হয়নি, তাহলে 'ইয়াকুনা' শব্দটি ব্যবহৃত হতো, যেটি কিনা পুং–লিঙ্গ (মুযাক্কার)। সেক্ষেত্রে 'তাকুনা' শব্দটি ব্যাবহৃত হতোই না, কারণ এটি স্ত্রী–লিঙ্গ। এ থেকে এটি পরিস্কার বোঝা যায় যে, এই শব্দটি দিয়ে দুটি নিদর্শনকে নির্দেশ করা হচ্ছে–কারণ, নিদর্শনসূচক শব্দটি স্ত্রী–লিঙ্গের। অতএব,

কেউ যদি ভাবেন যে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ এর আগে বহুবার সংঘটিত হয়েছে, তবে তার দায়িত্ব সেই মাহদী দাবিকারককে চিহ্নিত করা যিনি চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণকে তার সমর্থনে নিদর্শন হিসেবে পেশ করেছেন। এই প্রমাণ নিশ্চিত ও চূড়ান্ত হতে হবে আর এটি তখনই সম্ভব হবে যদি দাবিকারকের একটি বই পেশ করা হয় যেটিতে তিনি নিজেকে মাহদী মাউদ দাবি করেছেন এবং তিনি লিখেছেন যে, রমযান মাসে যে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে তা দারকুৎনির সেই হাদীসের তারিখ অনুসারে হয়েছে এবং এটি তার সত্যতার নিদর্শন। সংক্ষেপে, আমরা শুধুমাত্র চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হওয়া নিয়ে মোটেও চিন্তিত নই, যদি তা হাজার বারও সংঘটিত হয়ে থাকে। নিদর্শন হিসেবে কোন দাবিকারকের সময়ে এটি সংঘটিত হয়েছে শুধুমাত্র একবার এবং হাদীসটির শুদ্ধতা ও সত্যতা প্রমানীত হয়েছে মাহদী দাবির সময়ে পূর্ণতার মধ্য দিয়ে।" [চশমা এ মারেফাত, প্রকাশকাল: ১৯০৮, রূহানী খাযায়েন, ২৩তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩২৯-৩৩০]

(ঙ) মিথ্যা দাবিকারী সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) মূল্যবান দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন

সত্য দাবিকারী সনাক্ত করার উপায় সম্পর্কে তিনি বলেনঃ "হাদীসে এটা বলা হয়নি যে, মাহদীর আবির্ভাবের আগে রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ ঘটবে। কারণ, সেক্ষেত্রে এটি সম্ভবপর ছিল যে, রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হওয়া দেখে কোনো মিথ্যা দাবিকারকও নিজেকে প্রতিশ্রুত মাহদী হিসেবে দাবি করতে পারতো। আর এভাবে বিষয়টি দ্ব্যার্থবোধক হয়ে যায় যেহেতু গ্রহণের পর দাবি করাটা সহজ। চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের পর যদি একাধিক দাবিকারক উপস্থিত হয়, তবে এটি স্পষ্ট যে, এই গ্রহণদ্বয় কারো সত্যতার প্রমাণ হিসেবে কাজে আসবে না।" (আনোয়ারুল ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৮)

"প্রাচীনকাল থেকে এটা আল্লাহ্‌র রীতি যে, ঐশী নিদর্শন তখনি প্রদর্শিত হয় যখন আল্লাহ্‌র প্রেরিত ব্যক্তিদেরকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করা হয় এবং তাদেরকে ভন্ড বলা হয়।" (তোহফায়ে গোলরাভিয়া, রূহানী খাযায়েন, ১৭তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৪২)

১৮৯৪ সালে কাদীয়ানে গ্রহণগুলো দেখা যাওয়ার পর এ সম্পর্কে তিনি (আ.) লেখেনঃ "হে খোদার বান্দাগণ, তোমরা চিন্তা-ভাবনা করো। তোমরা কি এটা মনে করো যে, মাহদী আরবের কোনো দেশে বা সিরিয়ায় জন্মগ্রহণ করবে আর তার নিদর্শন প্রকাশিত হবে আমাদের দেশে? তোমরা জানো যে, যে ব্যক্তির সমর্থনে নিদর্শন প্রকাশিত হচ্ছে তাঁর কাছ থেকে খোদা তা'লার প্রজ্ঞা নিদর্শনটিকে পৃথক করে না। তাহলে এটা কিভাবে সম্ভবপর যে, মাহদী আসবে পূর্ব অঞ্চলে আর নিদর্শন প্রদর্শিত হবে পশ্চিম অঞ্চলে? তোমাদের জন্য তো এতোটুকুই যথেষ্ট হওয়া উচিত যদি তোমরা সত্যিকারের সত্যান্বেষী হও।" [নূরুল হক, দ্বিতীয় খণ্ড]

(চলবে)

প্রত্যেক সপ্তাহে কমপক্ষে জুমআর খুতবা শোনার প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দিন। একতাবদ্ধ হওয়ার জন্য এই ব্যবস্থাপনা যা আল্লাহ তা'য়ালাই প্রবর্তন করেছেন, এর মাধ্যমে একই সময়ে বিশ্বের সকল প্রান্তে যুগ খলীফার আওয়াজ পৌঁছে যায়। এর অংশে পরিণত হওয়া প্রত্যেক আহমদীর জন্য আবশ্যক। অতএব এই বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিন। যদি আমরা এটিই না জানি যে, কি বলা হচ্ছে, তাহলে আনুগত্য কি করে হবে?
আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের তরবীয়তের জন্য যেসব সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করেছেন এর থেকে যেন আমরা পরিপূর্ণরূপে লাভবান হই। আর শুধুমাত্র তরবীয়তই নয় বরং ইসলামের শিক্ষা প্রচারের ক্ষেত্রেও এটি (MTA) অনেক বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যদি কোন কারণে লাইভ বা সরাসরি খুতবা শোনা না হয় তাহলে রেকর্ডিং শুনতে পারেন। ইন্টারনেটেও খুতবাগুলো রয়েছে। অতএব আপনাদের প্রত্যেকের এই বিষয়টি দৃষ্টিতে রাখা উচিত এবং প্রত্যেকেরই এই বিষয়টি প্রয়োজন রয়েছে অর্থাৎ এম টি এ-এর সাথে নিজেদের সম্পর্ক গড়ে তুলুন যাতে আপনারা এই ঐক্যের এবং একতার অংশে পরিণত হতে পারেন।

৯ই অক্টোবর ২০১৫, জুমুআর খুতবা।

mta বাংলা

visit ▶ mtabangla.tv

please Subscribe ▶ MTA BANGLA | Follow us ▶ MTA BANGLA

ইসলামে যাকাত প্রদানের গুরুত্ব

মাহমুদ আহমদ সুমন

বরকত ও কল্যাণময় মাস আমরা অতিবাহিত করছি। আমরা জানি, রমযানের দিনগুলোতে আমাদের প্রিয় নবী (সা.) ঝড়ো গতিতে দান খয়রাত করতেন। যাদের সামর্থ্য আছে তাদের মধ্যে অনেকেই আছেন রমযানে দান-খয়রাত করেন কিন্তু যে হারে করা প্রয়োজন সেভাবে করেন না। এছাড়া শুধু রমযান মাস আসলেই হাতে গনা কিছু মানুষকে দেখা যায় যাকাতের কাপড় বিতরণ করতে এছাড়া সারা বছর এমনটি চোখে পরে না। আমরা যেভাবে নামায আদায় করাকে ফরজ জানি তেমনি যাকাত প্রদানও ইসলামের মৌলিক স্তম্ভগুলোর একটি। পবিত্র কুরআন করীমে বিরাশি জায়গায় আল্লাহ্ তা'লা সালাতের কথা উল্লেখ করেছেন। আর প্রায় সবখানেই সালাতের সাথে সাথে যাকাত প্রদানের নির্দেশও দিয়েছেন। তাই এ থেকে বুঝা যায় যাকাত অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যবহ একটি বিষয়। সালাতের সাথে যাকাতের সম্পর্ক ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। সংগতিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে যাকাত ব্যতীত সালাত কায়েম হওয়া সম্ভব নয়। সালাত ও যাকাত ব্যতীত ইসলামী জীবন গঠন অসম্ভব।

পৃথিবীর বুকে মানুষ যাতে সুখে শান্তিতে সুষ্ঠ ও সুন্দর ভাবে জীবন যাপন করতে পারে তার জন্যই বান্দার প্রতি দয়াময় আল্লাহ্ তা'লা যাকাতের ব্যবস্থা করেছেন। শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির নামই ইবাদত নয়। সংসারে জন্মগ্রহণ করে সংসারধর্ম রক্ষা করে, সত্য ও সঠিক পথে চলে মানব জীবনে প্রতিটি কর্মই ইবাদতের মধ্যে শামিল। হযরত নবী করীম (সা.) আযানের পর নিজ কক্ষ থেকে বের হয়ে মসজিদে আগমন করতেন এবং সমবেত মুসল্লিগণের সাথে বসতেন এবং উপস্থিত অনুপস্থিত প্রত্যেক মুসলিম ভাই বোনদের খবরাখবর নিতেন ও প্রত্যেকের জাগতিক সমস্যার সমাধান করতেন।

এ কাজের জন্য প্রয়োজন বস্তু সম্পদের, সে কারণেই সালাতের সাথে যাকাত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মূলত ইসলামে সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করার অবকাশ নেই। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ (রা.) বলেছেন, 'তোমাদের এক সাথে আদেশ করা হয়েছে সালাত কায়েম করা ও যাকাত আদায় করার। তাই কেউ যাকাত আদায় না করলে তার সালাতও আদায় হবে না।' ইসলাম শুধু উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হয় নাই। বাস্তব জীবনে যাকাতকে ফরজ কার্যের আওতায় এনে প্রতিফলন ঘটিয়েছে। যাকাত দ্বারা দরিদ্র জনসাধারণের জন্য একটি চিরস্থায়ী দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর এর জন্য মুসলমানগণ বায়তুল মাল বা জাতীয় ধন ভান্ডার ভিত্তি অনুসরণ করে জগতের বুকে আত্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সামর্থ হয়েছিলেন। হযরত রাসূল করীম (সা.) জাতীয় দৈন্য দুর্দশার মুক্তি সাধনায় বহু ত্যাগ স্বীকার করে তিনি বায়তুল মালকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলে মুসলমান জাতির প্রাণশক্তি ছিল বায়তুল মাল। তখন যাকাত আদায় করার জন্য আদায়কারী নিযুক্ত ছিল। তারা নিয়মিত যাকাত আদায় করে বায়তুল মাল-এ জমা দিতেন এবং তা থেকে দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে যথাবিধি বন্টন এবং ইসলামের প্রচার ও প্রসার কল্পে ব্যয়িত হতো।

হযরত আবু বকর (রা.) এর সময়ে একদল মুসলমান যারা সালাত আদায় করতো কিন্তু যাকাত প্রদানে অস্বীকার করলে তাদের বিরুদ্ধে হযরত আবু বকর (রা.) অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। সাহাবীগণের অধিক সংখ্যকই ছিলেন দরিদ্র ও অভাবী। নিজেদের ব্যবহারিক জীবনে তারা বহু অভাব অনটনে থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র পথে দ্বীনের কাজের জন্য বহুবিধ পথে তারা সম্পদ ব্যয় করতেন।

যাকাত প্রদান না করার শাস্তি সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ যাকে সম্পদ দিয়েছেন, সে যদি তার সম্পদের যাকাত আদায় না করে তাহলে তার সম্পদকে কিয়ামতের দিন টাকপড়া বিষধর সাপের রূপ দেওয়া হবে। যার চোখের ওপর দু'টি কালো দাগ থাকবে। কিয়ামতের দিন সেই সাপকে তার গলায় পেঁচিয়ে দেওয়া হবে। এরপর সাপ তার মুখে দংশন করতে থাকবে এবং বলতে থাকবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চয়' (সহিহ বুখারী)।

এ সকল সাদাকাতের মধ্যে যাকাত ছিল অগ্রগণ্য ও সর্বব্যাপী। সব জিনিষের ওপর যাকাতের একটি অংশ বরাদ্ধ ছিল। উৎপাদিত ফসলের ওপর, বাণিজ্য পণ্যের ওপর, ঘোড়া, উট ও গবাদি পশুর ওপর, বাগ-বাগিচা ইত্যকার সকল জিনিষের ওপর যাকাতের নির্দেশ আছে। মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সাহাবীদের (রা.) অনেক বেশি দরিদ্র ও অভাব সত্ত্বেও কখনো কোন নির্দেশের তারা আপত্তি তোলেন নি। অধিকন্তু পরম আন্তরিকতা ও উদারতার সাথে যাকাত, সদকা, দান খয়রাত করে গিয়েছেন। আসলে এ দান তো আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছায় না। ধন-সম্পদ দান করে আমরা আসলে আমাদের নিজেদেরই সুখ শান্তি ও কল্যাণের জন্য পৃথিবীতে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করি। ইসলামই সাম্য মৈত্রী ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছে। ইসলামের লক্ষ্য মানবজাতির সার্বিক কল্যাণ সাধন।

যাকাত শুধু নগদ অর্থের ওপর নয় বরং পশু, ফসল, সোনা, রূপা সব কিছুরই যাকাত রয়েছে। সব রকমের মূলধনের জন্য নিসাবের নিরিখ হলো রূপা অর্থাৎ যার নিকট ৫২ তোলা ৬ মাসা অর্থাৎ সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা থাকে বা এত রূপা বা সোনা থাকে যা দিয়ে এ পরিমাণ রূপা কেনা যায় তখন এর যাকাত দেয়া অবশ্য-কর্তব্য হবে। যাকাতের বিষয় হলো পুরো মূলধনের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ বা আড়াই (২.৫%) শতাংশ। এটা সেই সম্পদের যাকাত যার জন্যে নিসাবের নিরিখ রূপা আর নিসাবের নিরিখ জানার জন্য ওজন হলো মাধ্যম।

মহিলাদের বক্তিগত ব্যবহারে থাকে এমন সোনা ও রূপার অলংকারাদির বেলায় এবং কখনও কখনও চাওয়ার পরে তারা গরীব স্ত্রীলোকদের ব্যবহার করতে দেয় এর ওপরে যাকাত হবে না। হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম বলেছেন, 'যে অলংকার ব্যবহারে রয়েছে এর যাকাত নেই।' এছাড়া যা রেখে দেয়া হয় এবং কখনও কখনও পরা হয় এর যাকাত দেয়া আবশ্যক। যে অলংকার পরা হয় আর কখনও কখনও দরিদ্র মহিলাদেরকে ব্যবহার করতে দেয়া হয়, এ বিষয়ে কোন কোন লোকের ফতওয়া হল, এর যাকাত নেই। আর যে অলংকার পরা হয় এবং অন্যকে ব্যবহারের জন্য দেয়া হয় না এর যাকাত দেয়া ভাল। কেননা, এ নিজের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। (মযমুআ ফাতাওয়া আহমদীয়া, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৭, আল্ হাকাম, ১৭ নভেম্বর, ১৯০৫)।

যাকাত প্রদানের নির্দেশ দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ্ তা'লা ইরশাদ করেছেন, 'তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর। তোমরা যে উত্তম কাজ নিজেদের জন্য অগ্রে প্রেরণ করবে তা আল্লাহ্‌র নিকট পাবে। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন' (সূরা বাকারা, আয়াত: ১১১)।

যাকাত প্রদানের ফজিলত বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'মানুষের ধনসম্পদ একীভূত হয়ে বৃদ্ধি পাবে বলে যে (অর্থ) তোমরা সুদ লাভের উদ্দেশ্যে দিয়ে থাক সে (অর্থ) আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে বাড়ে না। আর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা যাকাত হিসেবে যা দাও সেক্ষেত্রে এরাই সেইসব লোক যারা (যাকাতের মাধ্যমে নিজেদের ধন-সম্পদ) বহুগুণে বাড়াতে থাকে' (সূরা আর রূম, আয়াত: ৪০)। আবার আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'তাদের ধন-সম্পদ থেকে তুমি দানখয়রাত গ্রহণ কর এবং এর মাধ্যমে তুমি তাদের পবিত্র কর ও তাদের জন্য দোয়া কর। নিশ্চয় তোমার দোয়া তাদের জন্য প্রশান্তির কারণ হবে। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সবজ্ঞ' (সূরা আত তাওবা, আয়াত: ১০৩)।

অপর দিকে যাকাত প্রদান না করার শাস্তি সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন, 'যারা সোনা, রূপা জমা রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না- তাদের তুমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও। যেদিন সেগুলো উত্তপ্ত করে তাদের মুখমণ্ডল, পার্শ্ব ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে। (এবং বলা হবে) এগুলো তোমাদের সেই সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চিত করে রেখেছিলে। এখন তোমরা নিজেদের সঞ্চিত সম্পদের স্বাদ আস্বাদন কর' (সূরা আত তওবা, আয়াত: ৩৪-৩৫)।

যাকাত প্রদান না করার শাস্তি সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ যাকে সম্পদ দিয়েছেন, সে যদি তার সম্পদের যাকাত আদায় না করে তাহলে তার সম্পদকে কিয়ামতের দিন টাকপড়া বিষধর সাপের রূপ দেওয়া হবে। যার চোখের ওপর দু'টি কালো দাগ থাকবে। কিয়ামতের দিন সেই

সাপকে তার গলায় পেঁচিয়ে দেওয়া হবে। এরপর সাপ তার মুখে দংশন করতে থাকবে এবং বলতে থাকবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চয়' (সহিহ বুখারী, হাদীস নং ৪৫৬৫)।

কেউ কেউ এমনও বলে থাকেন যে, আমরা তো জামা'তের বিভিন্ন খাতে চাঁদা দিচ্ছি তাই আবার যাকাত কেন দেব। এই ধরণের ধারণা মোটেও ঠিক নয়। চাঁদা এবং যাকাতের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আহমদীয়া জামা'তের সদস্যদের যে চাঁদা প্রদানের নির্দেশ তা যুগ মসীহ্ এবং খলীফাতুল মসীহগণের তাহরীক আর এটি সবার জন্য প্রযোজ্য। অপর দিকে আল্লাহ্ তা'লা যাকাত প্রদানের যে নির্দেশ দিয়েছেন তা সবার জন্য নয় বরং যাদের ওপর যাকাত ফরয কেবল তারাই যাকাত প্রদান করবেন।

এ প্রসঙ্গে গত ১৩ মে ২০১৬ হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) জুমুআর খুতবার একাংশে বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের বেশ কয়েক স্থানে যাকাত প্রদানের প্রতি এবং সম্পদ খরচের প্রতি, বিশেষভাবে যাকাত প্রদানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অনেকেই বলে, জামাতে যাকাত প্রদানের প্রতি খুব একটা মনোযোগ দেয়া হয় না। অথচ এটি ইসলামের মৌলিক একটি নির্দেশ, এটিকে উপেক্ষা করে চাঁদার ওপর বেশি জোর দেয়া হয়। এই ধারণা ভ্রান্ত। যাকাত যার জন্য আবশ্যক তার দৃষ্টি অবশ্যই আকর্ষণ করা হয়। আর বার বার তার মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়। আমি বেশ কয়েকটি খুতবায় বেশ কয়েক বছর থেকে বিশদভাবে বিভিন্ন সময় এর ওপর আলোকপাত করেছি। এটি কীভাবে হতে পারে যে, আমরা এর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করব না, খিলাফত ব্যবস্থার সাথে এক দৃষ্টিকোণ থেকে যাকাতের সুগভীর সম্পর্ক রয়েছে।

আয়াতে 'ইস্তেখলাফ' যে আয়াতে খিলাফত ব্যবস্থার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে এবং দিক-নির্দেশনা রয়েছে এর পরবর্তী আয়াতেই আল্লাহ্ তা'লা নামায কায়েম করা এবং যাকাত প্রদানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যদি অন্যান্য চাঁদা এবং তাহরীকের প্রতি আহ্বান করা হয় তাহলে এর কারণ হলো, যাকাত সবার জন্য আবশ্যক নয়, এর একটা হার আছে, যাকাতের কিছু শর্ত আছে, আর শুধুমাত্র এ যাকাত দিয়েই সব ব্যয়ভার নির্বাহ হতে পারে না। জামাতের তত্ত্বাবধানে পৃথিবীতে যত ব্যাপক কার্যক্রম চলছে এর নির্বাহের জন্য অন্যান্য চাঁদার প্রতি দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। ওসীয়্যত এবং রীতিমত নিজের জন্য আবশ্যক মনে করে প্রত্যেক মাসে চাঁদা প্রদান বা প্রদানের এই যে ব্যবস্থা এটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নিজের হাতে প্রতিষ্ঠিত বা সূচিত।"

সাড়ে বায়ান্ন ভরি রূপা বা তার মূল্যমানের অতিরিক্ত সম্পদ কারো মালিকানায় পূর্ণ এক চান্দ্রবছর অতিবাহিত হলে তার ওপর যাকাত ফরজ হয়। যার ওপর যাকাত ফরজ তার দায়িত্ব হলো, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে যে বায়তুল মালের ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে তা জমা দেয়া, এটাই ইসলামী শিক্ষা।

ইসলাম প্রবর্তক হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, 'সমগ্র সৃষ্টিকে নিয়ে আল্লাহ্‌র একটি পরিবার। সেই ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা উত্তম, যে তার পরিবারের প্রতি ব্যবহারে উত্তম। তুমি কি বিশ্ব প্রভুকে ভালবাস? তাহলে প্রথম তার সৃষ্টিকে ভালবাস। তোমার নিজের জন্য যা ভালোবাস তা অন্যের জন্যও ভালবাসবে। তোমার নিজের জন্য যা অপ্রিয় মনে করো তা অন্যের জন্যও অপ্রিয় মনে করবে। তুমি নিজে যেরূপ ব্যবহার পেতে ইচ্ছা কর, অন্যের সাথেও সেইরূপ ব্যবহার করবে।' আমার কাছে অনেক ধন-সম্পদ রয়েছে অথচ আমার পাশের ঘরের মানুষটি না খেয়ে পরিবারসহ অতি কষ্টে দিনাতিপাত করছে আমরা কি তার খোজ রাখছি? ইফতারে হরেক রকমের খাবার দিয়ে পুরো টেবিল বোঝাই করছি অথচ আমারই কোন প্রতিবেশী হয় তো এক গ্লাস পানি খেয়ে ইফতার করছে। আমাদের ধন-সম্পদে প্রতিবেশীর হক রয়েছে, আমাদেরকে সেই হক আদায় করতে হবে, আর এর জন্য সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি হল সম্পদের যাকাত প্রদান করা। এছাড়া যার ওপর যাকাত ফরয নয় তার কাছে যা-ই আছে তা দিয়ে সে তার প্রতিবেশীর খোজ খবর রাখতে পারে। মহানবী (সা.) তো এও বলেছেন যে, তরকারী রান্নার সময় তাতে ঝোল একটু বাড়িয়ে দাও যাতে প্রতিবেশীকে দেয়া যায়। আমাদেরকে কি আল্লাহ্ তা'লা এমন সামর্থ্য দেয় নি যে, আমরা আমাদের প্রতিবেশীর খোজ নিতে পারি না?

আমরা আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করি, বর্তমান যুগে অনেক মুসলমান এমন আছেন যারা বহু টাকা খরচ করে হজ্জব্রত পালন করে আলহাজ্জ উপাধি লাভ করেন বটে কিন্তু যাকাতের প্রতি বেখেয়াল-বেখবর কোন মনোযোগ নেই। ভাবনা চিন্তাও নেই এছাড়া তাদের মাঝে যাকাত আদান প্রদানের সঠিক তেমন কোন বায়তুল মালের ব্যবস্থাও দেখা যায় না। এর আসল কারণ মুসলমানগণের নাই কোন নেতা, নাই কোন বায়তুল মাল, নাই একতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ, নাই পরস্পর সহানুভূতি। আজ একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত এই দাবি করতে পারে যে, এখানেই রয়েছে এক খলীফা, একক নেতৃত্ব এবং বায়তুল মালের ব্যবস্থা। যার মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীতে যাকাতের সুষ্ঠু বণ্টন হচ্ছে, যার ফলে কোন আহমদীকে কারো কাছে হাত পাততে হয় না, যাকাতের কাপড়ের জন্য কারো প্রাণও দিতে হয় না।

পবিত্র এ মাহে রমজানে আমাদেরকে যেমন অনেক বেশি নফল ইবাদত করতে হবে তেমনি আল্লাহ্‌র আদেশ মেনে যাকাত প্রদানে সোচ্চার হয়ে অসহায়দের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। আমরা যদি আল্লাহ্‌র হক এবং বান্দার হক সঠিকভাবে আদায় করি তবেই না আল্লাহ্‌পাকের জান্নাত লাভে সক্ষম হবো। মহান আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে তাঁর সকল নির্দেশ মেনে চলার তৌফিক দান করুন, আমীন।

masumon83@yahoo.com

সূরা ফাতিহার ফযীলত

প্রত্যেক প্রকারের রোগ আরোগ্য দানকারী সূরা ফতিহা

মওলানা সৈয়্যদ মোজাফফর আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

পবিত্র কুরআন করীমের প্রারম্ভেই একটি ছোট সূরা রাখা হয়েছে যার নাম হল, "ফাতিহাতুল কিতাব" যা সংক্ষিপ্ত হয়ে সূরাতুল ফাতিহা হয়েছে। আর পরবর্তীতে উর্দু বিশারদগণ নামটিকে ফারসী ভাষা অনুযায়ী সূরা ফাতিহা বানিয়ে দিয়েছে। এই নামের উল্লেখ হাদীস শরীফেও দেখতে পাওয়া যায়– "যতক্ষণ নামাযে "ফাতিহাতিল কিতাব" অর্থাৎ সূরা ফাতিহা না পড়া হবে ততক্ষণ পর্যন্ত নামায হবে না এক কথায় সূরা ফাতিহা ছাড়া কোন নামায হবে না"। (তিরমিযী, মুসলিম)

এই সূরার বিভিন্ন প্রসিদ্ধ নাম রয়েছে যা কুরআন ও হাদীস থেকে পাওয়া যায়। যেমন ঃ

(১) সুরাতুস্ সালাত ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রসূলে করীম (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, "আমি নামাযকে (অর্থাৎ সূরা ফাতিহাকে) আমার ও আমার বান্দার মধ্যে অর্ধেক অর্ধেক করে বন্টন করে নিয়েছি। অর্থাৎ অর্ধেক সূরায় আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে ও বাকী অর্ধেক সূরায় বান্দার পক্ষে দোয়া করা হয়েছে। (মুসলিম)

(২) সূরাতুল হামদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন– "আলহামদুলিল্লাহে উম্মুল কুরআনে ওয়া উম্মুল কিতাবে ওয়াস্ সাবউল মাছানী।" (আবুদাউদ)

অর্থাৎ সূরা আলহামদুলিল্লাহে (সূরা ফতিহা) এর অন্যান্য নাম উম্মুল কুরআন, উম্মুল কিতাব ও আস্‌সাবাউল মাছনানীও বটে।

(৩, ৪ ও ৫) উম্মুল কুরআন, আল কুরআনুল আযীম ও আস্‌সাবউল মাছানীঃ

এই তিনটি নামও সূরা ফাতিহারই। যেভাবে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলে করীম (সা.) বলেছেন– এছাড়া আস্‌সাবউল মাছানী শব্দটি কুরআন করীমে ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছে (সূরা আল হিজর, রুকূ ঃ ৬)

অতএব, এই নামটি স্বয়ং কুরআন করীমের রাখা নাম।

(৬) আশ্ শিফা ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন–ফাতিহাতুল কিতাব অর্থাৎ সূরা ফতিহা প্রত্যেক প্রকারের রোগ হতে আরোগ্য দান করে। (দারমী)

(৭) আর রুকাইয়া ঃ এটি দমকারী সূরা। এই নামেরও উল্লেখ বুখারী ও মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলে পাওয়া যায়। বর্ণিত আছে যে, একদা এক ব্যক্তিকে সাপ দংশন করে। তখন বর্ণনাকারী সূরা ফাতিহা পড়ে দম্ করে এবং সে সুস্থ হয়ে যায়। তখন রসূলে করীম (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন যে– অর্থাৎ তুমি কিভাবে জানলে যে, এটা দমকারী সূরা!

(৮) সূরাতুল কান্য ঃ হযরত আনসার (রা.) হতে বর্ণিত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, "খোদা তা'লা অনুগ্রহ করে আমাকে যে সব পুরস্কার দিয়েছেন তার মধ্যে একটি হল ফতিহাতুল কিতাব। এবং আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এ-ও বলেছেন যে, এটি আমার আরশের খাজানা হতে একটি খাজানা"। [ফাতাহুল বায়ান, পৃ: ১৯]

(৯) উম্মুল কিতাব ঃ এই নামের উল্লেখ আবু দাউদ শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে পাওয়া যায়।

অতএব এই নয়টি নামের উল্লেখ কুরআন ও হাদীসে পাওয়া যায়।

ফাতিহা নামটি এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নাম যা কিনা ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও লিপিবদ্ধ আছে। যেমনঃ "তারপরে আমি আরেকজন শক্তিশালী স্বর্গদূতকে স্বর্গ থেকে নেমে আসতে দেখলাম। তাঁর পোশাক ছিল মেঘ, আর তাঁর মাথার ওপরে ছিল মেঘধনুক। তাঁর মুখ সূর্যের মত আর তাঁর পা ছিল আগুনের থামের মত। তাঁর হাতে একটা খোলা ছোট বই ছিল। তিনি তাঁর ডান পা সমুদ্রের উপরে আর বাম পা ভূমির ওপরে রেখে সিংহের গর্জনের মত জোরে চিৎকার করলেন। তাঁর চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে সাতটা বাজ পড়বার শব্দ হল। যখন সাতটা বাজ পড়বার শব্দ হল তখন আমি

লিখবার জন্য প্রস্তুত হলাম। কিন্তু স্বর্গ থেকে আমাকে একথা বলা হল, সাতটা বাজ যে কথা বলল তা গোপন রাখ, লিখো না"। (প্রকাশিত বাক্য, অধ্যায়; ১০ আয়াত ১-৫)।

এই সূরার নাম ও আয়াত সংখ্যা পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী আকারে লিপিবদ্ধ ছিল। কিন্তু অনুবাদকগণ এর প্রকৃত মর্ম বুঝতে না পারার দরুন হিব্রু শব্দ "ফুতুহান"-এর প্রকৃত মর্ম বুঝতে এর অর্থ "খোলা বই" করেছে। অথচ এখানে সূরার নাম "ফুতুহাহ্" অর্থাৎ 'ফাতিহা' রাখা হয়েছে। এছাড়াও ভবিষ্যদ্বাণীতে যে সাতটি গর্জনের কথা বলা হয়েছে তা দ্বারা সূরা ফাতিহার সাতটি আয়াতকে বুঝানো হয়েছে। এছাড়া এখানে এই ভবিষ্যদ্বাণীও রয়েছে যে, মসীহ্ দ্বিতীয়বার আগমন করবেন। আর এ বিষয়ে পাশ্চাত্যের লেখকগণ সম্পূর্ণ একমত। আর তা একেবারেই সঠিক। এছাড়াও এই সূরায় এই ভবিষ্যদ্বাণীও লিপিবদ্ধ আছে যে, সূরা ফাতিহার বিশদ ব্যাখ্যা মসীহ্ মাওউদের যুগে প্রকাশিত হবে। যেভাবে বলা হয়েছে যে, সাতটা কাজ যে কথা বলল তা গোপন রাখ, লিখো না।"

সূরা ফাতিহার বিভিন্ন ফযীলতের কথা হাদীসে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেভাবে উপরোল্লিখিত নামসমূহে এর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এখন আমি বিস্তারিতভাবে কথা তুলে ধরছি।

হযরত আবি বিন কা'ব (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূলে করীম (সা.) বলেছেন– "আল্লাহ্ তা'লা না তওরাত না ইঞ্জিলে এমন কোন সূরা অবতীর্ণ করেছেন যেমনটি হল উম্মুল কুরআন (অর্থাৎ সূরা ফাতিহা)। আর এর আরেক নাম হল "আস্‌সাবউল মাছানী"। আল্লাহ্ তা'লা এই সূরা সম্পর্কে আমাকে বলেছেন যে, এটিকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে সমভাবে বন্টন করে দেয়া হয়েছে। এবং এর মাধ্যমে আমার বান্দা আমার কাছে যে দোয়াই করবে তা অবশ্যই কবুল করা হবে। (নিসাঈ)

এই ফযীলত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এতে এমন এক বিষয়ে বলা হয়েছে যা মানুষের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা রাখবে। অর্থাৎ এই সূরার মাধ্যমে যে দোয়া করা হয় তা কবুল করা হয়। কিন্তু এর অর্থ এটি নয় যে সূরা ফাতিহা পড়ে যে দোয়াই করা হবে তা অবশ্যই কবুল হয়ে যাবে। বরং এর অর্থ হল, দোয়া করার যে মাধ্যম এই সূরায় বলা হয়েছে তা অবলম্বন করার মাধ্যমে দোয়া গৃহীত হয়ে থাকে।

এখন প্রশ্ন হল, সেই মাধ্যম কোনটি? যেভাবে এই সূরায় বলা হয়েছে তা থেকে স্পষ্ট যে, প্রথম মাধ্যম হল, "বিসমিল্লাহ্" , দ্বিতীয় মাধ্যম হল, "আলহামদুলিল্লাহ্", তৃতীয় মাধ্যম হল, "আর রহমান", চতুর্থ মাধ্যম হল, "আর্ রহীম", পঞ্চম মাধ্যম হল, "মালিকি ইয়াওমিদ্দীন", ষষ্ঠ মাধ্যম হল, "ইয়্যা কা'বুদু", এবং সপ্তম মাধ্যম হল, "ইয়াকা নাসতা'ঈন"। অর্থাৎ যেভাবে এই সূরার আয়াত সংখ্যা সাত, তদ্রুপ দোয়া কবুলিয়্যতের সাতটি গুরুত্বপূর্ণ নীতির কথা এই সূরায় বলা হয়েছে।

"বিসমিল্লাহ্"-তে একথা বলা হয়েছে, উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে দোয়া করা হয় তা যেন নেক হয়। এমনটি নয় যে, কেউ চুরি করার উদ্দেশ্যে দোয়া করবে এবং তার দোয়া কবুল করা হবে। খোদা তা'লার নাম নিয়ে এবং তাঁর অনুগ্রহ কামনা করে যে দোয়া করা হবে তা অবশ্যই এমন কাজ হবে যাতে আল্লাহ্ তা'লার সত্তা বান্দার সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে। অতএব, লক্ষ্য করুন যে, এই ছোট একটি শব্দের মাধ্যমে দোয়ার ব্যাপকতাকে কত স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমি অনেক মানুষকে দেখেছি যারা অন্যের ধ্বংস কামনা করে থাকে। অতঃপর এই অভিযোগ করে যে, তাদের দোয়া কবুল করা হয়নি। অর্থাৎ একদিকে অবৈধ উদ্দেশ্যে দোয়া করে আর অপরদিকে অভিযোগ করে যে দোয়া কবুল হয়নি। এছাড়া অনেকেই এমন আছে যারা খোদাভীরুতার মিথ্যা পোশাক পরিধান করে থাকে এবং অবৈধ উদ্দেশ্যে সফলতা লাভের জন্য তাবিজ দেয় ও দোয়া করে থাকে। কিন্তু তাদের এই কর্ম তাদেরই মুখে ছুড়ে মারা হয়।

দ্বিতীয় নীতি "আলহামদুলিল্লাহে রাব্বিল আলামীন"-এ বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, দোয়া এমন হওয়া চাই যার মাধ্যমে খোদা তা'লার অপরাপর বান্দার, বরং সমগ্র পৃথিবীর উপকার সাধন হয়। অথবা কমপক্ষে তাদের ক্ষতি যেন না হয় এবং দোয়া গৃহীত হওয়ার মাধ্যমে খোদা তা'লার হাম্‌দ বা প্রশংসা প্রকাশিত হয় এবং তাঁর প্রতি যেন কোন প্রকারের আপত্তি আরোপিত না হয়।

তৃতীয়ত, দোয়া এমন হওয়া উচিত যার মাধ্যমে খোদা তা'লার রহমতকে কল্পিত করা হয় এবং দোয়া গৃহীত হওয়ার মাধ্যমে খোদা তা'লার 'রহমান' (অযাচিত অসীম দানকারী) গুণের বিকাশ ঘটে।

চতুর্থত, সেই দোয়ার সম্পর্ক খোদা তা'লার 'রাহীম' গুণের সাথেও সম্পৃক্ত যেন হয়। অর্থাৎ সেই দোয়ার মাধ্যমে যেন এমন পুণ্যের ভিত্তি রচিত হয় যার প্রভাব পৃথিবীর ওপর এক দীর্ঘ সময় ধরে বিরাজ করবে এবং যার মাধ্যমে পুণ্যবান ও ভদ্র প্রকৃতির লোকেরা নিরন্তর ফায়দা হাসিল করতে থাকবে। অথবা কমপক্ষে তাদের রাস্তায় কোন প্রকারের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে না।

পঞ্চমত, দোয়ায় খোদা তা'লার "মালিকি ইয়াওমিদ্দীন" পুণ্যের প্রতিও খেয়াল রাখতে হবে। অর্থাৎ দোয়া করবার সময় সেই সমস্ত পার্থিব উপকরণকে যেন এড়িয়ে যাওয়া না হয় যার মাধ্যমে কাঙ্খিত ফল লাভ হতে পারে। কেননা, সে সমস্ত উপকরণ খোদা তা'লারই সৃষ্টি। অর্থাৎ খোদা তা'লা আমাদেরকে যে সমস্ত জাগতিক উপায়-উপকরণ দান করেছেন সেগুলোকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে দোয়া করা উচিত। তা-না করে শুধুমাত্র দোয়া করলে কাঙ্খিত ফলাফল লাভের আশা করা যায় না। হ্যাঁ, যদি উপায়-উপকরণ না থাকে তবে ভিন্ন কথা। সেক্ষেত্রে খোদা তা'লার এই গুণের বিকাশ আরো ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়।

ষষ্ঠ নীতি হল, খোদা তা'লার সাথে সেই দোয়াকারীর পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সম্পর্ক থাকতে হবে। তাকে শির্ক ও এমন

ধ্যান-ধারণা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র থাকতে হবে।

সপ্তম নীতি হল, দোয়াকারীকে এমন হতে হবে যে, সে সম্পূর্ণরূপে খোদার হয়ে গেছে এবং খোদা তা'লাতেই তার পূর্ণ আস্থা নিহিত। 'গায়রুল্লাহ্' থেকে তার দৃষ্টি একেবারেই সরে যাবে। আর এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছবে যে, যত কষ্টই হোক না কেন, যদি কোন কিছু চাইতেই হয় তবে খোদা তা'লার কাছেই চাইবে।

এই হল সাতটি বিষয়, যার ওপর মানুষ প্রতিষ্ঠিত হতে পারলে সে "লিআবদি মা সা'আলা'-র সত্যায়ণকারী হয়ে যায়। আর দোয়া কবুলিয়্যতের এমন দৃষ্টান্ত মহানবী (সা.) ও তাঁর পূর্ণ আনুগত্যকারীরাই দেখিয়েছেন। এমন দৃষ্টান্ত বা নিদর্শন পৃথিবীবাসী অবলোকন করেছে যার মাধ্যমে অন্ধ তার চোখ ফিরে পেয়েছে, বধির তার শ্রবণশক্তি ফিরে পেয়েছে, মূক ব্যক্তি তার কথা বলার শক্তি ফিরে পেয়েছে। সে ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর পূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণের মাধ্যমে এই মর্যাদা লাভ করতে পারে।

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, আস! আমি তোমাদেরকে কুরআন করীমের সবচেয়ে বড় সূরা শিখাই। অতঃপর তিনি (সা.) সূরা ফাতিহা শিখালেন। অর্থাৎ এই সূরার অর্থ ও তাৎপর্য বড় বড় সূরার চেয়েও অনেক বেশি গভীরতা রাখে।

সূরা ফাতিহার ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন– "স্বপ্নে আমি দেখি যে, আমি পূর্বদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছি এবং আমার সামনে এক প্রশস্ত ময়দান রয়েছে। সেই ময়দানে এমন এক আওয়াজের সৃষ্টি হল যা কোন পাত্রে টোকা দিলে সৃষ্টি হয়। এই ধ্বনি ক্রমশ সমস্ত পরিমন্ডলে ছড়িয়ে পড়ল। অতঃপর সেই ধ্বনির মধ্যমাংশ ছবির আকার ধারণ করতে শুরু করল এবং তা ছবির ফ্রেমের আকারে কিছু হালকা রংয়ের উদয় ঘটতে লাগল। অবশেষে তা উজ্জ্বল হয়ে ছবিতে পরিণত হল এবং সেই ছবি নড়া-চড়া করতে লাগল এবং তা এক জীবন্ত সত্তায় পরিণত হয়ে গেল। আমি খেয়াল করলাম যে, তিনি হলেন ফেরেশতা। সেই ফেরেশতা আমাকে সম্বোধন করে বলেন যে, আমি কি তোমাকে সূরা ফাতিহার তফসীর শিখাব? আমি বললাম, আপনি অবশ্যই আমাকে সূরা ফাতিহার তাফসীর শিখান। অতঃপর সেই ফেরেশতা আমাকে সূরা ফাতিহার তাফসীর শিখাতে শুরু করে। তিনি যখন "ইয়্যা কা না'বুদু ওয়া ইয়্যা কা নাসতা'ঈন পর্যন্ত পৌঁছলেন তখন আমাকে বললেন, যে, এখন পর্যন্ত যত তফসীর লিখা হয়েছে তা এই আয়াত পর্যন্ত লিখা হয়েছে। এর পরের আয়াতসমূহ তাফসীর এখন পর্যন্ত লিখা হয়নি। অতঃপর আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে, এর পরের আয়াতগুলোর তাফসীরও কি তোমাকে শিখাব? আমি বললাম হ্যাঁ! এতে সেই ফেরেশতা আমাকে এর পরের আয়াতগুলোর তাফসীর শিখাতে শুরু করেন। যখন শিখানো সম্পন্ন হয় তখন আমার চোখ খুলে যায় এবং আমি লক্ষ্য করি যে, সেই তাফসীরের দু-একটি কথা ছাড়া আর কোন কিছুই আমার স্মরণে নেই।

অতঃপর সাথে সাথেই আমি শুয়ে যাই। যখন উঠি তখন সেই তাফসীরের কোন কথাই আমার স্মরণে থাকে না। তিনি (রা.) বলেন, এর কিছুদিন পর একটি মজলিসে এই সূরা সম্পর্কে বলতে হয় এবং আমি দেখি যে, এই সূরার নতুন নতুন অর্থ আমার হৃদয়ে নাযিল হচ্ছে। তখন আমি বুঝে যাই যে, ফেরেশতার তাফসীর শিখানোর অর্থ এটাই ছিল। আর তখন থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত এই সূরার নতুন নতুন অর্থ আমাকে শিখানো হচ্ছে। যার মধ্য হতে অসংখ্য কথা আমি আমার বিভিন্ন পুস্তকাদি ও বক্তৃতায় উপস্থাপন করেছি। তথাপি এই ভান্ডার খালি হয়নি। "যালিকা ফাযলুল্লাহে ইউ'তিহি মাইয়্যাশা"। এই ছিল সূরা ফাতিহার বিভিন্ন ফযিলতের মধ্যে একটি ফযীলত যা পাঠক সমীপে সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে এ রকম অসংখ্য ফযীলত রয়েছে যা বর্ণনা করে শেষ করা সম্ভব নয়, যেভাবে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন যে, অসংখ্য কথা ব্যক্ত করার পরও যাঁর ভান্ডার শূণ্য হয়নি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সেই সমস্ত কল্যাণ দান করুন যা সূরা ফাতিহায় রয়েছে।

(তফসীরে কবীরের আলোকে বর্ণিত হয়েছে)

ঈদগাহে যাতায়াতের সময় নিম্নলিখিত তকবীর পাঠ করা উচিত-

"আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর ওয়া লিল্লাহিল হামদ।"

অর্থ: আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র।

এ তকবীর ঈদুল ফিতরের নামাযের পর ইমাম ও মুক্তাদীগণ কমপক্ষে তিনবার উচ্চঃস্বরে পাঠ করবেন।

ঈদগাহে আসা-যাওয়ার পথে নবী করীম (সা.) এবং তাঁর সাহাবাগণ (রা.)-ও এ তকবীর বেশি বেশি পড়তেন।

ঈদের দিনে মেসওয়াক করা, গোসল করা, আতর বা অন্য সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করা, নতুন বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করা এবং উত্তম খাদ্য গ্রহণ করা সুন্নত।

ঈদুল ফিতরের নামাযের পূর্বে কিছু খেয়ে মসজিদে যাওয়া আর কুরবানীর ঈদের নামাযের পর নামায থেকে এসে কিছু খাওয়া সুন্নত।

পবিত্র এ রমযানে মুছে যাক সমস্ত পাপ

মৌ. মোজাফ্‌ফর আহমদ রাজু

"হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের জন্য সেভাবে রোযা রাখা বিধিবদ্ধ করা হলো, যেভাবে তোমাদের পূববর্তীদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার"। (সূরা বাকারা ঃ ১৮৪)

পবিত্র কুরআন হতে জানা যায় মানব–সৃষ্টির অথবা নবী-রসূলদের আগমনকাল হতে সকল জাতি-গোষ্ঠীর জন্য রমযানের ব্যবস্থা জারি ছিল তা ভিন্ন নামে ভিন্ন ব্যবস্থায়। যে নামে বা ব্যবস্থায় জারি থাকুক না কেন উদ্দেশ্য এক-অভিন্ন ছিল আর তা হল তাক্‌ওয়া, তাহারাত, আল্লাহ্‌র সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদি। কুরআন শরীফ রমযান মাসকে এক মহান মাস বলে উল্লেখ করেছে, আর রমযান মাসেই কুরআন শরীফ অবতীর্ণ হওয়া আরম্ভ হয়, যে কারণে এ মাসের মাহাত্ম্য অতি মর্যাদাপূর্ণ মাস, অতিব গুরুত্বপূর্ণ মাস। হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ তা'লা সকল মানবের মধ্যে সেই গুণাগুণ সন্নিবেশিত করেছেন যে, আল্লাহ্ ও মানব কখনও আলাদা থাকবে না বা হতে পারে না; মানুষের সাথে আল্লাহ্ তা'লার সুগভীর সম্পর্ক বা কথোপোকথন থাকবে ও চলবে তা বিভিন্ন ভাবে ও রংয়ে। পবিত্র কুরআন এক অতীব মর্যাদাপূর্ণ কিতাব, এক পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত বা মানবজাতির জন্য পরিপূর্ণ জীবন বিধান, শিক্ষা ব্যবস্থা। কুরআন শরীফ আল্লাহ্ তা'লার সরাসরি জীবন্ত বাণী আর অতিব স্বচ্ছ ও মাকামের দিক থেকে অতুলনীয়। কুরআন শরীফই একমাত্র কিতাব যা নিজে আল্লাহ্ তা'লার পরিপূর্ণ কিতাব তা নিজ থেকে দাবি করেছো যে সম্পর্কে অসংখ্য আয়াতের উল্লেখ আছে। কুরআনের দাবি এই যে, মানবজাতির জন্য হেদায়াত স্বরূপ এই কিতাব যা সমস্ত কিছুর জন্য পথ নির্দেশ প্রদান করবে।

এই মহান বাণী যে মাসে অবতীর্ণ হয়েছে সে মাসের নাম রমযান মাস। রমযান মাসে রোযাব্রত পালন করার কারণে মানুষ সিদ্ধ হয়, পবিত্র হয়, তার সমস্ত পাপ-পংকিল ধুয়ে-মুছে যায়, যত রিপু আছে তা সবই দমিত হয়, এভাবে আস্তে আস্তে মানুষ উর্ধলোকে আগাতে থাকে, এক পর্যায়ে মানুষের মধ্যে সত্য স্বপ্ন দর্শন যা জামাত ও জাতির জন্য এবং মহাপুরুষের সত্যতার পক্ষে তাকে আদর্শবান মানুষ আখ্যা দেয়া হয়, সে কাশ্‌ফ লাভ করে, ইলহাম পর্যন্ত লাভ হতে পারে আর এমন হলে সে বা তারা অতিব বিনয়ী মানুষে পরিণত হয়। আল্লাহ্ তা'লার তরফ হতে নবী বা রসূলের মাধ্যমে যে সমস্ত আদেশ-নিষেধ এসে থাকে তা প্রতিপালনের মাধ্যমে যেমন তাঁর নির্দেশ পালন হয়, তেমনি মানবকে তাঁর পক্ষ থেকে-পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়। রমযান মাসে আমাদের প্রিয় নবী (সা.) কোমর বেঁধে ইবাদতে লেগে যেতেন।

রমযান মাসে সারা বছরের ইবাদতের দুর্বলতাগুলো দূরীভূত হয় এবং তা পূর্ণতায় পৌঁছার সকল ধরনের ব্যবস্থা তার হস্তগত করা হয়। রমযান মাসের অতীব জরুরী যে ব্যাপার প্রত্যেক মু'মিন মুসলমানের জন্য তা হল, পূর্বেই রমযানের নিয়ত করা ও এ মাসে আল্লাহ্ তা'লার তরফ হতে যত ধরনের ঐশী ব্যবস্থা রাখা আছে তা যেন প্রত্যেকের হস্তগত হয়। মহানবী (সা.) বলেন, পিপাসার্ত ও ক্ষুধার্ত থাকাই রোযার উদ্দেম্য নয়। রমযান মাসে রোযা রাখার কারণে তার কাজ কর্ম সীমার মধ্যে

আসতে হবে; তার কথা-বার্তা, চাল-চলন, আচার-আচরণ সব কিছুর মধ্যে এক ধরনের পরিবর্তন আসবে এটাই আমরা মহানবী (সা.) এর রমযান মাসের সীরাত পাঠে জানতে পারি। রমযান মাস আসলো আর একজন মু'মিন তার ইবাদতের সকল দুর্বলতাগুলো দূরীভূত করতে পারলো না তাহলে তার রোযা রাখার মাধ্যমে কিইবা লাভ হল। রমযান আমাদেরকে এ দুনিয়াতে জান্নাতের সুবাতাস এনে দিতে আসে বা জান্নাত লাভের সুযোগ করে দেয়।

মনে রাখতে হবে ১৮ বছরের সুস্থ্য-সবল সকল নর-নারীর জন্য আল্লাহ্ তা'লা রোযাকে ফরয করেছেন। বিনা ব্যতিক্রমে রোযা রাখতে হবে। (ফেকাহ্) পিড়ীত ও রুগ্ন হলে পরবর্তীতে গণনা পুরো করতে হবে। যদি তা সাধ্যাতীত হয় তাহলে এক মিসকিনকে আহার্য্য দেয়া সমপরিমাণ ফিদিয়া আদায় করে দিলে হবে (বাকারা)। রোযা রাখা অবস্থায় দিনে ভুলে কিছু খেলে রোযা ভঙ্গ হয় না বরং রোযা পুরা করা জরুরী (হাদীস)। একজন রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্ তা'লার নিকট কস্তুরীর সুগন্ধের চেয়ে বেশী (হাদীস)।

রমযান মাসে প্রত্যেক মু'মিন-মুত্তাকীর জন্য একটি পরিকল্পনা থাকা অতিব জরুরী আর তা হল, এ বছরের রমযান মাসে আমার এই এই পরিকল্পনা থাকা অতীব জরুরী। আর তাহলো এ বছরের রমযান মাসে আমার এই এই পরিকল্পনা থাকবে, আর বাস্তবায়ন ও করবো। রমযান মাসে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে ইবাদত বন্দেগী বেশি বেশি কবুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এ যুগের ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ এর জামাতের সদস্য/সদস্যা হিসাবে প্রত্যেক আহমদীর জন্য রমযান মাস ধর্ম, বর্ণ ও জাতির দায়িত্বের ক্ষেত্রে অনেক কিছু দায়বদ্ধতা আমাদের স্কন্ধে রয়েছে যা রমযান মাসে অনেক সুযোগ হস্তগত হয়। হাদীস পাঠে জানা যায় রোযাদার অর্ধেক ও ধৈর্যের অর্ধেকে মিলে মানবজীবন পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে। মহানবী (সা.) বলেছেন, রমযানকে আল্লাহ্ তা'লা তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন যথাঃ রহমতের, মাগফেরাতের ও নাযাতের। মানবজাতি আল্লাহ্ তা'লার কোন আদেশ নিষেধ তাদের জীবনে বাস্তব রূপ দেয়ার শক্তি বা সামর্থ রাখে না।

হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'লার রহমানিয়াতের গুণে তা বাস্তবায়িত হতে পারে, নবী-রসূলদের জীবন থেকে আমরা অবগত হতে পারি যে, আল্লাহ্ তা'লার রমানিয়াতের কল্যাণে তা সম্ভব। পবিত্র কুরআন শরীফ অধ্যয়ণ করলে অসংখ্য এমন ঈমান বর্ধক ঘটনা জানা যায় যা খোদার রহমানিয়তের সাথে সম্পর্কযুক্ত। মহানবী (সা.) এর জীবনে অগণিত ঘটনার মধ্যে বদরের যুদ্ধে বিজয় যা ছিল, খোদা তা'লার রহমানিয়াতের গুণের বহি:প্রকাশ আর খোদা তা'লার তৌহিদ জিন্দা ও স্থায়ীভাবে কায়েম হয়েছে। হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর জীবনে অসংখ্য ঘটনার মধ্যে অগ্নি থেকে রক্ষা পাওয়া তা ছিল খোদা তা'লার রহমানিয়তের গুণে। হযরত আদম (আ.) আল্লাহ্ তা'লার দরবার হতে ক্ষমা লাভ তাও খোদা তা'লার রহমানিয়তের গুণে সম্ভব হয়েছে। হযরত নূহ্ (আ.) ও তার সাথীরা বন্যার ভয়াবহতা হতে রক্ষা পাওয়া তো খোদা তা'লার রহমানিয়তের গুণেই সম্ভব হয়েছে। হযরত মূসা (আ.) কে ফেরাউনের কবল হতে রক্ষা করে তার সাথি সঙ্গীসহ নদী পার তা তো খোদা তা'লার রহমানিয়তের গুণেই ঘটেছিল। হযরত ঈসা (আ.) কে রোমান সম্রাটের কবল হতে রক্ষা ও হিজরত তাও খোদা তা'লার রহমানিয়তের কল্যাণেই হয়েছিল।

হযরত যাকারিয়া (আ.)কে তাঁর বন্ধ্যা স্ত্রীর মাধ্যমে পুত্র-সন্তান ইয়াহিয়াকে দান তা ছিল খোদা তা'লার রহমানিয়াতের ফুৎকার। সহস্র ঘটনাবলী কুরআনের উল্লিখিত আছে যার সঙ্গে আল্লাহ্ তা'লার রহমত যুক্ত। নবী শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ (সা.) জানতেন যে, মানবের জন্য আল্লাহ্ তা'লার কোন্ কোন্ গুণাগুণ অতীব জরুরী। যার ফলে তিনি (সা.) রহমতের দশকের কথা যুক্ত করেছেন। তিনি (সা.) মাগফেরাতের দশকের কথা উল্লেখ করে বলেছেন ঐদিনগুলোতে অনেক বেশি বেশি আল্লাহ্ তা'লার দরবারে মাগফেরাত বা ক্ষমা, ইস্তেগফার করা জরুরী। মনে রাখতে হবে, সব কিছুই আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছায় হয়ে থাকে, তাই মাগফিরাতের উত্তম পন্থা হল, একজন মু'মিনকে ভাবতে হবে আল্লাহ্ তা'লা কোন্ কোন্ কারণে বা কোন্ পথে বিচরণ করলে তাঁর কাছে ক্ষমা লাভ হবে। প্রথমত মানব জাতি জানে না, আল্লাহ্ তা'লার রাস্তা কোনটি বা কিভাবে আল্লাহ্কে খুশি করা যায়, তাই আল্লাহ্র পক্ষ হতে নবী-রসূলগণ আগমন করেন, তাঁরা এসে আল্লাহ্কে লাভ করার পর সকল গুণ পাবার নিমিত্তেই মানবজাতিকে সেই মহান সংবাদ দান করে থাকেন।

রমযানের কোন এক দশকে মাগফেরাতের কথা আল্লাহ্র রসূল (সা.)– আল্লাহ্ কর্তৃক জানতেন বিধায় তা তিনি (স.) আমাদের জানিয়েছেন, এ কারণে এর গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলাম ধর্মে এমন অনেক বিধি-বিধান, নিয়ম-কানুন জানতে পারি যে, আল্লাহ্ তা'লার গুণা-গুণ কার্যকরি হতে কোন দিন বা সময় ও ক্ষণের মুখাপেক্ষী নয়, কিন্তু তাঁর সৃষ্টির মধ্যে মানবের জন্য কর্ম ও যোগ্যতার ক্ষেত্রে সময়, দিন, ক্ষণ অতীব জরুরী বিষয়। রমযান মাসের মাঝের দশকের প্রতিটি মূহূর্ত আমাদের মাঝখান দিয়ে পার হয়ে যায় যা আল্লাহ্ তা'লা চান বান্দা আমার কাছে প্রার্থনা করুক আমি কবুল করবো, আমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করুক আমি ক্ষমা প্রদান করবো, তাই এ সুযোগ কাজে লাগানো প্রত্যেকটি মু'মিনের অতি জরুরী।

শেষ দশক নাজাতের দশক, নাজাত বা মুক্তি সম্পর্কে হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) বলেছেন, নাজাত কি জিনিস? নাজাত হল আল্লাহ্ তা'লার ওপর পরিপূর্ণ ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা নিজ জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে। যাকে সৃষ্টি না করলে দুনিয়া সৃষ্টি হত না অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) তাঁকে আল্লাহ্ তা'লা চিরকালের জন্য জিন্দা রেখেছেন। তাঁর (সা.) এর আনিত শরীয়তকে চিরকাল চলমান ও জিন্দা আখ্যা দিয়ে স্থায়ী করেছেন। কুরআন শরীফে বা তাঁর শিক্ষা-ব্যবস্থাকে মানবজাতির মধ্যে বাস্তব রূপ দেয়ার জন্য

এই উম্মতে ওয়াহেদার সৃষ্টি করা হয়েছে। উক্ত বাণী সারা জগতে যাতে পরিপূর্ণভাবে বিস্তার লাভ হয় তার অদম্য বেদনা মানব হৃদয়ে তৈরী হওয়া জরুরী। আর তা-হলেই নিজ জীবনে ও পৃথিবীর মানুষ নাজাত বা মুক্তির জন্য আলোক রশ্মির সন্ধান লাভ করবে বা হবে। রমযান মাসে নাযাতের জন্য প্রতিটি পদক্ষেপে মহানবী (সা.) এর জীবন আদর্শকে সামনে রাখতে হবে, তাহলেই সকল ক্ষেত্রে নাজাতের চির সূর্য উদিত হবে।

রমযান হল সেই মাস, যে মাসে কুরআন শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে অর্থাৎ এ মাসেই মুক্তির সকল চিহ্নাবলী হস্তগত হবে, আল্লাহ্ করুন, আমাদের জন্য রমযান শিক্ষক হয়ে আসে, পূর্ণতা দান করতে আসে, যত ঈমানের কমতি তা দেখিয়ে দিয়ে দূরীভূত করতে আসে, ইবাদত, ইয়াদত, ইকামত, ইল্‌ম ইত্যাদি বিষয়ে পরিপূর্ণ করতে এসে থাকে। রমযান মাসে কুরআনের সঙ্গে সুগভীর সম্পর্ক তৈরি করা যার ফলে কমপক্ষে অর্থসহ একবার নাযেরা খতম করা জরুরী। সিহহ্ সিত্তার বাংলা তরজমা বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, পারলে সংগ্রহ করে পাঠের চেষ্টা করা উত্তম কাজ।

রমযান মাসে যুগ ইমাম ইমামুজ্জামান হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর পুস্তক যতগুলো সম্ভব পাঠ করা। হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল মুসলেহুল মাওউদ (রা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি যতক্ষণ হযরত (আ.) এর পুস্তক পাঠ করবে সেই ব্যক্তির ওপর ততক্ষণ আল্লাহ্ তা'লার ফিরিশতারা অবতীর্ণ হতে থাকবে" (ইরফানে ইলাহি)। প্রত্যেকটি মু'মিন আহমদী মুসলমান আল্লাহ্ তা'লার দরবারে যদি প্রমাণ করাতে চায় যে, 'হে খোদা আমরা তোমার মাহদী (আ.)কে মেনেছি বা তাঁর হাতে তোমার আদেশে বয়াত করেছি, তুমি আমাদেরকে তোমার রসূল (সা.) এর সুপারিশের জন্য কবুল কর, আর তোমার প্রিয় বান্দাদের মধ্য শামিল কর। তাহলে হযরত (আ.) এর কিতাব পাঠ করুন আর আল্লাহ্'র কাছে দোয়া করুন। এমটিএ-তে পরিবারের সকলে সৈয়্যদেনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) এর জুমুআর খুতবাগুলো শ্রবণ করা ও বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করা। পূর্বেই উল্লেখ করেছি রমযান মাস ইবাদতের মাস। মহানবী (সা.) এর সীরাত হতে জানা যায় রমযান মাসে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ইবাদত করার দিকে ইঙ্গিত। হাদীস পাঠে জানা যায় মহানবী (সা.) প্রায়শ: সারারাত জেগে ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে পার করতেন। রমযান মাসে তারাবীর নামাযের ব্যবস্থা থাকে এরপরেও শেষ রাতে তাহাজ্জুদ আদায় করা অতিব নৈকট্যের কারণ। রাতের বিভিন্ন সময় কুরআন তেলাওয়াত করা, নফল নামায আদায় করা, হাদীস শরীফ পাঠ করা, হযরত মসীহ্ ও মাহ্‌দী (আ.) এর কিতাব পাঠ করা, খলীফায়ে ওয়াক্তের লেখা ও খুতবা পাঠ করা দোয়া দরূদ, তসবীহ্, তাহলীল, তাহমীদ ইত্যাদির মাধ্যমে রমযানের রাতগুলো পার করার নাম। এসবই নবী-রসূলদের সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত।

হাদীস হতে জানা যায় যে, রমযান মাসে মহানবী (সা.) ঝড়-তুফানের ন্যায় দান-খয়রাত করতেন এবং সম্পদ বিলাতেন। আল্লাহ্ তা'লার দরবারে আমারা শত-সহস্র শুকরিয়া জানাই যে, এযুগে তিনি আমাদেরকে যুগ ইমামকে মান্য করে কুরআনের এই মহান আদেশকে পালন করার তৌফিক দিয়েছেন। কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী আমরা সম্পদের কুরবানী করে থাকি। আহমদীরা বায়তুল মালে খলীফার ফান্ডে অর্থ-সম্পদ জমা দিয়ে থাকে, সে অর্থ-সম্পদ শুরা-পরামর্শের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে ইসলাম বিস্তারের কাজে ব্যয় করা হয়ে থাকে। রমযান মাসে তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা, ওসীয়্যত, মসজিদ-নির্মাণ ফান্ড, সৈয়্যদেনা বেলাল ফান্ড, প্রকাশনা ফান্ড, মরিয়ম শাদি ফান্ড ইত্যাদি খাতে বেশি বেশি চাঁদা প্রদান করা উচিত। এ মাসে রোযাদারকে ইফতারী করানো বড় পুণ্যের কাজ।

এ মাসে প্রতিবেশীর হক আদায়ের জন্য যত্নবান হওয়া, আত্মীয়-স্বজনদের খেয়াল করা, অসহায়দের খোজ-খবর রমযান মাসের বাগিচারই অংশ। তবলীগের ময়দানে সারা বছর যে সমস্ত মেহমানদের সঙ্গে তবলীগি আলোচনা করা হয়, তাদেরকে ইফতারীতে ডাকা ও দোয়া করা। আল্লাহ্ তা'লা করুন এ রমযান মাস আমাদের জন্য শান্তি-নিরাপত্তা ও আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যের কারণ হোক। সারা পৃথিবী থেকে যুদ্ধ-বিগ্রহ দূরীভূত হয়ে যেন আল্লাহ্‌র শান্তির আশ্রয় স্থান লাভ করতে পারে, এ পবিত্র মাসে এ কামনাই করি।

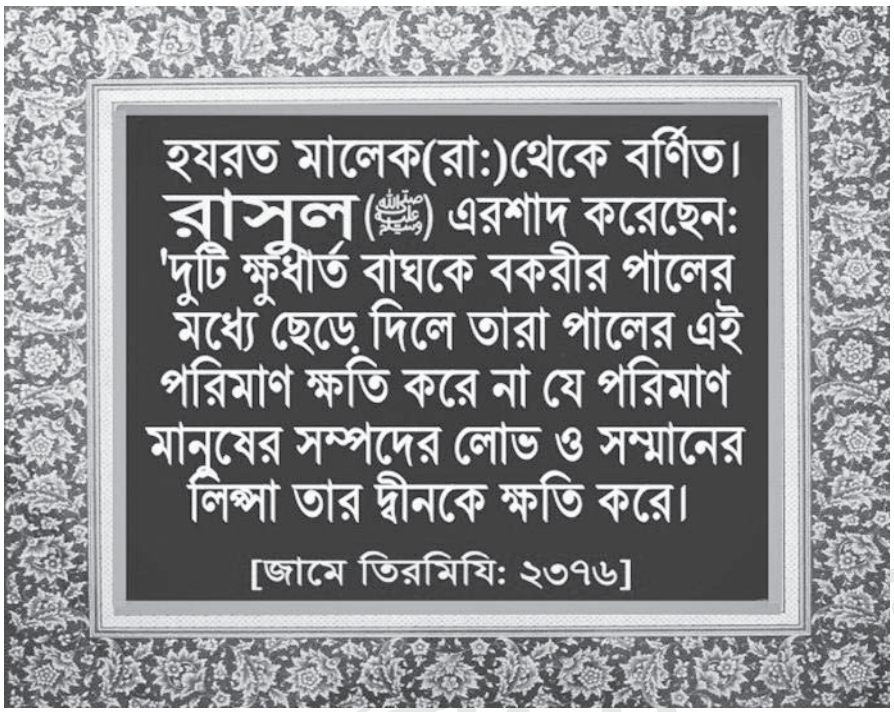

এ কেমন ঈদ?

মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী (কৃষিবিদ)

ঈদ অর্থাৎ আনন্দ বা খুশী তথা ঔদার্য অন্তরে মুসলিমগণের আনন্দানুষ্ঠান। জাগতিক সফলতার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। আমাদের এই ঈদ দু'টি'। একটি হল চান্দ্র বৎসরের শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখে আর অন্যটি হল যিলহজ্জ মাসের দশম তারিখে। মুসলিম অধ্যুষিত প্রত্যেক দেশের মানুষ পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে ঐশ্বর্যপূর্ণ মর্যাদায় এই ঈদ উদযাপন করে থাকে। এরকম আনন্দ করার পিছনে একটিই কারণ তা হল, আমরা মহান আল্লাহ্‌র তরফ হতে বিগত দিনে যা করতে নির্দেশিত হয়েছিলাম তা অত্যন্ত নিষ্ঠা, সততা ও খোদাভীরুতার সাথে বাস্তবায়ন করতে সমর্থ হয়েছি। অতএব এ কারণেই আজ আমাদের এই ঈদ, এই আনন্দ। যদি খোদার চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয় যে, হ্যাঁ, সত্যিই আমরা আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পালন করেছি তবে উচ্ছ্বসিত আনন্দের সাথে ঈদ উদযাপন যথার্থ হচ্ছে বলেই মনে করব। পক্ষান্তরে এমন পুণ্যতার আদর্শে আমরা আমাদের ওপর ন্যাস্তকৃত দায়িত্ব পালন করছি কী? মূলত, এ প্রশ্নের উত্তর "না" বলেই প্রতীয়মান হয়। অথচ আমরা অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে ঈদ উদযাপন করছি। তাহলে কথা এই দাঁড়াল যে, আমরা ঈদ উদযাপন করছি ঠিকই কিন্তু দায়িত্ব পালন করছি না। সুতরাং এটি নিছক প্রহসন বৈ আর কিছুই নয়, প্রকারান্তরে আমরা খোদা তা'লাকে অবজ্ঞা করছি, অবহেলা করছি এবং তাঁকে উপেক্ষা ও ফাঁকি দিয়ে চলছি। সুতরাং, তা হচ্ছে মিথ্যা প্রবঞ্চনা সর্বস্ব ঈদ। মূলত এতে আধ্যাত্মিক জগতের কল্যাণ নেই। তাহলে এই ঈদ জাগতিক রং-ঢং বৈ আর কিছুই নয়।

মুসলিম জগতের অবস্থার চিত্র দর্শন করলে অত্যন্ত পরিতাপের সাথে বলতে হয় যে, আজ মুসলিম জগত যে ঈদ পালন করছে তা প্রহসনই বটে। নির্দ্বিধায় এক মুসলমান আরেক মুসলমানের প্রাণ হনন করছে। এক মুসলিম অন্য মুসলিম দেশের সুখ, শান্তি, নিরাপত্তা ও সহায়-সম্বল সর্বৈব ধ্বংস করছে, গ্রাস করছে। অত্যন্ত নৃশংস ভাবে একে অন্যকে সংহার করছে। মুসলমান ভাইয়ের নির্দয় আক্রমণের আঘাতে মরে যাওয়ার ভয়ে দুগ্ধ পোষ্য শিশুকে কোলে নিয়ে মেয়েদের কেউ কেউ স্বদেশ ভূমি ছেড়ে সাগড় পাড়ি দিয়ে বিদেশে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। নিরাপদ আশ্রয় সন্ধান করে মা দুধের শিশুটিকে নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে দুধ খাওয়ানোর সময় মায়ের কোল থেকে তার স্নেহের সন্তানকে ছিনিয়ে নিয়ে মাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করার মত নির্দয় কর্ম সাধন করছে। নিত্যদিন মাস ও বছর ব্যাপী মুসলমান পরস্পর এহন মমত্বহীন কাজ অবিরাম করছে। স্বাধীনভাবে, নিভৃতে স্বীয় ধর্ম পালন করার কাজে বাধা প্রদান করছে। এমনকি অতঃপর তাকে গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে। অথচ সেই ঘাতকের বিচার হচ্ছে না। প্রখ্যাত ঘাতক নামধারণ করতঃ তার শক্তি প্রকাশ করার নিমিত্তে গোপনে মানুষ ধরে এনে গুম করা হচ্ছে। "আল্লাহু আকবার" ধ্বনী উচ্চারণ করে তাদেরকে খুন করা হচ্ছে। কারোর আবার শিরোচ্ছেদ করা হচ্ছে। আত্মঘাতি বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিরীহ শান্তিকামী শত শত মানুষকে পাখির ন্যায় মেরে ফেলা হচ্ছে। দেশের সর্বত্র এ ধরনের জঘন্য ঘটনা নির্বিচারে অবিরত ঘটেই চলেছে। ফলে সেখানে রক্তের বন্যা প্রবাহিত হচ্ছে। প্রত্যেকটি মুসলিম দেশের শান্তিপ্রিয় মানুষ আজ আতংকগ্রস্থ, ভয়ে সন্ত্রস্থ। সুতরাং এমন দুর্বিপাকে নিপতিত মানুষদের আবার ঈদ কিসের? যেখানে মানুষের জীবনেরই নিরাপত্তা নেই। শিশুদের মাকে মেরে ফেলা হচ্ছে, ছেলেকে স্কুলে পাঠিয়ে মা যেখানে শঙ্কাগ্রস্থ আদৌ তার ছেলে তার কোলে ফিরে আসবে কী আসবে না এমন দুর্দশা ঘেরা মানুষদের কী-ই-বা ঈদ আছে?

তারা কী ঈদ করার আশা করে? শঙ্কাই যাদের নিত্য সাথী, কান্নাই যাদের সারাক্ষণের কাজ তাদের আবার ঈদ কিসের? তাদের কী বলা যাবে, আজ তোমাদের ঈদ। তোমরা আজ ঈদের নামায পড়। নূতন জামা পরিধান কর, সেমাই-শিন্নি খাও। আর প্রাণখোলাচিত্তে, আনন্দোল্লাস কর। তাদেরকে এমনটি বলা কী যথার্থ কাজ হবে? নাকি তাদের কান্না থামানোই হবে অন্যদের কাজ। ঘরে-ঘরে, দেশে-দেশে, সমাজে-সমাজে এবং প্রতিটি পরিবারে আজ এমনি অশান্তির চিত্র বিরাজমান। শোক, মাতম আর মৃত্যুর ভয়ংকর ভয়। কবি গুরু বলেছেন, "ধূলা করিতে দূর ধূলায় হলো ভরপুর।" আমাকেও আজ একই সুরে বলতে হচ্ছে, "ধরার অশান্তি করিতে দূর, ধরা হলো অশান্তিতে ভরপুর"। নানান কায়দায়, উন্নত প্রযুক্তির মারণাস্ত্র ব্যবহার, বৃদ্ধি-সমৃদ্ধি প্রযুক্তি খাঁটিয়ে মহাবিক্রম আক্রমণ করে মানুষ আজ মানুষকে বেদম মারছে। ফলে পৃথিবী দাউ দাউ করে জ্বলছে আর এর বাসিন্দারা হাউ-মাউ করে কাঁদছে। এ বীভৎস পরিস্থিতিকে কে সামলাবে? ক্রন্দনরতদের কে সান্ত্বনা দিবে? কে এসবের অবসান ঘটাবে? কীভাবে উপর্যুপরি সংগঠিত হত্যাযজ্ঞ বন্ধ হবে? প্রজ্জ্বলিত অনল-দাহের ধ্বংস স্তুপে কে ঈদের আনন্দ বহাবে? দেশের মোল্লা-মৌলবীগণ? গদ্দীনশীন পীর মাশায়েখ পুরোহিতগণ? নাকি মাজার পূজারিগণ? নাকি রাজনৈতিক নেতা কিংবা ধর্ম ফির্কার দলনেতাগণ? কারোর পক্ষেই এই পরিস্থিতির অবসান ঘটানো সম্ভব নয়। তারা পারেনি, পারবেও না। কারণ তাদের মধ্যেই শান্তি নেই। তারাই অশান্তি সৃষ্টির মূল। একতা নেই, একক নেতৃত্ব নেই। নেই ঈমান আমলের উৎকর্ষতা ও ঐশী সম্পর্ক। একের ওপর অন্যের বিশ্বাস নেই। উপরন্তু আছে ফতওয়াবাজী আর বিবৃতির মাধ্যমে একে অন্যকে অমুসলমান বানানোর প্রবণতা ও অবমাননা করার প্রবৃত্তি। একে অন্যের কুৎসা রটনার অবিরাম চেষ্টা। ধর্মের মূলকে ছেড়ে ভুলকে ধরে এর সৌন্দর্যকে বেমালুম বিনষ্ট করছে। অন্য ধর্মাবলম্বীরা ইসলামের এহেন বিশ্রীরূপ দেখে এর প্রতি অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে আছে। তারা ইসলাম সম্পর্কে জঘন্য কটুক্তি করছে। ইসলামের কাছে আসতে ভয় পাচ্ছে। হযরত মূসা (আ.), হযরত ঈসা (আ.), হযরত শ্রীকৃষ্ণ (আ.) প্রভৃতি নবীগণকে আঁ হযরত (সা.) এর চেয়ে অধিক মর্যাদাবান নবী মনে করে তাঁর (সা.) শান ও মানকে ম্লান করছে। ইসলামের এই দুর্দশার জন্য একমাত্র দায়ী ইসলামের নামধারী সেবকগণ। খোদা তা'লার সাথে তো তাদের সম্পর্ক নেই-ই বরং তারা নিজেদেরকে নায়েবে রসূল বানিয়ে বসে আছে।

খোদা তা'লা যাঁকে এই যুগে ইসলামের একচ্ছত্র নেতা মনোনীত করেছেন, যাঁর হাতে খোদা তাঁর পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআনকে অর্পণ করে বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তকে তার জলদগম্ভীর ধ্বনীতে প্রকম্পিত করার দায়িত্ব দিয়েছেন। যাঁর স্কন্ধে খোদা বিশ্বের তাবত মানুষ সমন্বয়ে ঈদ উদযাপন করার পরিকল্পনা ন্যাস্ত করেছেন তাঁকে কিনা সেই নির্বোধ দুরাচারের দল বরাবরই উপেক্ষা করছে। তাঁর কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে জোর শক্তিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। তাঁর জামাতভুক্ত সদস্যদের প্রাণ হনন করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। তাদের অনুষ্ঠানাদির স্থানে অগ্নিসংযোগ করছে। তাদের মসজিদ, স্থাপনাসমূহ, ঘর-বাড়ী ও বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত পবিত্র কুরআন শরীফকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করছে। আদৌ এসব কী খোদার প্রিয় কোন মানুষের কাজ? মু'মিন স্বীকৃত কোন আত্মার কাজ? সাধু সজ্জনের কাজ? এসব নিছকই ধর্মহীন দুর্বৃত্তের কাজ। শয়তান স্বভাব বিশিষ্ট লোকের কাজ। তাদের প্রচেষ্টার দ্বারা কী বিশ্ব মানবগোষ্ঠির সমন্বয়ে ঈদ উদযাপনের ব্যবস্থা করার কথা কল্পনা করা যায়? তাদের ওপর কি ভরসা করা যায়? কক্ষণও নয়। কেননা তাদের অনুসরণীয় পথই ভ্রান্ত। তাদের সাথে খোদার কোন সম্পর্ক নেই। খোদার সাথে সম্পর্কযুক্ত, অনুগ্রহ ও অনুকম্পা সিক্ত ব্যক্তি ব্যতীত বিশ্ববাসীর সমন্বয়ে একই ইমাম ও একই ঈদগাহে ঈদ উদযাপন করার মত মস্ত বড় এই কাজ সম্পাদন করা কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়। তবে মহিমান্বিত খোদার পরিকল্পনা অতিব সুন্দর, অভাবনীয় চমৎকার। মানুষের যখন যা প্রয়োজন তিনি তখনই তা করে থাকেন। তাঁর পরিকল্পনা অবিসংবাদিতভাবে মহান এবং কল্যাণকর। সেই শর্তেই মহামহিম খোদা তাঁর সাদরের সৃষ্টির প্রতি সদয় হয়ে তাদের প্রজ্জ্বলিত বহ্নিদাহ হতে রক্ষা কল্পে তাঁর তরফ হতে মহান এক ব্যক্তিকে মর্ত্য পৃষ্ঠে পাঠিয়েছেন। তিনি হলেন ইবনে মর্তুজা কাদিয়ান নিবাসী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)। তিনিই ইসলামের প্রতিশ্রুত ও সংস্কার। হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী মতে ইসলামে পুনঃ প্রাণ সঞ্চালক স্বর্গ প্রদত্ত মহান পুরুষ। বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী ঐশী প্রতিনিধি। অশান্তির অনলে দগ্ধ মানবগোষ্ঠিকে তথা হতে উদ্ধার করতঃ প্রশান্তির নীড়ে এনে একত্রিত করার ঋষিপুরুষ। তাঁর পরিচালিত জামাতের নাম আহমদীয়া মুসলিম জামাত।

তাঁরই একক নেতৃত্বে দিশেহারা, পথহারা মানুষের দল পুনরায় পুণ্য আহমদীয়াতের আঙ্গিনায় ফিরে আসবে, ইনশা'ল্লাহ্। সব ধর্মের সবাই এই সভায় এসে সমস্বরে বলবে, "হ্যাঁ, এটিই শান্তি, এটিই যে ইসলাম।" তখন যে ঈদ হবে তা-ই হবে প্রকৃত ঈদ। সেটাই হবে ঐশী জগত কর্তৃক স্বীকৃত ঈদ। শান্তি সমৃদ্ধ, প্রফুল্ল ও উল্লাস বিজড়িত ঈদ। বন্ধুগণ! আর বেশী দূরে নয়, এমনি চিত্রের ঈদ দর্শনের জন্য আপনাদের আর মাত্র দুইশত বৎসর অপেক্ষা করতে হবে। আমি শতভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি যে, পৃথিবীতে সেই ঈদ অবশ্যই উৎযাপিত হবে। আকাশের ফেরেশ্‌তাগণ তার প্রস্তুতিমূলক কাজ করছে, সুতরাং বৈরীতা বাদ দিয়ে সেই কাজে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসুন। বরং সেটিই হবে পুণ্যের কাজ।

হে আমাদের প্রিয় খোদা! তুমি তোমার দলভুক্ত আহমদীদেরকে অনুরূপ ঈদ পালনের তৌফিক দান কর। প্রকৃতপক্ষে ত্যাগ, তিতীক্ষা ও যাবতীয় বিষয় কুরবানী করার পরেই ঈদ আসে। আর আহমদীরা সেই কুরবানীই করে যাচ্ছি। আমরা একদিন না একদিন অনুরূপ ঈদ পালন করবই, ইনশা'ল্লাহ।

আমাদের প্রিয় রসূল (সা.) ঈদের দিনে তাকবীর পাঠ করতেন, 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ।'

মহান স্রষ্টাকে লাভ করাই আসল ঈদ

মৌ. এনামুল হক রনি

ঈদ মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান। বৎসরের পরিক্রমায় দু'টি ঈদ মুসলমানদের ঘরে ঘরে আনন্দের বন্যা নিয়ে আসে। একটি আসে একমাস রোযা পালনের মাধ্যমে আর অপরটি (নিজ কু-প্রবৃত্তিরূপ) পশু কুরবানীর মাধ্যমে। তাই ঈদ অর্থ আনন্দ, খুশি আর ঈদ অর্থ এই আনন্দ আর খুশির বন্যা সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়া।

মনে পড়ে যায় জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের ঐ গানটির কথা : 'ও মন রমযানের এই রোযার শেষে এলো খুশির ঈদ, আপনাকে আজ বিলিয়ে দিতে আসমানী তাগীদ।' আসমানের তাগীদ তো তাদের জন্য যারা রোযার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছে। দীর্ঘ একমাস রোযা সাধন করেছে প্রকৃত আনন্দ আর খুশির জোয়ার আজ তাদের অন্তরে-বাহিরে।

মনে পড়ে ছোটবেলার পাঠের কথা, 'আজ ঈদ মদীনার ঘরে ঘরে আনন্দ পথে পথে ছেলেমেয়েদের কলরব। তাদের গায়ে নানা রঙের পোশাক। বাতাসে আতর-গোলাপের সুবাস.....। আহা' আ'..... সেই যেন ঈদের দিনের একটি পূর্ণ ছবি। ঈদের আনন্দ যেমন একজন রোযাদার মু'মিনের যে কিনা রোযা পালন করে নিষ্পাপ মাসুম শিশুর ন্যায় হয়ে গেছে। আর তাই শিশুদের সাথে মিশে গেছে ঈদের আনন্দ, খুশি হৈ চৈ নিয়ে।

মু'মিনগণ সবসময় সৌভাগ্যবান। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে, 'ওয়া লিমান খাফা মাকামা রাব্বিহি জান্নাতান' অর্থঃ যে ব্যক্তি তাঁর প্রভু-প্রতিপালকের সামনে দন্ডায়মান হতে ভয় পায় তার জন্য দু'টি জান্নাত রয়েছে। (সূরা আর রহমান)। এই যে, ভয় বা শ্রদ্ধাবোধ স্রষ্টার নির্দেশ পালনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। মু'মিন স্রষ্টার নির্দেশ পালন করে আর জান্নাতকে নিকটতর করে নেয়। হাদীস শরীফে নবী করীম (সা.) বলেছেন, '....রোযাদারের দু'টি আনন্দ প্রথমত: যখন সে ইফতার করে আর দ্বিতীয়ত: যখন (রোযা রাখার কারণে) সে স্রষ্টার সাথে মিলিত হবে।' (বুখারী শরীফ) যারা রোযা রাখে আর ইফতারের সময় খোদার দেয়া রিযিক সামনে নিয়ে এজন্য বসে থাকে যে, খোদার নির্দেশ পালন করবে অর্থাৎ সময় হলেই ইফতার করবে। একজন মু'মিনের এ অবস্থা যেন স্রষ্টার সান্নিধ্য পাওয়া অর্থাৎ জান্নাত লাভ। অপরদিকে রোযা রাখার কারণে স্রষ্টার সাথে পরকালে মিলিত হবে। এ উপলব্ধি কেবল একজন রোযাদারই উপলব্ধি করতে সক্ষম। আর এভাবে এক-একটি করে রোযা শেষ হয়ে আসে সেই চরম পাওয়া-'ঈদ' যার অর্থ খুশি ও আনন্দ। তখন সে স্রষ্টার সাথে মিলিত হয়ে যায় আনন্দের বন্যায়। আর তখনই কৃতজ্ঞতায় শোকরানার দু'রাকাত নামায পড়ে, তাকবীর পড়ে সাজ-গোজ করে ইত্যাদি।

মহানবী (সা.)-এর হাদীস থেকে ঈদের বিষয়ে বিভিন্ন রেওয়ায়াত পাওয়া যায়। তিনি (সা.) বলেছেন, 'তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ আর চাঁদ দেখে ইফতার (ঈদ) কর। (বুখারী শরীফ) এসব হাদিসে ইফতার বলতে ঈদ বুঝানো হয়েছে। যা কিনা একমাসের রোযা পালন শেষে আসে। তাই রোযা শেষে ঈদের এক ফালি বাঁকা চাঁদ মেঘের কোলে বা নারিকেল গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে দেখামাত্র ঈদ শুরু হয়ে যায়।

শিশু, কিশোরগণ পাড়া মহল্লায় হৈহৈ কলরবে মাতিয়ে তোলে আর আনন্দ প্রকাশের নানারূপ শোভা-সাজ শুরু হয়ে যায়। আমাদের প্রিয় রসূল (সা.) আমাদের ঈদের জন্য একটি তাকবীর শিখিয়েছেন

আর তা হলো, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ। অর্থঃ আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ মহান তাঁর কোন শরীক নাই। এবং আল্লাহ্ মহান আল্লাহ্ মহান আর সকল প্রশংসা তাঁরই। তিনি (সা.) এ তাকবীর পাঠ করতে করতে ঈদগাহে যেতেন। একপথে যেতেন অন্য পথে ফিরে আসতেন।

ঈদের দিনে রসূলে করীম (সা.) রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। ঈদের দিন গোসল করা পাক-সাফ হওয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বা সাধ্যানুযায়ী নতুন কাপড় পরা, সুগন্ধি লাগানো উচিত। একই ভাবে এসব কাজে অন্যকে সহযোগিতা করা যেন ঈদের খুশী ভাগ করে নেয়া যায়। ঈদের দিন বিশেষ করে ঈদুল ফিতরের দিন রসূল (সা.) মিষ্টি খেয়ে বা খেজুর মুখে দিয়ে ঈদগাহে যেতেন। আমরা 'মিষ্টি, সেমাই, জর্দা, পায়েস বা ফিরনী খেতে পারি। এরপর সাজ-গোজ করে আতর-গোলাপ, সুরমা, মেহেদী-লাগিয়ে স্রষ্টার সমীপে জানিয়ে দেয়া দু'রাকাত নামায এর মাধ্যমে, হে খোদা, তোমার বান্দা তোমার সমীপে হাজির। তোমার হাজার হাজার শোকর যে, পবিত্র রমযান পালন করার তৌফিক আমাদের দিয়েছিলে।

আর ঈদের নামাযে আযান ও একামত দেওয়া হয় না তবে দু'রাকাত নামাযে বাড়তি তাকবীর দেওয়া হয়। প্রথম রাকাতে ৭টি তাকবীর 'আল্লাহু আকবার' বলবে ইমাম সাহেব, মুসল্লিগণ তার অনুসরণ করবে দ্বিতীয় রাকাতে ৫ টি তাকবীর 'আল্লাহু আকবার' বলবে ইমাম সাহেব, মুসল্লিগণ তার অনুসরণ করবে। বাকী নামাযের সূরা, কলেমা তাসবীহ অপরিবর্তীত থাকবে। এভাবে দু'রাকাত নামায শেষ হয়ে গেলে খুতবা প্রদান করা হবে। রসূলে করীম (সা.) এভাবে নামায শেষ করে খুতবা প্রদান করতেন এবং তারপর মহিলাদের সামনে গিয়ে নসিহত করতেন। ঈদগাহে শিশু, বৃদ্ধ সকলকে হাজির হতে হয় এমনকি ঋতুবর্তী মহিলাদেরকে ঈদগাহে হাজির থাকার নির্দেশ রয়েছে। অবশ্য তাদের জন্য পৃথক জায়গাতে বসার ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে।

ঈদের দিন মহিলাদের দান গ্রহণ করার জন্য হযরত বেলাল (রা.) দান নিয়ে মহিলাদের কাতারের সামনে গিয়ে চাদর বিছিয়ে ধরেছেন সেখানে সদকা দান করা হয়েছে।

এছাড়া ঈদের নামাযের পূর্বে ফিতরানা প্রদান করা হয়ে থাকে। মনে রাখতে হবে সদ্যজাত শিশু ঈদের নামাযের পূর্বে ভূমিষ্ট হলে তার জন্যেও ফিতরানা দেওয়ার প্রয়োজন হবে। আর ঈদের দিন ইশায়াতে ইসলাম বা ইসলাম প্রচারের জন্য ঈদ ফান্ডে চাঁদা দান করা হয়। প্রত্যেককে ঈদ ফান্ডে চাঁদা দেওয়ার জন্য শরীক হওয়া উচিত। রসূলে করীম (সা.) এর যুগেও এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর যুগেও ঈদ ফান্ড আদায় করা হয়েছে। ঈদের আনন্দ করতে গিয়ে আমরা যেন ইসলাম প্রচার কাজকে ভুলে না যাই। তাই সাধ্যানুযায়ী ঈদ ফান্ডে শামিল হতে হয়। স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের জন্য ভালবাসার বহি:প্রকাশ হিসাবে ঈদের আনন্দ গরীবদের তোহ্‌ফা, সদকা, দানকরা বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়দের মাঝে বিতরণ করা হয়ে থাকে। ঈদশেষে কোলাকুলি ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের এক মহাসেতু বন্ধন রচনা করে। আত্মীয়-স্বজন নিজ পরিবার পরিজনের কবর যিয়ারত করে থাকে।

ঈদের খুশিতে স্থানীয়ভাবে নানা রকম খেলাধূলার আয়োজন করা যেতে পারে। আনন্দ দানের জন্য শারিরীক কসরত জাতীয় (সার্কাস) খেলা শিশুদের আনন্দ প্রদানে করা যেতে পারে। তবে কোন ক্রমেই অশ্লীলতা প্রকাশ পায় এমন কিছু যেন করা না হয়।

আমাদের প্রাণপ্রিয় হুযূর (আই.) ঈদ উপলক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেছেন, তিনি বলেন, 'আমরা রমযানের রোযা এজন্য রেখেছি যেন তাঁর নৈকট্য অর্জনকারী হতে পারি। তাক্‌ওয়া বর্ধিতকারী হতে পারি। এ মাস পূর্ণ হওয়ার পর এ কুরবানী ও রোযা পূর্ণ করার পর আল্লাহ্ তা'লা আজ আমাদিগকে নির্দেশ দিচ্ছেন আনন্দ উৎসব করো। প্রত্যেক বৈধ কাজ যা থেকে তোমাদেরকে নির্ধারিত একমাস সময় বিরত রাখা হয়েছিল তা এখন করো। খাও, আনন্দ কর, নতুন কাপড় পর, সুগন্ধি লাগাও। কিন্তু আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফেল হওয়ার অবকাশ নাই। কৃতজ্ঞতার সর্বোত্তম পন্থা হলো মসজিদে একত্রিত হয়ে ঈদের নামায পড়। এতে রমযানের রোযার ও কুরবানীর (ত্যাগের) আকারে যে নেকী করেছ বা করার তৌফিক পেয়েছ এর কৃতজ্ঞতা আদায় কর। সুতরাং এ ঈদ ভাল খাওয়ার ও পরার এবং বন্ধুদের সাথে বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করার নাম নয়। বরং কৃতজ্ঞতা আদায় করার জন্য একটা বিশেষ সুযোগ হিসাবে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ঈদ প্রদান করেছেন। তাই এতে শুকরিয়া আদায় কর।' (ঈদের খুতবা, ১৩ অক্টোবর ২০০৭ইং)।

তিনি (আই.) অন্যত্র বলেছেন, 'নিশ্চয় এই খুশি বা আনন্দ আল্লাহ্ এবং রসূলের আদেশ অনুযায়ী আমরা করে থাকি। আর ঈদের আনন্দ উদযাপনের মাঝে আল্লাহ্ তা'লার আনুগত্য বিদ্যমান।.... অতএব আজকে আমাদেরকে এই ঈদ উপলক্ষে একত্রিত হয়ে এই চেষ্টা এবং দোয়া করা উচিত। আমরা এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মও সেই মানদণ্ড অর্জনকারী হয়ে যাব যার লক্ষস্থল হবে কেবল খোদা তা'লার সত্তা। (ঈদের খুতবা, ৭ নভেম্বর-২০১১)।

অনত্র বলেছেন,...'সুতরাং জামাতের সদস্য হিসেবে আমাদের দায়িত্ব যেন আমরা নিজেদের মাঝে দুর্বলদের প্রতি দৃষ্টি রাখি। আর দৃষ্টি তখন রাখা সম্ভব যখন জামাতের সদস্যরা এর গুরুত্ব অনুধাবনে সক্ষম হবে। এ অনুভূতি নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করুন। আমাদের ঈদ তখন প্রকৃত ঈদ হিসেবে সাব্যস্ত হবে যখন আমরা একে অন্যের দুঃখকে অনুভব করতে সক্ষম হবো। (ঈদুল ফিতরের খুতবা, ১৩ অক্টোবর ২০০৭ইং)

এছাড়া আমরা ঈদ শেষে দোয়া করি হুযূর (আই.) এর রীতি হলো জামাতের শহীদগণ, বন্দীগণ, জামাতে দায়িত্বরত ব্যক্তিবর্গ ওয়াকেফে যিন্দেগী, ওয়াকফে নও, চাঁদাদাতাগণ, যারা নানা সমস্যায় আছে তাদের জন্য ও ইসলাম ও আহমদীয়াতের বিজয়ের জন্য দোয়া করা হয়। আসুন, আমরা হুযূর (আই.) এর জন্য, সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য ও আমাদের দেশের জন্য দোয়া করি। আমীন, ঈদ মোবারক, সবাইকে ঈদ মোবারক।

হযরত শ্রীকৃষ্ণ (আ.)-এর ধর্ম প্রচার

সংকলনঃ মোহাম্মদ হেলালউদ্দিন প্রধান

মহান আল্লাহ্ এই পৃথিবীতে এক লক্ষ বা দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী ও রসূল প্রেরণ করেছেন। তাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক নবী ও রসূল সম্পর্কে মানুষ জানে আর বাকীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানে না (সূরা ইব্রাহীম ঃ ১০)। কুরআনে আরো আছে, এবং আমরা প্রেরণ করেছি এমন অনেক রসূল, যাদের বৃত্তান্ত ইতিপূর্বে আমরা তোমার নিকট বর্ণনা করেছি এবং এমন অনেক রসূল, যাদের বৃত্তান্ত আমরা তোমার নিকট বর্ণনা করিনি (সূরা আন্ নিসা ঃ ১৬৫)। এবং নিশ্চয় আমরা তোমার পূর্ববর্তী জাতিগুলোর নিকট রসূল প্রেরণ করেছিলাম। অতঃপর আমরা তাদেরকে আর্থিক সংকট এবং শারিরীক কষ্টে আক্রান্ত করেছিলাম যেন তারা বিনয়াবনত হয় (সূরা আল্ আনআম ঃ ৪৩)। তুমি একজন সতর্ককারী মাত্র। এবং প্রত্যেক জাতির জন্য হেদায়াতকারী রসূল রয়েছে (সূরা আর রাদ ঃ ৮) এবং নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে কোন রসূল প্রেরণ করেছিলাম এই শিক্ষা দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং পুণ্যের পথে বাধা সৃষ্টিকারী বিদ্রোহী শয়তান হতে বেঁচে চল (সূরা আন নাহল ঃ ৩৭)। এবং প্রত্যেক উম্মতের জন্য রয়েছে রসূল। সুতরাং যখন তাদের রসূল আসে, তখন তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত ভাবে বিচার করে দেওয়া হয় এবং তাদের ওপর যুলুম করা হয় না (সূরা ইউনুস ঃ ৪৮) অর্থাৎ এবং এমন কোন দেশ নেই এমন কোন জাতি নেই যার নিকট সতর্ককারী রসূল আগমন করেনি (সূরা আল ফাতির ঃ ২৫)।

উপরে উল্লিখিত আয়াতসমূহ এমন একটা মহান সত্যকে জগতের সামনে তুলে ধরেছে, যা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে মানবজাতির কাছে অজ্ঞাত ছিল। সেই সত্যটি হল ঃ অতীত জাতিগুলির প্রত্যেকের মধ্যে আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষগণের আগমন রয়েছে যারা নিজ নিজ জাতির মধ্যে নিজ নিজ যুগে একই আল্লাহ্‌র বাণী, একই সত্য ও ধমপরায়ণতার প্রচার করেছিলেন। এই মহান সত্য বিরাট তথ্য অন্যান্য ধর্মের ঐশী উৎপত্তিকে সাব্যস্ত করে এবং ধর্মগুলির প্রবর্তকগণকে আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ রূপে প্রমাণ করে। যেহেতু পবিত্র কুরআন করীমে এই সকল আয়াত রয়েছে অতএব নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ভারত একটি দেশ আর আর্য বা হিন্দু একটি জাতি এবং তাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নবী ও রসূল ছিলেন। পরবর্তীকালে আর্য বা হিন্দুরা শ্রীকৃষ্ণ ও রামচন্দ্রের ধর্ম শিক্ষাকে বিকৃত করে বিভিন্ন জড়মূর্তি পূজা বা দেবদেবীর উপাসনা করতে শুরু করে দেয়। এটা মুসলমানদের ধর্মের অঙ্গুবিশেষ যে, তারা অন্যান্য ধর্মের সংস্থাপককে সমভাবে বিশ্বাস করে। বিশ্বমানবের কাছে এই মাহাত্মকে সমভাবে বিশ্বাস করে। বিশ্বমানবের কাছে এই মহাসত্যকে উপস্থাপন করে, ইসলাম ধর্ম বিভিন্ন বিশ্বাস অবলম্বী জাতির মধ্যে শুভেচ্ছা ও সমঝোতার ভিত্তি রচনা করছে। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও বিভিন্ন বিশ্বাসধারী জাতি ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে পারস্পরিক হিংসা ও রেষারেষি বিদ্যমান রয়েছে, তা দূর করার জন্য এই পবিত্র সত্য অতি সুমহান অবদান রাখতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণ (আ.) এর জন্ম ও বংশ পরিচয় ঃ আজ হতে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বের কথা। ১৪৫৮ খ্রিষ্টপূর্বে অর্থাৎ ৩৫০০ বছর পূর্বে যোগীরাজ মুক্তাত্মা কৃষ্ণ (আ.) ভারতের অযোদ্ধায় যযাতির বংশে অতীতে বৈশ্য কেবল ভারতের আর্যদের (হিন্দুর) জন্য আদর্শ পুরুষ হিসাবে ধরাধামে এসে লোক শিক্ষা দিয়েছিলেন।

কৃষ্ণ (আ.) সম্পর্কে ব্রহ্মা এক আকাশবাণী শ্রবণ করে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, নিবেদন করার পূর্বেই ভগবান পৃথিবীর বিপদ বিদিত আছেন। পরম পুরুষ শীঘ্রই বাসুদেবের গৃহে জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীর ভার নাশ করবেন (ভগবত পুরাণ, ১০/১/১৪-১৭ পৃঃ) ব্রহ্মার এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণ (আ.) এ পৃথিবীতে আগমন করেন। তাঁর পিতার নাম বাসুদেব, মায়ের নাম দেবকী, দাদার নাম শুর ছিল। শুরের পিতা দেবমিত বা দেবমীঢুস এর পিতা যদুর। যদুরের পিতা যযাতি ছিল। কৃষ্ণ (আ.) এর মা দেবকীর এক বোন ছিল রোহিনী যার গর্ভে জন্ম হয় বলরাম। কৃষ্ণ

(আ.) জন্মের পরে পর্যাণ্যের পুত্র নন্দ তার লালন পালন করে। পর্যান্য ছিল শুরের সৎ ভাই, তারা উভয়ের পিতা দেবমীঢুস ছিল (ভগবত পুরাণ-১০/১/১৪-১৭)। কৃষ্ণ একটি সিফতি নাম বা গুণবাচক নাম। কৃষ্ণের প্রকৃত নাম কানাই। তিনি সর্বদা সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতেন এবং তার ধর্মীয় ভাষাও সংস্কৃত ছিল। কৃষ্ণ বিয়ে করেছিলেন (মহাভারতের ৬,৬৬-১০২ পৃঃ)। তাঁর প্রথম স্ত্রীর নাম রুক্মিনী। ইনি ছিলেন বিদর্ভ রাজ্যের ভীষ্মকের কন্যা। বিষ্ণু পুরাণে কৃষ্ণের (আ.) কোথাও স্ত্রী ৮ জন আবার কোথাও ৯ জন আবার কোথাও ২২ জন বলা হয়েছে।

মহাভারতের ৫/৮৩/১২ পৃষ্ঠায় আছে 'কৃষ্ণ সতমত্র প্রতিষ্ঠিতম' অর্থাৎ কৃষ্ণ চিরসত্য ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি কখনও ঈশ্বরত্বের দাবী করেন নি, তিনি ছিলেন একজন মানুষের ন্যায় মানুষ, তিনি ছিলেন জন্ম মৃত্যুর অধীন (মহাভারত ১৬/৬/১২)।

কৃষ্ণ (আ.)কে যারা মান্য করেছিল তারা গোপী। পুং লিঙ্গ গোপ, স্ত্রী লিঙ্গ গোপী (বঙ্কীম রচনাবলী দ্রষ্টব্য)। কৃষ্ণ (আ.) এইসব গোপ গোপীদের সঠিক ও সত্য ধর্মের পথ দেখাতেন বলে তাঁর নাম হয় গোপাল বা রুদ্র গোপাল। গোপীদের মধ্যে যাকে বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে সেই অস্তিত্বের নাম রাধা বা রাধিকা। ভাগবতে, বিষ্ণু পুরাণে, হরিবংশে বা মহাভারতে কোথাও রাধার নাম গন্ধ নেই (কৃষ্ণ চরিত্র)। রাধা কোন রক্ত মাংসের গড়া অস্তিত্ব নয়, রাধা বা রাধিকা 'রাধ' ধাতু হতে উৎপন্ন। এ হতে আরাধনা শব্দটি নির্গত হয়েছে। যে আরাধনা করে সেই আরাধিকা বা রাধিকা, সংক্ষেপে রাধা (শ্রীকৃষ্ণ ও ভগবত ধর্ম ৮১ পৃঃ) যে ব্যক্তি যুগ অবতারের জন্য সবকিছু বিলিয়ে দেয় সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ আরাধনাকারী বা রাধা।

শৈশব থেকেই কৃষ্ণ (আ.) পুত ও পবিত্র চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। কৃষ্ণ (আ.) সন্দীপনি মনির নিকট শিক্ষা লাভ করেন। মহাভারতে প্রমাণ পাওয়া যায় কৃষ্ণ (আ.) বেদ-বেদাঙ্গ পারদর্শী ছিলেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে কৃষ্ণ (আ.) অঙ্গীরস বংশীয় ঘোর ঋষির নিকট অধ্যয়ন করেছিলেন। গীতার বৈদিক সিদ্ধান্ত সমূহ প্রথম হতে অষ্টাদশ অধ্যায় পড়লে কৃষ্ণের (আ.) বেদ মান্য করার উৎকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বেদ এবং উপনিষদের সারমর্ম মুক্তাত্মা কৃষ্ণ (আ.) গীতার মাঝে, অর্জুনের কাছে উপদেশ বাণী হিসাবে আলোচনা করেছেন (অমৃত লোক ৫৩ পৃঃ)।

শ্রী কৃষ্ণ (আ.) যখন এক ঈশ্বরের দিকে আহ্বান করে বললেন, হে আমার আর্য জাতি! আমি মহান ঈশ্বরের পক্ষ থেকে তোমাদের মধ্যে একজন অবতার বা রসূল অতএব তোমরা এইসব মাটি ও পাথরের প্রতিমাগুলিকে ভেঙ্গে ফেল এবং এক ঈশ্বরের প্রতি ঈমান আন আর আমার আনুগত্য কর। তখন তাঁর আত্মীয়রা তার প্রধান বিরোধিতা করে (ভগবত ধর্মের প্রাচীন ইতিহাস ৩য় খন্ড ৩০ পৃঃ)। সমসাময়িক কালে অধিকাংশ লোক তাকে অবতার বা রসূল হিসাবে মানতে অস্বীকার করে (ঐ ৩০ পৃঃ) আর্য জাতির লোকেরা তার বিরুদ্ধে বিরোধিতা করে ফলে বাধ্য হয়ে কৃষ্ণ (আ.) 'দ্বারকায়' হিজরত করেন (ঐ ২০০ পৃঃ)। দেশ সারদীয় সংখ্যার ১৩৮৪ পৃষ্ঠায় আছে কৃষ্ণ (আ.) ১০১ অথবা ১০৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। বিষ্ণু পুরাণের মতে কৃষ্ণ (আ.) একশত পঁচিশ বছর বেঁচে ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ (আ.) কার উপাসনা করতেন ঃ

শ্রীকৃষ্ণ (আ.) এক ঈশ্বরের উপাসনা করতেন। কৃষ্ণের (আ.) জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত কাজের উল্লেখ আছে। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর নির্মল চরিত্র ও প্রশংসার সঠিক বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি কখনও জড় মূর্তি পূজা করতেন না।

প্রামাণিক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে কৃষ্ণ (আ.) এবং রামচন্দ্র (আ.) ঈশ্বরের সাধনায় মগ্ন থাকতেন। বেদ ব্যাস কৃত মহাভারত এবং বাল্মীকি রচিত রামায়নে বর্ণিত আছে কৃষ্ণ (আ.) এবং রামচন্দ্র (আ.) সাধনা করে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হয়েছিলেন।

শ্রীমদ ভগবত দশম স্কন্ধ ৭০ অধ্যায় পাঠ করলে জানা যায় "ব্রহ্মা মুহূর্ত উত্থায় বায়ুর্যস্য পুয় মাধব ঃ। দধ্যৌ প্রসন্ন কারণ আত্মনং তমস ঃ পরম" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মা মুহূর্ত (ভোরে) শয্যা ত্যাগ করতঃ প্রাতঃ কত্যাদি সম্পন্ন করে অর্থাৎ ওযু করে প্রসন্নচিত্ত তমোগুণ হতে দূরে থেকে ঈশ্বরের উপাসনা করতেন।

শ্রীকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র (আ.) এবং তাদের যোগ্য শিষ্য বা সাহাবী স্বামী বিবেকানন্দ ও অর্জুন তারা জড় মূর্তি পূজা সমর্থন করতেন না। তাদের মন ছিল নিরাকার ঈশ্বরের ধ্যান উপাসনা করার জন্য সদা জাগ্রত। তাই রাম কৃষ্ণ (আ.) রাতের অন্ধকারে পঞ্চবটী বনে গিয়ে ধ্যান করতেন। তাঁর ভাগ্নে হৃদয় একদিন রাম কৃষ্ণ (আ.)কে খুঁজে না পেয়ে পরে বনের মধ্যে খুঁজে পান। হৃদয় তার মামাকে প্রশ্ন করেন মামা আপনি মা কালিকে ফেলে এখানে কেন? রামকৃষ্ণের (আ.) সহজ উত্তর 'ওরে পাগল মা কি ওই মাটির মূর্তিতে থাকে, মা যে আমার হৃদয়ের মধ্যে।

এ বিষয়ে আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য, একদিন রাম কৃষ্ণ (আ.) কে স্বামী বিবেকানন্দ ঈশ্বর দর্শন সম্পর্কে প্রশ্ন করলে রাম কৃষ্ণ (আ.) তাকে বলেছিলেন যাও পঞ্চবটীতে ধ্যান কর গিয়ে। কিছুক্ষণ পর রাম কৃষ্ণ (আ.) গিয়ে দেখেন স্বামী বিবেকানন্দ দুই জন ব্রহ্মা বন্ধুসহ ধ্যান মগ্ন। ধ্যান শেষ হলে ঠাকুর বললেন, দেখ ঈশ্বর দর্শনই জীবনের উদ্দেশ্য, ব্যাকুল হয়ে নির্জনে গোপনে তাঁর ধ্যান করতে হয় কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করতে হয়। (রামকৃষ্ণ কথামৃত, শ্রীম কথিত পৃঃ ১০৫০)।

গীতার বাণী ঃ

সংস্কৃত সাহিত্যে আছে, শ্রীকৃষ্ণ (আ.) বলেছেন ঃ যজ্ঞার্থৎ কর্মগোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধন ঃ তদর্থৎ কর্মকৌন্তেয় মুক্ত সঙ্গঃ সমাচার (অ: ৩ শো: ৯) অর্থাৎ, হে অর্জুন নিজ আসক্তি ত্যাগ করে ভগবানের প্রীতির জন্য কর্ম কর। নতুবা বন্ধন ঘটবে। এখানে কৃষ্ণ (আ.) ভগবানের ওপর নির্ভর করতে বলেছেন। এবং তাঁরাই প্রীতির জন্য কাজ

করতে বলেছেন।

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্য ঃ পরমাত্মেত্যু দাহৃতঃ। যো লোকত্রয় মাবিশ্য বির্ভত্যব্যয় ঈশ্বর ঃ (অ: ১৫ শো: ১৭)। অর্থাৎ, পরমাত্মা নামে একজন উত্তম পুরুষ আছেন। তিনি অব্যয় এবং নিত্য। তিনি স্ত্রীলোকের সকল কিছু প্রতিপালন করেন।

যৎ তু কৃস্নস্ববদেকস্মিন কার্যে সক্তম হৈতুকম। অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তৎ তামস মুদাহৃতম (অ: ১৮ শো: ২২)। অর্থাৎ, শরীরে বা প্রতিমাতে "এতটুকু ঈশ্বর বিরাজ করেন" এই জ্ঞান বা তামাসিক জ্ঞান। এখানে কৃষ্ণ (আ.) যা বলেছেন তার অর্থ হল যে, কোন মানুষ যদি অন্য কোন মানুষের মাঝে অথবা মাটি বা পাথরের জড় মূর্তির মাঝে ঈশ্বরকে খুঁজে তবে সেই মানুষ অন্ধকার জগতের মানুষ। এই অন্ধকার জগতের মানুষেরা মূর্তিপূজা নামক অন্ধকার জগতেই ডুবে মরে, তারা জীবনে কখনও আলোর সন্ধান পায় না।

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈস্কৃতিকোহলসঃ বিষাদী দীর্ঘসুত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে (অ: ১৮ শো: ২৮)। অর্থাৎ যে ব্যক্তি অভদ্র, নীতিহীন, অলস, মিথ্যাবাদী এবং দীর্ঘসুত্রী সেই ব্যক্তি তামাসিক অর্থাৎ অন্ধকার জগতের ধারক ও বাহক। তামাসিক পথের মানুষেরা পৌরনিক বিধান মেনে জড় পূজা করে।

অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃত্য। সর্ব্বার্থান বিপরীতাংশ্চ বদ্ধি: যা পার্থ তামসী (অ: ১৮ শো: ৩২)। অর্থাৎ কৃষ্ণ বলেন, তামসিক বা অন্ধকার বুদ্ধি যে সকল মানুষের মনে সর্বদা থাকে তারাই জড় মূর্তি বা পুতুল পূজা করে অন্ধকার জগতেই পড়ে থাকে। এই সকল মানুষেরা অধর্মকেই ধর্ম মনে করে আর সকল বিষয়ে উল্টা বুঝে।

হিন্দু ধর্মের লোকেরা যে শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বা ভগবান বলে মানেন আর পিতা বলে ডাকেন এবং মনে করেন যে শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র উপাস্য এবং উদ্ধারকারী যার নামে হিন্দুরা পূজা দিয়ে থাকেন। একটু ভাল করে ভেবে দেখুন তিনি যা বলেছেন তা কতটুকু করেছেন আর হিন্দুরা সর্বদা সেই ঘৃণিত মূর্তির পূজা বেশী বেশী করে যাচ্ছেন। তার মধ্যে মুক্তির পথ খুঁজেন। শ্রীকৃষ্ণকে খুব মানেন কিন্তু তাঁর কথা মানেন না। তাহলে তিনি কিভাবে আপনাকে মুক্তি করবেন। কোথায় শ্রীকৃষ্ণ আর কোথায় মূর্তিপূজারী।

স্বামী বিবেকানন্দ জড় মূর্তি পূজা মানতেন না। তিনি ছিলেন এক ঈশ্বরের উপাসক। তিনি বহু বাণীতে সমাজ ধ্বংসকারী জড়মূর্তিগুলিকে ভেঙ্গে ফেলে এক পরম পিতা ঈশ্বরের উপাসনা করতে বলেছেন। এর বহু প্রমাণ স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলীর দ্বিতীয় ভাগ পড়লে উত্তর পাওয়া যাবে। স্বামী বিবেকানন্দ মূর্তি পূজায় বিরক্ত হয়ে বলেছেন, রে মূর্খ! মহাসাগরের তীরে বাস করে কুপ খনন করে জলের প্রত্যাশা করছ (স্বামী বিবেকানন্দ পত্রাবলী)। ঘটনা সত্য তাই সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক নিরাকার অনন্ত ঈশ্বরের মাঝে বাস করে মূর্তি প্রতিমা এবং পৌত্তলিকতার মাঝে ঈশ্বরের দর্শন করা সাগরের তীরে গর্ত খনন করে জল পাবার মতই অবস্থা।

বাল্মীকি রামায়নের লঙ্কাকান্ড রামচন্দ্র (আ.) সম্পর্কে জানা যায় তিনি অসাধারণ ঈশ্বর ভক্ত মানুষ ছিলেন। তিনি বলেছেন ঃ "অত্র পূর্বং মহাদেবঃ প্রসাদ মকরোদ্ধিভুঃ সেতুবন্ধ ইতিবিদ্যাতম (সর্গ শ্লোক ২০)। অর্থাৎ, ওহে সীতে! তোমার বিয়োগে ব্যাকুল হয়ে ভ্রমণ কালে এই স্থানে (রামেশ্বর সেতু) পরমেশ্বরের উপাসনা ও ধ্যান করেছিলাম। যিনি সর্বত্র ব্যাপক, যিনি দেবাদি দেব পরমেশ্বর এবং তাঁর কৃপায় আমরা সকল সামগ্রী প্রাপ্ত হয়েছিলাম। আমরা সেই সেতুবন্ধন করে লঙ্কায় যাই এবং রাবনকে বধ করে তোমাকে নিয়ে আসি। এই প্রমাণই কি যথেষ্ট নয়? (অমৃত লোক-৫৭ পৃষ্ঠা)।

পুরানের কথা অনৈতিহাসিক। যার কারণে রামচন্দ্র এবং সুরথ রাজা দুর্গাপূজা করেছিলেন বলে যা প্রচারিত তা মিথ্যা এবং কাল্পনিক। যে অযোদ্ধায় রামচন্দ্র (আ.) জন্মগ্রহণ করেন এই অযোদ্ধায় দূর্গাপূজা নেই কেন? কারণ তাদের পঠিত বাল্মীকি রামায়ণ এবং পঠনীয় অন্য সাহিত্যে দূর্গা পূজার কোন নাম গন্ধ নেই। ভারতের অন্য প্রদেশের হিন্দুরাও দুর্গাদেবীকে চেনেন না এবং জানেন না। (অমৃত সুধা-৪৬ পৃঃ)।

বাল্মীকি রামায়ণে আছে ঃ সর্বদা ভিগতঃ সদ্ভিঃ সমুদ্র ইব সিন্ধুভিঃ। আর্য সর্বসমশ্চৈব সদৈব প্রিয়দর্শন। (রাঃ রাঃ ১) রামচন্দ্র সদা সর্বদা সৎপুরুষদের সাহচর্যে এই ভাবে থাকতেন যে রূপ সমুদ্র সদা নদীর সঙ্গে মিলে থাকে তথা তিনি আর্যঃ সমদশী এবং সকলের প্রিয় ছিলেন। (অমৃত সুধা-৭৮ পৃঃ)।

আল্লাহ্ অতীব পবিত্র এবং সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য, পরম মঙ্গলময় তাঁর নাম। অতি উচ্চ তাঁর মর্যাদা। এবং আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই।

ঈশ্বর ঃ হিন্দুরা বলে শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর মানতেই হবে, না মেনে থাকা যাবে না।

এ সম্পর্কে গীতার বাণী এই যে, "সর্বোধর্মান পরিত্যাজ্য মাসে কং শরনং ব্রজ। অহংত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়ি শ্যামি মা শুচ (১৮/৬৬)। অর্থাৎ সকল ধর্ম পরিত্যাগ করে তুমি একমাত্র আমার শরণ লও– আমি তোমাকে সকল পাপ থেকে মুক্ত করব, অতএব শোক করো না।

এই শ্লোকটি দ্বারা হিন্দুগণ শ্রীকৃষ্ণকে (আ.) ঈশ্বরত্বের দাবী করা বুঝাতে চান আসলে এটি কৃষ্ণের (আ.) নিজের কোন কথা ছিল না। এটি ছিল কৃষ্ণের (আ.) কাছে অবতীর্ণ একটি ঐশীবাণী বা ইলহাম। যেমন মহানবী (সা.)-এর ওপর কুরআন শরীফ নাযিল হয়েছে। আমরা এই কুরআনের বাণী প্রথম তাঁর কাছ থেকে শুনতে পাই। কেননা তিনি প্রথম এই ঐশীবাণী পাঠ করেছিলেন। তাই আমরা এ কথা বলতে পারবো না যে এটা মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী। তিনি (সা.) নিজেই বলে গেছেন এটা আল্লাহ্‌র বাণী; আমার ওপর হয়েছে।

এই শ্লোকের 'আমার' শব্দটি দ্বারা স্বয়ং স্রষ্টাকে বুঝায়। এই শ্লোকটি স্বয়ং স্রষ্টার নিকট থেকে শ্রীকৃষ্ণের (আ.) ওপর নাযেল হয়েছে আর তিনি নিজেই সেই

মহান স্রষ্টার উপাসনায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে ঈশ্বরের ধ্যান চিন্তা করতেন, কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করতেন (রামকৃষ্ণ কথা মৃত, শ্রীম কথিত ১০৫০)। অনুরূপ বেদ ও গীতায় আর একটি শ্লোক রয়েছে।

যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত

অভ্যুত্থানাম ধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম।

পরিত্রানায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুস্কৃতাম

ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

(গীতা অধ্যায়-৪ শ্লোক-৭)

অর্থাৎ, ভারতে যখন ধর্মের গ্লানি দেখা দেয় তখন ধর্মের জাগরণ ঘটাতে আমি (ঈশ্বর) আত্মাদেরকে সৃষ্টি করি। সাধুদের উদ্ধার ও দুস্কৃতকারীদের ধ্বংস করার জন্য যুগে যুগে প্রেরণ করি।

এই শ্লোকে 'সৃজাম্যহম' অর্থাৎ আমি শব্দটি দেখে হিন্দুরা মনে করে এটা শ্রীকৃষ্ণের বাণী। অতএব শ্রীকৃষ্ণ নিজেই ঈশ্বর। তিনি যুগে যুগে মাতৃগর্ভে জন্ম নিয়ে পৃথিবীতে আসেন দুষ্টদের ধ্বংস করে সাধুদের উদ্ধার করার জন্য। কিন্তু এই শ্লোকের 'তদাত্মানং' অর্থাৎ তাদের আত্মাদেরকে অর্থাৎ পবিত্র আত্মারূপী মানুষকে সৃষ্টি করেন। আর এই 'তদাত্মানং' শব্দের অর্থই প্রমাণ করে যে, ঈশ্বর নিজে জন্মগ্রহন করেন না। তিনি ধর্ম ও সমাজকে রক্ষা করার জন্য মহৎ এবং ধার্মিক অর্থাৎ অবতার বা রসূলগণকে যুগে যুগে পাঠান। ঈশ্বর জন্ম ও মৃত্যু রহিত। তিনি কোন ক্রমেই মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন না। কৃষ্ণ (আ.) উপনিষদের সারমর্ম প্রদানকারী এবং মহান ঈশ্বরের পক্ষ থেকে একজন অবতার ছিলেন। তিনি কোন ক্রমেই ঈশ্বর নয়। এই শ্লোকটি ঈশ্বরের নিকট থেকে শ্রীকৃষ্ণের (আ.) ওপর একটি অবতীর্ণ বাণী বা ইলহাম ছিল।

ঈশ্বর অসীম, অনন্ত, সর্বব্যাপী। তিনি 'কুন' শব্দ দ্বারা সমস্ত পৃথিবী, আকাশ, জমি, চাঁদ, সূর্য, গ্রহ, পাহাড়, নদী, গাছপালা অর্থাৎ এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি যখন কোন কিছু সৃষ্টি ইচ্ছা করেন তখন কেমন করবেন সেই বিষয়ে পরিকল্পনা করে শুধু বলেন কুন (হও) সঙ্গে সঙ্গেই ফায়াকুন হয়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণ (আ.) এই পৃথিবীর কোন অংশ সৃষ্টি করেছেন? কিছুই না বরং তিনি নিজেই সৃষ্টি হয়েছেন। তার মা বাপকেও ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর সমস্ত পৃথিবী রক্ষাকর্তা এবং ধ্বংসকর্তা। তিনি মানব জাতিকে তাঁর ইবাদত বা উপাসনা করার জন্য সৃষ্টি করেছেন।

কৃষ্ণ যে ঈশ্বর ছিলেন না শুধু একজন অবতার ছিলেন তার আরো একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, কৃষ্ণের (আ.) এর মৃত্যুর পর অর্জুন যখন 'কৃষ্ণ বংশীয়' যদু পত্নীগণকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন আভীরা দস্যুরা অর্জুনকে যুদ্ধে পরাস্থ করে রমণীদের হরণ করে নিয়ে যায়। তখন সেই রমনীকুল এবং অর্জুন নিশ্চয় কৃষ্ণ (আ.) এর নাম স্মরণ করছিলেন, এমনকি তাদের কান্নায় আকাশ পাতাল ভারী হয়ে গেল। কৈ তখন কৃষ্ণ (আ.) তাদের সাহায্য করতে আসেননি? অর্জুন বেদব্যাসের কাছে গিয়ে খুব দুঃখ করে বলছিলেন, কৃষ্ণ (আ.) এর মৃত্যুর চেয়ে আভীরা দস্যুদের দ্বারা হাজার হাজার রমনীদের হরণ এবং আমার পরাজয়ে আমি বেশী ব্যথিত। ঐ সমস্ত রমনীদের কাতর আর্তনাদ এবং অর্জুনের আকুতি মিনতি কৃষ্ণ (আ.) মনে হয় তখন শুনতে পান নি? বর্তমান অনেক ভক্তি গদগদ ভাবে কৃষ্ণ নাম উচ্চরণ করেন, আর বলেন এই নামেই পাপ মুক্ত হয়। তারা হরেক প্রকারে কৃষ্ণ (আ.) এর মাহাত্ম্য উদ্ভাবন করেছেন, সেই দ্বাপর যুগে কৃষ্ণ নামের যে শক্তি ছিল না কলিকালে কৃষ্ণের মৃত্যুর হাজার হাজার বছর পরে সেই কৃষ্ণ নামের শক্তি মনে হয় খুব বেড়ে গেছে? (অমৃত সুধা-১১ পৃঃ)।

এই ঘটনা দ্বারা আরো প্রমাণ হয়ে গেল যে কৃষ্ণ (আ.) ঈশ্বর ছিলেন না, তিনি মানুষের মতই একজন মানুষ ছিলেন, তাই মানুষ যেমন মৃত্যুর পর আর কিছুই করতে পারে না এমনি ভাবে শ্রীকৃষ্ণ (আ.) অর্জুন এবং হাজার হাজার রমনীদের জন্য কিছুই করতে পারেন নি।

ঈশ্বর ঃ ঈশ ঐশ্বর্যে' এই ধাতু হতে 'ঈশ্বর' শব্দ সিদ্ধ হয়। পরম করুণাময় ঈশ্বরের সন্ধি বিচ্ছেদ করলে হয় ঈশ+বর=ঈশ্বর। ঈশ শব্দের অর্থ ব্যাপক, শ্রেষ্ঠ এবং বর শব্দের অর্থ প্রধান। যিনি ব্যাপক এবং শ্রেষ্ঠরও প্রধান। তিনি ঈশ্বর এক অদ্বিতীয়। আরবী ভাষায় আল্লাহ্ এবং সংস্কৃত ভাষায় ঈশ্বর। স্বয়ং-সম্পূর্ণ, সর্বনির্ভর স্থল। তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি। এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। তিনি অতীব পবিত্র ও মহান।

মানুষ বা দেবতা সকলকেই সৌরজগতে এবং পৃথিবীতে সৃষ্টির মধ্যে পাওয়া যায়। তাহলে কেউ একজন পূর্বে এই পৃথিবী বা সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। যিনি এই সৃষ্টির কর্তা তিনিই আল্লাহ্ বা ঈশ্বর। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব শক্তিমান। তিনি অনন্ত দাতা, বার বার কৃপাকারী। সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র, যিনি জগতসমূহের প্রভু-প্রতিপালক, স্বতঃপ্রবৃত্ত-অনন্ত দাতা, বিচার দিবসের মালিক। তাই প্রত্যেক মানবজাতির উচিত একমাত্র সেই ঈশ্বরের ইবাদত বা উপাসনা করা এবং তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা এই বলে যে, হে ঈশ্বর! তুমি আমাদেরকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত কর, তাদের পথে, যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ, পাপগ্রস্থদের পথে নয় এবং পথভ্রষ্টদের পথেও নয়। সেই মহান স্রষ্টার কোন জন্ম মৃত্যু নেই, তিনি অসীম এবং অবিনাশী। তিনি অনন্ত গুণময় এবং সর্বজ্ঞ। তাঁর কোন শরীক দেহ নেই তিনি 'অকায়ম' অর্থাৎ তাঁর কায়া বলে কিছুই নেই। তিনি যে বিধান সৃষ্টি করেছেন, তার কোন ব্যতিক্রম করেন না। ঈশ্বরের কোন প্রকার কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, শঠতার বশবর্তী নন। তাঁর রোগ, শোক, দুঃখ নেই। তিনি কোন কিছু খান না, পান করেন না, ঘুমান না। তিনি সর্বদাই জাগ্রত থাকেন। তিনি সবকিছু দেখেন এবং শুনেন। তিনি সকল মানুষ এবং খাদ্য জগতকে সমানভাবে অন্ন, জল, অগ্নি, বায়ু এবং খাদ্য প্রদান করেন। কারও ওপরে সামান্য পক্ষপাতিত্ব করেন না। সকল ধর্ম-বর্ণ, সাধু-চোর-ডাকাত,

পাশন্ড, ভন্ড সকলেই তাঁর কাছে সমান। তিনি সকলের প্রতিপালক। তিনি ন্যায় বিচারক, তিনি ঈশ্বর, অণুতে পরমাণুতে সর্বত্র বিরাজমান। বেদে বলা হয়েছে "একমেবা অদ্বিতীয়াম ব্রহ্মা" নৈববাচান মনসা প্রাপ্তং শক্যোন চক্ষুষা। অস্তীত ধ্রুবতো হন্যত্র কথং তদপলভ্যতে"। অর্থাৎ ব্রহ্মা এক তাঁর দ্বিতীয় কেউ নাই। পরমাত্মা ভগবানকে বাক্য, মন অথবা চোখের দ্বারা কোন ভাবেই জানা যায় না, তথাপি বিশ্ব জগতে মূল এবং আশ্রয় একমাত্র তিনি।

'হিন্দু' জাতির লোকেরা আজ এক পরমাত্মা ঈশ্বরকে ভুলে বিভিন্ন ধরনের পূজা বা উপাসনা করছে। দেব-দেবীর পূজা, কালী পূজা, শীতল পূজা, জ্বরাসরের, পূজা। পীর বা কবর পূজা, তুলসী, বট, নিম, সেওড়া, বিল্ব, বদরী, তামাল ও খর্জ্জুর বৃক্ষের পূজা, গঙ্গা-যমুনা ব্রহ্মপুত্র বুড়ীগঙ্গা নদীর পূজা। শিবের ষাঁড় যমের মহিষের পূজা। শিবলিঙ্গ, বৃদ্ধের দন্ত, রামানুজ্বের কেশ, মধুঠাকুরের বৃদ্ধাঙ্গুলি পূজা। নারদের ঢেঁকী, পরী, দানব, পিশাচ, মনসাদেবী, ভয়ঙ্কর দেবতা, শনি ঠাকুর, কৃষ্ণের বাঁশি, নারায়ণ শিলাদি, প্রস্তর খন্ড, ভূত, প্রেত, ডাকিনী, পূজা শয়তানের পূজা করে থাকে। আসলে ঈশ্বর যাকে পথ না দেখায়– তাকে শয়তানেই পথ দেখায়।

হিন্দুরা বলে দেব-দেবীরা সকলেই জাগ্রত থাকে। আসলে জাগ্রত দেব-দেবী বলতে কিছু নাই।

হযরত ইব্রাহীম (আ.) (ব্রহ্মা) তাঁর পিতা ও তাঁর জাতিকে বললেন, তোমরা কার ইবাদত কর। আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তোমরা কি মিথ্যা মা'বুদকে চাও? এইগুলি কি প্রতিমা, যাদের সামনে তোমরা ধ্যান মগ্ন হয়ে বসে থাক? যা হোক সকল জগতের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদের কি ধারণা? তারা বলল, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে এই ভাবে এদের ইবাদত করতে দেখেছি। তখন ইব্রাহীম (আ.) সংগোপনে মা'বুদগুলির দিকে অগ্রসর হলেন এবং বললেন, তোমরা কিছু খাচ্ছ না কেন? তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা যে কথাও বলছ না? তখন তিনি তাদের প্রতি অগ্রসর হয়ে ডান হাত দ্বারা তাদের ওপর সজোরে আঘাত হানলেন এবং এইগুলিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেললেন।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মক্কা বিজয়ের সময় কাবা গৃহের দিকে অগ্রসর হয়ে গেলেন। তখন সেখানে তিনশ ষাটটি মূর্তি ছিল। সেইগুলির একটার পর একটার ওপরে ছুরি মারতে মারতে বললেন, "সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, নিশ্চয় মিথ্যা বিলীন হওয়ার যোগ্য। মূর্তিগুলি ছুরির আঘাতে পায়ের নিচে পড়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। তখন জাগ্রত দেবতাদের শক্তি কোথায় ছিল?

১৯৭১ সালে পাকিস্তানী হানাদার ও তাদের দোসরেরা এদেশে বহু মন্দির এবং দেবতাদেরকে ধ্বংস করেছিল। এদেশের মানুষের পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বাংলাদেশ স্বাধীনতার জন্য ৩০ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিয়ে শহীদ হয়েছেন। কিন্তু দেখা যায় জাগ্রত দেবতারা মানুষের কিছুই করতে পারে না। আসল কথা হল, মাটি বা পাথরের দেবতার উপর নির্ভর করে কোন লাভ নেই। কারণ তারা আদৌ একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সকলেই এর জন্য একত্রিত হয়ে যায়। এমনকি মাছি তাদের নিকট হতে কোন কিছু ছিনিয়ে নিয়ে গেলে তারা তা তার নিকট হতে ছাড়িয়ে আনতে পারে না। নিঃসন্দেহে প্রার্থী এবং প্রার্থিত কিন্তু উভয় দুর্বল। খোল করতাল বাজিয়ে, লম্প, ঝম্প করে, কোলাহল করে কোন ধর্ম হয় না।

ধর্ম হয় একমাত্র মহান ঈশ্বরের অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান এনে তাঁর প্রেরিত যুগ অবতারের আনুগত্য করার মাধ্যমে। মহান আল্লাহ্‌ মানবজাতিকে আশরাফুল মাখলুকাত অর্থাৎ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হিসাবে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর ইবাদত করার জন্য। এবং মৃত্যুর পরে তিনি মানবজাতির নিকট থেকে খুব দ্রুত পাপ ও পুণ্যের হিসাব নিবেন। যে ব্যক্তি এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে এবং আল্লাহ্‌র প্রেরিত যুগ অবতারের আনুগত্য করে সে ব্যক্তি চিরস্থায়ী জান্নাতে বসবাস করবে। যে ব্যক্তি যুগ অবতারকে অমান্য করে তার জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা জাহান্নাম রয়েছে। যুগের অবতার হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) পবিত্র কুরআন করীমের সূরা আলে ইমরানের ৮৬ নম্বর আয়াতের বরাত দিয়ে বলেছেন যে, কুরআন যে ইসলাম ধর্ম পেশ করছে, যে ব্যক্তি কুরআনের শিক্ষাকে গ্রহণ ও বরণ করবে না, সে কখনও খোদার কাছে গৃহীত হবে না এবং মৃত্যুর পর সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে [হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর পত্রাবলী প্রথম খণ্ড]

[তথ্য: হিন্দু ধর্মের কিছু বই এবং পবিত্র কুরআনের আলোকে সংকলিত]

ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে আমরা আমাদের অগণিত পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা এবং শুভানুধ্যায়ীগণকে জানাই পবিত্র ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা ও ঈদ মুবারক। পবিত্র ঈদুল ফিতর সকলের জন্য বয়ে আনুক অশেষ কল্যাণ ও বরকত।

–সম্পাদক

পাঠক কলাম

[পাঠক কলামের এই আয়োজনে এবারের বিষয় ছিল
"পবিত্র ঈদুল ফিতরে আমাদের করণীয়"
পাঠকদের পাঠানো লেখা দিয়ে সাজানো হলো পাঠক কলামের এই অংশ]

পবিত্র ঈদুল ফিতরে আমাদের করণীয়

"রমযানের এ রোযার শেষে এলো খুশির ঈদ।"

"ঈদ" অর্থাৎ যে খুশী বার বার আসে। মুসলিম বিশ্বের জন্য একটি ফজিলতপূর্ণ মাস হলো রমযান মাস। আত্মসংযমের মাস এই রমযান যখন তাঁর উদ্দেশ্যে আত্মত্যাগীদের আমল দেখেন, তখন রোযার পর আনন্দ উৎসব করার জন্য আল্লাহ্ পাক "ঈদ" নির্ধারণ করেছেন। রোযার পুরস্কার স্বয়ং তিনি নিজে এবং রোযা শেষে ঈদ-ও তাঁরই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিবেদিত সমগ্র মানবজাতির জন্য হেদায়াত স্বরূপ "কুরআন শরীফ"-এ বরকত মন্ডিত এই মাসের এক মাহাত্ম্যপূর্ণ রজনী যা হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম এমন রাতেই নাযেল করেছেন আল্লাহ্ তা'লা! ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের বহু পূর্ব থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে উপবাসব্রত করার প্রচলনের মত আনন্দ উৎসব পালনের ব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল। তবে ইসলাম ধর্ম "ঈদ"-উদযাপন করাকে "সার্বজনীন ইবাদতরূপে" মূল্যায়ণ করেছে। মদীনার অধিবাসীরা বছরে দু'টি দিনে আনন্দ-উৎসব ও খেলাধূলা করতো। হুযূর পাক (সা.) তাদেরকে বললেন, "আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে এই দুটো দিনের পরিবর্তে অন্য দু'টো দিন প্রদান করেছেন। একটি হচ্ছে ঈদুল-ফিতর ও অপরটি হলো ঈদুল আযহা" (তিরমিযী, বুখারী)। ঈদুল ফিতরে মু'মিন বান্দা সিয়াম সাধনার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের প্রচেষ্টার পর খুশী উদযাপন করে, আর ঈদুল আযহা যাতে মু'মিনগণ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কুরবানীর কথা স্মরণ করে অনুপ্রাণিত হয়। শুক্রবারকে "ছোট ঈদ" হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে– এর সঙ্গেও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির সম্পর্ক আছে। এই ঈদ উৎসবের বৃহদাংশ নামাযের মাধ্যমে উদযাপিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ এটি সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্ বা তাগিদকৃত নামায।

প্রকৃত ঈদ হলো মহানবী (সা.)-এর ঈদ। যে উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে তিনি প্রেরিত হয়েছেন সে উদ্দেশ্য যখন বাস্তবায়িত হবে তখনই হবে প্রকৃত ঈদ। ঈদ কুরআন ও ইসলাম বিস্তারে সম্পূর্ণ হয় যখন মহানবী (সা.)-এর সুমহান শিক্ষা সমগ্র বিশ্বের মানব জাতির ধনী-দরিদ্রের মধ্যকার বৈষম্য দূর করার মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত হয়। মহানবী (সা.) ঈদ পালন করতেন এজন্য যে তিনি খোদাকে পেয়েছিলেন। আর তাঁর সাহাবাগণ এজন্য ঈদ পালন করতেন যে, খোদার বাদশাহাত পৃথিবীতে কায়েম হয়েছিল। তাঁর সম্পদ তাঁরা লাভ করেছিল। কিন্তু আজ মুসলমানদের হাতে সেই সম্পদ একটি একটি করে লুপ্ত হয়েছে। প্রকৃত ঈদ এটাই যখন বান্দা তার জীবন খোদার জন্য বিক্রী করে দেয়। খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের চিন্তাই প্রত্যেক মুসলমানকে সর্বদা করা আবশ্যক। মুসলিম-উম্মাহর জন্য প্রকৃত ঈদ তখন হবে যখন তারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে মেনে নিবে এবং বিশ্বের প্রতিটি কোন থেকে "আল্লাহু-আকবার" ধ্বনি দ্বারা মুখরিত হয়ে উঠবে। মুসলমানগণ কি এজন্য ঈদ-উদযাপন করে যে তাদের সম্পত্তি খোয়া গিয়েছে? তাদের মধ্যে ন্যায় বিচার নেই, ইনসাফের ভিত্তি নেই। তাহলে কি কারণে তারা সন্তুষ্ট? শুধু কি নতুন নতুন পোশাক ও ভাল খাওয়াতেই খুশী? প্রথমে ঈদ মুসলমানদের জন্য পুরস্কার স্বরূপ ছিল, কিন্তু বর্তমানে তা শাস্তিস্বরূপ! যদি আমরা খোদা তা'লার দরগাহে পতিত হয়ে আমাদের দুর্বলতা, অক্ষমতা প্রকাশপূর্বক তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করি, তবে সত্যসত্যই তা আমাদের ঈদ এবং আমরা তাঁর ও রসূল (সা.)-এর সম্মুখে চোখ মেলে তাকাবার যোগ্য হই! নইলে আমাদের ঈদ কিছু নয়, বরং প্রত্যেক ঈদ আমাদেরকে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর মৃত ব্যক্তিতে পরিণত করবে! হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "সেই দিন কোনটি যা জুমুআ ও দুই ঈদের দিনের চাইতেও উত্তম? তা হলো– মানুষের তওবা করার দিন। কারণ ঐ দিন বান্দার আমলনামা ধুয়ে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়।" পবিত্র রমযানে যদি সত্যিকার তওবা করতে সক্ষম হই তাহলে রমযানের প্রতিটি দিনই হবে আমাদের 'ঈদের দিন।' আমাদের ঈদ তখনই হবে প্রকৃত ঈদ, আমাদের রোযা তখনই চিরস্থায়ী কল্যাণ হিসেবে প্রবাহমান থাকবে যখন আমাদের মাঝে স্বচ্ছল-ব্যক্তিরা নিজ গরীব ভ্রাতার প্রতি খেয়াল রাখবে! আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে ঘোষণা দেয়া হয়–"হে আমার বান্দাগণ! বলো তোমাদের কি চাওয়ার আছে? যেহেতু তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভ করতে চাও, তাই তোমরা ঐ সকল কিছু লাভ করবে– "তোমাদের হৃদয়ে যা আকাঙ্খা করে আর এটিই প্রকৃত মু'মিনের ঈদ হয়ে থাকে আর হওয়া-ও উচিত।" এই জগতের আনন্দ হলো, মু'মিন পরকালে যে আনন্দ লাভ করবে তার এক ঝলক মাত্র! অতএব প্রত্যেক মু'মিনের ঐ স্থায়ী-আনন্দ অন্বেষণ করা উচিত। মূলতঃ ঈদের মাধ্যমে আমাদের দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধির পাশাপাশি পরস্পরের মাঝে ঈমান ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করা আর নিজেদের মধ্যকার হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে স্বর্গীয় পরিবেশের সৃষ্টি করা। যদি এমনটা হয় তাহলে আমাদের ঈদ পালন ইবাদতে গণ্য হবে। না হলে ঈদ-পালন করা হবে ক্রন্দনের দিন। প্রকৃত ঈদ সেদিন হবে যেদিন বিভিন্ন আত্ম-ত্যাগের বিনিময়ে পৃথিবীর মানুষ নিজেদের অভ্যন্তরে পরিবর্তন আনয়ন করে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পতাকাতলে সমবেত হবে। পৃথিবীতে খোদা তা'লার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। মহান আল্লাহ্ আমাদের সকলকে প্রকৃত-ঈদের কল্যাণ দান করুন। আমীন।

আনোয়ারা বেগম, রংপুর

আমাদের ঈদ

ঈদ অর্থ এমন অনুষ্ঠান যা বার বার ফিরে আসে। একমাস সিয়াম সাধনার পর রোযাদারদের পরম আনন্দের দিন ঈদুল ফিতর। আল্লাহ্‌র জন্য তাঁর মু'মিন বান্দারা রোযা রাখার ত্যাগ স্বীকার করে। ঈদের মাধ্যমে কষ্টের দিনগুলো সমাপ্তি হয়। ঈদ পরবর্তী ঈদের খুশীকে বছর ব্যাপী ধরে রাখতে হবে। ঈদ কি? ঈদ অর্থ খুশির সাওগাত, মিলন। সবার সাথে ঈদ পরবর্তী দিন গুলিতে ঈদের দিনের মত মিলমিশ হয়ে একাত্ম হয়ে মনে প্রাণে সবার সাথে মিলে মিশে, হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার করে চলতে হবে। তবেই ঈদের আনন্দ পরিপূর্ণ হবে। প্রকৃত ইদ হবে। হযরত নুমান বিন বশির (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, হযরত (সা.) বলেছেন, "একে অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শনে, প্রেম ভালবাসা, মায়া মমতা, এবং একের সাহায্যে অন্যের ছুটে আসা ঈমানদারদের তুমি একটি দেহের সমতুল্য দেখবে। দেহের কোন অংঙ্গে ব্যথা হলে গোটা দেহটাই অনিদ্রা ও জ্বরে শরীক হয়ে যায় (ঈমানদার সমাজের অবস্থাও তদ্রুপ) [বুখারী, কিতাবুল আদব]

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) বলেন, "যে নিজ ভাইকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত নয়– সে আমার জামাতভুক্ত নয়"- কিশতিয়ে নূহ। ঈদ আমাদের কাছে ত্যাগ স্বীকার চায়। ত্যাগেই আনন্দ, ভোগে নয়। রোযার ঈদে ফিতরা দিতে হয়– রোযার মাসে এটি একটি সার্থক ইবাদত। গরীবদের ফিতরা সহ হযরত সাহেব তোহ্‌ফা পাঠান যাতে গরীব-দুস্থরা ঈদের আনন্দে শরীক হতে পারে। সকল প্রকার রূহানী সাধনার সাথে মালী কুরবানীর এক মহান ত্যাগ জনিত তৃপ্তিতেই ঈদের উদ্দেশ্য সফল হয়। পূর্ণতা লাভ করে। হযরত (সা.) রমযান মাসে ঝড়ের গতিতে দান-খয়রাত করতেন। যাকাত, সদকা, ফিতরা ও অন্যান্য দান খয়রাতের মাধ্যমে সমাজের গরীব দুঃখী সবাইকে রমযানের মহান সাধনায় অংশগ্রহণ করাতেন।

সূরা বাকারা, সূরা হাদীদ ও অন্যান্য সূরাতে এসেছে– আল্লাহ্‌ দানকে উত্তম ঋনস্বরূপ নেন এবং তা বাড়ায়ে বান্দাকে ফেরত দেন। প্রকৃত ঈদ হয় তাই যা আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাদের জন্য আকাশ থেকে নাযিল করেন। অন্যায়- অবিচার, কৃপণতা, হিংসা, হানাহানি, অহংকার ভরা পৃথিবীতে আজ প্রকৃত ঈদ নাই। ঈদের একটি অংশ এটাও যে আমরা ভাল জামা-কাপড় পরলাম, সেমাই, ফিরনি, জর্দা ভাত, মাছ, গোশত খেলাম। হালাল আনন্দ উপভোগ করলাম–খেলা-ধূলা, পার্কে যাওয়া। নতুন সাজ পোশাকে ঈদের দিন, তৎপরবর্তী দু'একদিন বেশ আনন্দ করলাম শিশুদেরও সাজগোজ করালাম। কিন্তু না। আমাদের নবী করিম (সা.) এই পৃথিবীতে চিরস্থায়ী ঈদ লাভ করেছিলেন। আল্লাহ্‌ তাঁর (সা.) কাধে মানবজাতির জন্য যে দায়িত্ব অর্পন করেছিলেন তা তিনি পুরাপুরি পালন করেছিলেন। তাই হযরত (সা.) এর জন্য ছিল প্রতিদিনের ঈদ। হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) জামা'তের পঞ্চম খলীফা বলেন, "সুতরাং প্রকৃত ঈদ সেটি যাতে মানুষ নিজ আমল বা কর্মে স্বাদ অনুভব করা শুরু করে কুরবানী করেও স্বাদ অনুভব হয় এবং কুরবানী করার জন্য সকল প্রকার আগুনে ঝাপিয়ে পড়তে সে প্রস্তুত হয়ে যায় এবং কখনও আমল বা কর্ম পরিত্যাগ করার কথা কল্পনাও করে না। এই মাকাম বা মর্যাদা কোন জাতি লাভ করলেই প্রকৃত ঈদ উদযাপন করা হয়। এই প্রকৃত ঈদের অবস্থা সৃষ্টির জন্য হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এসে ছিলেন এবং এটিই প্রকৃত ঈদ যা তিনি আমাদের মাঝে দেখতে চেয়েছিলেন।" (খুতবা ৩০ শে জুলাই ২০১৪)

পবিত্র কুরআন শরীফে ঈদ বিষয়ক একটি আয়াতে বলা হয়েছে, হযরত ঈসা (আ.) তার জাতির জন্য দোয়া করেন, "হে আল্লাহ্‌ আমাদের জন্য আকাশ থেকে খাঞ্চা ভরা খাদ্য নাযিল কর। আর তা যেন আমাদের এবং আমাদের পরবর্তীদের জন্য ঈদ হয়। আর তোমার তরফ থেকে তা যেন একটি নিদর্শন হয়।" দেখুন কথা কত স্পষ্ট। আকাশ থেকে যে খাদ্য আল্লাহ্‌ পাঠাবেন তা যদি ঈদ হয় তবে তা হবে সবার জন্য সমান। পরিবার, সমাজ, জাতিগত ও বিশ্ববাসীকে নিয়ে সম্পদ সম্পত্তির সম বন্টনের মাধ্যমে তা হবে সবার জন্য ঈদের কারণ। পানি, বায়ূ, আলো যার মাধ্যমে পৃথিবীতে আমরা খাদ্য পাই তা আসে আকাশ থেকে। আমরা যদি হিংসা-বিদ্বেষ, কৃপণতা, অহংকার হানাহানি পরিত্যাগ করে সমাজের সবাইকে নিয়ে চলতে পারতাম। সম্পদের নিয়ামানুযায়ী সম বন্টন করে ত্যাগের মহিমা প্রদর্শন করতাম তবে তা হতো আমাদের জন্য প্রকৃত ঈদ। আল্লাহ্‌ আমাদের দান খয়রাত– আল্লাহ্‌র রাস্তায় অর্থ ব্যয়ের বিনিময়ে প্রচুর ফসল দিতেন। দশগুণ, সত্তর গুণ, একশত গুণ তারও বেশি দিতেন। কিন্তু কৃপণতা আমাদের পেয়ে বসেছে। আমরা নিজেকে নিয়ে বাঁচতে চাই।

কিন্তু আকাশ থেকে ধামা ভরা, ডোল ভরা, গোলা ভরা, ফসল পেতে হলে সবাইকে নিয়ে চলতে হবে। হযরত ঈসা (আ.) তাঁর জাতির জন্য যে দোয়া করেছিলেন তার জাতি প্রথম দিকে এবং এই শেষ যুগে প্রচুর সম্পদ পেয়েছে। কিন্তু তারা আজ খোদাকে ভুলে সে স্থলে ঈসা (আ.)কে খোদা হিসেবে গ্রহণ করায় যে মহা ভুলের মধ্যে নিপতিত যে কারণে এখন তাদের কাছ থেকে আল্লাহ্‌ তা প্রত্যাহার করে নিবেন। এখন এটা সম্ভব হবে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মাধ্যমে।

আহমদীদের সকলের দায়িত্ব পৃথিবীবাসী তথা সকল জাতির মানুষকে বুঝান। সাধ্যমত স্ব-স্ব গন্ডিতে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে। এ কাজে আহমদীয়া মুসলমানগণ আল্লাহ্‌র সাহায্যে দোয়ার বরকতে আমরা আহমদী মুসলমানগণ সফলতা লাভ করছি। ইসলাম অর্থ শান্তি আর বর্তমান হিংসা, হানাহানির যুগে মানবজাতি আমাদের চারিত্রিক উৎকর্ষতার কারণে, ইসলামী শিক্ষার সৌন্দর্যের কারণে, মানবজাতিতে শান্তিতে বসবাস করার জন্য, শান্তির ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভে স্বস্থি পাচ্ছেন। ধন্য হয়েছেন। আশা করা যায় ইনশাআল্লাহ্‌ অচিরেই আহমদীয়া জামাত সহসা বিজয় লাভ করবে। এটা আল্লাহ্‌র তকদীর। এ তকদীর পূর্ণতা লাভ করেই দেখাবে। এ দৃশ্য এখন স্পষ্ট। আমাদের যখন বিশ্ববিজয় হবে তখন আমরা বিশ্ববাসীকে নিয়ে এক নেতার অধীনে একতাবদ্ধ হয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আধ্যাত্মিকতার প্রাসাদে আমরা প্রকৃত ও পূর্ণ ঈদ উদযাপন করব। এটাই হবে আমাদের প্রকৃত ঈদ।

মোহাম্মদ আব্দুস সামাদ
নওবেকী, সাতক্ষীরা

পবিত্র ঈদুল ফিতর সবার জন্য কল্যাণ বয়ে আনুক

বাহ্যিক, পার্থিবতা মোহ-মায়া মরিচীকার মৃত্যুতেই ইসলামের জীবন। ইসলামের জীবন সর্বদা কুরবানীর মুখাপেক্ষী। সৎকর্ম তথা আমলে সালেহর মাধ্যমে এ বৃক্ষ সতেজ ও সবুজ থাকে এবং উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করে। হযরত আলী (রা.) বলেছেন, "আমি আমার যাবতীয় আকাঙ্খাকে ছিন্ন করেই আমার আল্লাহকে লাভ করেছি।" নিয়্যত অনুপাতে ফল প্রকাশ পেয়ে থাকে। মুসলমানদের প্রধানত দু'টি উৎসব– একটি ঈদুল ফিতর এবং অন্যটি ঈদুল আযহিয়া। একটি আসে সুদীর্ঘ মাস ব্যাপী রোযা রাখার পর আর অন্যটি বৎসরান্তে হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর অনুকরণে ও আদর্শে কুরবানী প্রদানের মাধ্যমে। সামর্থবানরা এ মাসে হজ্জও সম্পাদন করে থাকেন। উৎসবগুলো মূলত চেষ্টা সাধনা এবং আল্লাহ্‌র দরবারে কুরবানী সমূহ পেশ করতে পারার ফলশ্রুতিতে যে আত্মশুদ্ধি লাভ হয় তার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যেই পালন করা হয়।

যেহেতু আল্লাহ্‌র হকের সাথে বান্দার হকও জড়িত তাই প্রত্যেক মু'মিন যথাসাধ্য আল্লাহ্‌র আদেশে আত্মীয় স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী এতীম, মিসকীন, মুসাফির সবারই সমস্যাবলী নিরসনে এবং তারাও যাতে এ ঈদে শরীক হতে পারে সে উদ্দেশ্যে দান খয়রাত ও সাহায্য সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করে থাকেন। আর এগুলো আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সম্পাদন করার কারণে ইবাদতও বটে। পবিত্র রমযান সাধ্য সাধনার মাস। রসূলুল্লাহ্‌র (সা.) আদর্শে জীবন রাঙ্গানোর অনন্য সুযোগ এনে দেয় এ মাস। এ মাস আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বিতরণকারী মাস। প্রাত্যহিক প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি মুহূর্তে ইসলামের নীতি ও আদর্শ ও নাজাতের মাস। এই পবিত্র রমযানুল মোবারকের শেষ দশকের বিজোড় রাত্রিতে আসে লাইলাতুল কদর। আল্লাহ্ পাক আমাদের একে অন্বেষণ ও লাভ করার সৌভাগ্য দান করুন।

পবিত্র এ মাসেই সমগ্র মানবজাতির জন্য সর্বকালব্যাপী পথ প্রদর্শক নির্ভুল, নিশ্চিত ও চিরসত্য পবিত্র কুরআন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ খাতামান নবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ওপর নাযিল হওয়া শুরু হয়। পবিত্র কুরআন সমগ্র মানবজাতির জন্য আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর আদর্শে ঈদুল ফিতরকে সফল করতে আমাদের উচিত বিনা ব্যতিক্রমে রোযা পালন করা। নামায তারাবিহ্ ও তাহাজ্জুদ পড়া। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করা ও অনুধাবন করার চেষ্টা করা। আচার আচরণ, লেন দেন, ব্যবসা বাণিজ্য সর্বক্ষেত্রে ইসলামের আদর্শ বাস্তবায়ন করা।

তদোপরি লাযেমী চাঁদাসহ যাবতীয় চাঁদা, যাকাত, ফিতরানা, ফিদিয়া ও ঈদফান্ড যথা সময়ে পরিশোধ করা। গরীব, এতীম, মিসকিন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া প্রতিবেশীকে সম্পৃক্ত করে এ পবিত্র উৎসবকে সফল করা এবং যাবতীয় অনাচার, অপব্যয় ও অপসংস্কৃতি হতে নিজেদের পরিবারবর্গ ও জামাতকে মুক্ত রাখা। আল্লাহ্ পাক আমাদের সবাইকে প্রকৃত ঈদুল ফিতর পালন করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

মোহাম্মদ নূরুজ্জামান
বড়চর

> **"যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের শত শত আদেশের মধ্যে একটি ছোট আদেশকেও লংঘন করে, সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে।"**
>
> –হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

পাঠকদের অংশগ্রহণে নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে 'পাঠক কলাম'। আগামী পাঠক কলামের বিষয়-

"ইসলামে ওয়াদা রক্ষার গুরুত্ব"

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ১৫ জুলাই, ২০১৬-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

পাঠকের সুবিধার্থে পরবর্তী আরো এক সংখ্যার পাঠক কলামের বিষয় নিম্নে দেওয়া হল।

১। ইসলামে কুরবানির শিক্ষা।

* আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

* লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে।

* লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।

বি: দ্র: পাঠকরা যদি কোন বিষয় নিয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে পাঠক কলামে লিখতে চান তাও পাঠাতে পারেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-

ন্যাশনাল সেক্রেটারী, ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১
e-mail:
pakkhik_ahmadi@yahoo.com
masumon83@yahoo.com

সংবাদ

বিভিন্ন জামা'তে যথাযথ ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে খিলাফত দিবস অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রামের পতেঙ্গা হালকা

গত ২৭ মে, বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রামের পতেঙ্গা হালকায় জনাব জহির আহমদ শাকিল এর সভাপতিত্বে খিলাফত দিবস উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভার শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মিজানুর রহমান। বক্তৃতা পর্বে সর্বজনাব মোজাহিদ আলম, জহির আহমদ শাকিল, মোজাম্মেল হক (মোয়াল্লেম) ও আব্দুল মন্নান যথাক্রমে খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ, খিলাফত ও বিশ্বময় ইসলাম প্রচার, খলিফাতুল মসীহগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং খিলাফতের আনুগত্য বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। এতে ৫ জন মেহমান সহ মোট ৪৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

আব্দুল মন্নান

লাজনা ইমাইল্লাহ আহমদনগর

গত ২৯ মে, লাজনা ইমাইল্লাহ আহমদনগরের উদ্যোগে খিলাফত দিবস অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান শুরু হয় আফরোজা মতিন, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের সভানেতৃত্বে। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন আক্তার জাহান রুমু। হাদীস পাঠ করেন নিলুফা ওয়াহাব। নযম পাঠ করেন আমাতুস সামী। বিভিন্ন বিষয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন তালাত মেহতাব, নাফিয়া শারমিন, রিনাত ফৌজিয়া, বিলকিস তাহের এবং নাসিমা বশির। নযম পাঠ করেন ফারজানা শাওন। সমাপ্তি ভাষণ দেন প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। এতে৮৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোছাঃ শাহিনা সেলিম

ডোহান্ডা

গত ২৭ শে মে ২০১৬ তারিখে রোজ শুক্রবার জুমার নামাযের পর খিলাফত দিবস উদযাপন করা হয়। পবিত্র কুরআন ও নযম পাঠের মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠান শুরু হয়া। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব সাব্বির আহমদ, নযম পাঠ করেন জনাব সালেহ আহমদ সুমন। বক্তৃতা প্রদান করেন মৌ. শামীম আহমদ। উক্ত সভায় আরও ২ জন আলোচনা করেন, খিলাফতের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল ২৩ জন। সভাপতির বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

আফতাব উদ্দিন

খুলনা

গত ২৭ মে, বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত খুলনার উদ্যোগে জামা'তের আমীর জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক এর সভাপতিত্বে দারুল ফজলস্থ বায়তুর রহমান মসজিদে খিলাফত দিবস উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভার শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ মফিজুর রহমান এবং নযম পাঠ করেন জনাব তানভীর আহমদ শোভন। অতঃপর খিলাফত প্রতিষ্ঠা, খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ ও খিলাফতের আনুগত্য-এ বষয়সমূহের ওপর বক্তব্য রাখেন জনাব জি এম মুশফিকুর রহমান এবং মওলানা খুরশিদ আলম। সবশেষে সভার সভাপতি ঐশী খিলাফতের কল্যাণ এবং জামা'তের সদস্যদেরকে খিলাফতের রজ্জুকে দৃঢ়তার সাথে ধারণ করে নিজেদের জীবন পরিচালনার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। দোয়ার মাধ্যমে আলোচনা সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এতে ৪৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

এন এ শাহীন আহমদ

লাজনা ইমাইল্লাহ্ উথলী

গত ০৩/০৬/২০১৬ তারিখ বাদ জুমুআ খিলাফত দিবস পালন করা হয়। স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোছাঃ তাহিরা রহমান। উর্দু নযম পাঠ করেন মোছাঃ তাজবিহা রহমান। তারপর বক্তৃতা করেন খিলাফতের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন বক্তাগণ। এই অনুষ্ঠানে মোট ১০ জন লাজনা উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

মোছাঃ সেলিনা আক্তার

বড়চর

গত ২৭ মে ২০১৬ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামাত বড়চর এ স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ নূরুজ্জামান এর সভাপতিত্বে খিলাফত দিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত দিবসে প্রথমে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব আব্দুল আলীম সানী। বাংলা নযম পাঠ করেন প্রফেসর মোহাম্মদ জাকির হোসেন। বক্তৃতা পর্বে খিলাফত দিবসের ভূমিকা, গুরুত্ব, কল্যাণ ইত্যাদি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন আব্দুল করিম। সবশেষে সভাপতির সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়।

আব্দুল করিম

জামালপুর (হবিগঞ্জ, সিলেট)

গত ২৮ মে, রোজ শুক্রবার জামালপুর হবিগঞ্জ জামাতের উদ্যোগে খিলাফত দিবস উদযাপন করা হয়। বাদ মাগরিব অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব শামসুর রহমান চৌধুরী। শুরুতে কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোবাশ্বের আহমদ, নযম পেশ করেন জনাব রাফি আহমদ। বক্তৃতা পর্বে খিলাফতের বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেন সর্বজনাব মৌ. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, ডাক্তার রফিক আহমদ চৌধুরী, মোবাশ্বের আহমদ, রাফি আহমদ চৌধুরী, স্বাধীন আহমদ চৌধুরী, বাংলা নযম পেশ করেন শাকিল আহমদ ও রনি আহমদ চৌধুরী।

শেষে সভাপতি খিলাফত দিবসের বরকত ও কল্যাণের ওপর বক্তৃতা করেন। দোয়া মাধ্যমে খিলাফত দিবসের কার্যক্রম সমাপ্তি হয়। এতে ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন।

শামসুর রহমান চৌধুরী

ইসলামগঞ্জ

গত ১লা জুন ২০১৬ তারিখ রোজ বুধবার বাদ মাগরিব আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ইসলামগঞ্জে নামায সেন্টারে 'খিলাফত দিবস' পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব রফিক আহমদ আলমগীর এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রথমে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন, জনাব সুলতান আহমদ। নযম পাঠ করেন জনাব আতিয়াতুল হাই বুশরা। এরপর বক্তৃতা পর্বে সর্বপ্রতম আলোচনা করেন জনাব নিযামউদ্দিন। তিনি খিলাফতের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তারপর মৌ. মুহাম্মদ আমীর হোসেন, মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ সম্পর্কে বিভিন্ন ঘটনাবলী তুলে ধরেন। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

প্রেসিডেন্ট, ইসলামগঞ্জ, জামাত

লাজনা ইমাইল্লাহ রাজশাহী

গত ৩ জুন, রোজ শুক্রবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ রাজশাহী জামাতের উদ্যোগে খিলাফত দিবস অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ্। স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সৈয়দা সেলিনা সিরাজ। এরপর নযম পাঠ করেন মেহনাজ করিম এশা। এরপর খিলাফত দিবস কি ও ও এর গুরুত্ব ও কল্যাণ বিষয়ে বক্তৃতা দেন নুসরাত জাহান। পরবর্তীতে খলীফার আনুগত্য অত্যন্ত জরুরী দ্বিনী বা ধর্মীয় কর্তব্য বিষয়ে বক্তৃতা দেন রাশেদা কানেতা এবং সবশেষে খেলাফত ও বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন আকলিমা খাতুন। সবশেষে প্রেসিডেন্টের দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

নুঝাত তাবাস্‌সুম

বীরগঞ্জ

গত ২৭/০৫/২০১৬ তারিখ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বীরগঞ্জের উদ্যোগে খিলাফত দিবস পালিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। স্থানীয় জামাতের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ আলী এর সভাপতিত্বে খিলাফত দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়। এতে প্রথমে কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মৌ. মোহাম্মদ মাহমুদ আহমদ আনসারি। এরপর দোয়া পরিচালনা করেন জনাব সভাপতি সাহেব। খিলাফত দিবসের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন সর্বজনাব মোহাম্মদ রাশিদুল ইসলাম মোয়াল্লেম, মোহাম্মদ জিয়াউল আহমেদ, মোহাম্মদ আব্দুল হাকিম, মোহাম্মদ তাহের আহমেদ। সবশেষে সভাপতির সমাপ্তি ভালন ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। এই অনুষ্ঠানে মোট ২০ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ রাশিদুল ইসলাম

পুরুলিয়া

গত ২৭ শে মে ২০১৬ তারিখে রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ খিলাফত দিবস পালন করা হয়। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব আব্দুস সাত্তার এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান শুরু হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব রকিব আহমদ শান্ত। নযম পাঠ করেন জনাব সাব্বির আহমদ স্বপন। খিলাফত দিবস সম্পর্কে আলোচনা করেন মৌ. সাদেক আহমদ এবং জনাব বিপ্লব শাহ্। সবশেষে সভাপতির সমাপ্তি ভাষণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। এতে ১৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

আব্দুস সাত্তার

বোটিয়া পাড়া

গত ২৭/০৫/২০১৬ তারিখ বাদ জুমুয়া আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বোটিয়া পাড়ার উদ্যোগে খিলাফত দিবস উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ মিরাজুল ইসলাম। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ আমিনুজ্জামান। নযম পাঠ করেন আব্দুল্লাহ্ আল বাসিত। এরপর খেলাফতের ধারাবাহিকতা, প্রকার, গুরুত্ব ও কল্যাণ এ সকল বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব আখতারুজ্জামান, মোহাম্মদ আমিনুজ্জামান ও জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আল-আমীন। অতঃপর সভাপতির বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ১৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আমিনুজ্জামান

রঘুনাথপুর বাগ

গত ২৭ শে মে ২০১৬ তারিখে রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ জনাব আতিয়ার রহমান প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামাত রঘুনাথপুর বাগ এর সভাপতিত্বে মহান খেলাফত দিবস উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব সোহেল রানা। নযম পরিবেশন করেন জনাব মোহাম্মদ বাবলী। খিলাফত দিবসের গুরুত্ব ও তাপর্য বর্ণনা করে বক্তৃতা করেন সর্বজনাব জাহিদ হাসান, জি, এম আলমগীর হোসেন ও মৌ. এস, এম মাহমুদুল হক। সবশেষে সভাপতির দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ৮২ জন উপস্থিত ছিলেন।

এস, এম, মাহমুদুল হক

নাসেরাবাদ

গত ২৭ শে মে ২০১৬ তারিখে রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ খেলাফত দিবস পালন করা হয়। স্থানীয় প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান শুরু হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ ইয়াদ আলী। নযম পাঠ করেন জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান। খিলাফত দিবস সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেন সর্বজনাব মোহাম্মদ আব্দুর রহমান এবং মৌ. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, মোয়াল্লেম। সবশেষে সভাপতির দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোহাম্মদ শওকত আলী

লাজনা ইমাইল্লাহ্ রঘুনাথপুর বাগ

গত ০৩/০৫/২০১৬ তারিখ রঘুনাথপুর বাগের উদ্যোগে খিলাফত দিবস উদযাপিত হয়। স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহর প্রেসিডেন্ট নাজমা ইসলামের সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন রিক্তা জসিম। নযম পরিবেশন করেন আয়েশা আতিয়ার, হাদীস পাঠ করেন সুরাইয়া ইসলাম। বয়আতের শর্ত পড়ে শোনান জলি। অমৃতবাণী পাঠ করে শোনান পাপিয়া আলম। বক্তৃতা পর্বে খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যান বিষয়ে বক্তব্য রাখেন নাজমা ইসলাম। খিলাফতের ঐশী কল্যাণ ও আমাদের করণীয় বিষয়ে বক্তব্য রাখেন রিপা মাহমুদ। সবশেষে সভাপতির দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এতে ১৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

নাজমা ইসলাম

'নূরনগর' ঈশ্বরদী

গত ২৭ শে মে ২০১৬ তারিখে রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ খিলাফত দিবস পালন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ আশরাফ আলী খান। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব তৌফিক জামান (মাহী) নযম পাঠ করেন সাব্বির আহমদ এবং আলোচনা পর্বে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ জসিদুজ্জামান, সাব্বির আহমদ খান এবং মওলানা মোহাম্মদ আল হক। সবশেষে ইসলামে আহমদী খিলাফত এই বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন সভাপতি। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। দিবসে ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আশরাফ আলী খান

কুঠির হাট

গত ০৩ জুন, রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব শাহ আলম ভূঞার সভাপতিত্বে খিলাফত দিবস উদযাপন করা হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ খালেদ ভূঞা। এরপর নবুওয়তের ধারায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত এর ওপর বক্তব্য প্রদান করেন জনাব ফখরুল আলম ভূঞা। খিলাফত একটি ঐশী নেযাম-এর ওপর বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ তালহা জাহিদ ভূঞা। খিলাফতের গরুত্ব ও কল্যাণ নিয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন মৌ. মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম। এরপর সভাপতির দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়ে।

মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম

সরিষাবাড়ী

গত ২৭ মে, রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ খিলাফত দিবস পালন করা হয়। কেন্দ্রীয় ন্যাশনাল সেক্রেটারী রিস্তানাতা আব্দুল জলিল-এর সভপতিত্বে দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব কারী মৌ. সাইদুর রহমান। নযম পেশ করেন সাংবাদিক ডা. মোহাম্মদ মতিউর রহমান। এরপর ২৭ মে খিলাফত দিবসের ওপর বিভিন্ন তাৎপর্যপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব হাফিজুর রহমান, ডা. মৌ. বেলাল উদ্দীন, আব্দুল ওয়াদুদ এবং কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি। পরিশেষে তার দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। এতে ৪৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ ছাইফুল ইসলাম

কিশোরগঞ্জ জেলায় ৬ষ্ঠ জেলা ইজতেমা সম্পন্ন।

গত ৩ ও ৪ জুন ২০১৬ শুক্র ও শনিবার মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া কটিয়াদীতে ৬ষ্ঠ জেলা ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে আতফাল ও খোদ্দাম মিলে প্রথম দিন ৫০ জন এবং পরের দিন ৪০ জন অংশগ্রহণ করেন। ইজতেমা জুমুআ নামাজ শেষে শুরু হয় এবং তা পরের দিন শনিবার আছর পর্যন্ত একটানা চলে। সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ হাদিউল ইসলাম খোকন, জেলা কায়েদ, কিশোরগঞ্জ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ড: শাহজাহান কবির, কেন্দ্রিয় প্রতিনিধি ও রিজিওনাল কায়েদ, ময়মনসিংহ। নসীহতমূলক বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ রাসেল সরকার এবং কটিয়াদী মজলিসের কায়েদ জনাব সুলতান আহমদ লিটন ও তেরগাতীর কায়েদ জনাব সুমন আহমদ। সবশেষে পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়।

মোহাম্মদ হাদিউল ইসলাম

পুরুলিয়ার লাজনা ইমাইল্লার ৫ম স্থানীয় ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ২০ মে ২০১৬ তারিখ ৫ম স্থানীয় ইজতেমা সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে। শাহানাজ আক্তার প্রেসিডেন্ট-এর সভাপতিত্বে সকাল ১০ টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইজতেমা শুরু হয়। তারপর লাজনা নাসেরাতদের মাঝে কুরআন তেলাওয়াত, নযম, বক্তৃতা এবং খেলাধূলা অনুষ্ঠিত হয়। বিকাল ৩ টায় সমাপনী অধিবেশনে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এতে ৩৪ জন উপস্থিত ছিলেন। সবশেষে ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

শাহানাজ আক্তার

ওয়াকফে নও মাতাপিতা ও নাসেরাত দিবস পালিত

লাজনা ইমাইল্লাহ্ শ্যামপুরের উদ্যোগে ওয়াকফে নও, মাতাপিতা ও নাসেরাত দিবস পালন করা হয়। উক্ত দিবসে কুরআন পাঠ, নযম পরিবেশন, বক্তৃতা কাসিদা প্রতিযোগিতা নেয়া হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে লাজনা ১২ জন, নাসেরাত ৬ জন, শিশু ৫ জন, আতফাল ১ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোছাঃ মনিরা বেগম

আহমনগরে নাসেরাত দিবস অনুষ্ঠিত

গত ২৪/০৫/২০১৬ তারিখে আহমদনগর লাজনা ইমাইল্লাহর উদ্যোগে নাসেরাত দিবস পালিত হয়। উক্ত দিবসে নাসেরাতের সংখ্যা ছিল ৩৬ জন এবং লাজনার সংখ্যা ছিল ১০ জন। নির্ধারিত বিষয় অনুযায়ী মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয় এবং পুরস্কার বিতরণ করা হয়। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

মোছাঃ শাহিনা সেলিম

সদর মজলিস আনসারুল্লাহর মিরপুর মজলিস পরিদর্শন

মজলিস আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশের সদর জনাব আলহাজ্জ আহমদ তবশীর চৌধুরী গত ৪ জুন ২০১৬ শনিবার মিরপুর মজলিস পরিদর্শন করেন। বাদ মাগরীব হতে মিরপুর মসজিদে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে স্থানীয় মজলিসে আমেলার অধিকাংশ সদস্য অংশগ্রহণ করেন। নাযেম আলা, ঢাকা জেলা এবং নায়েব সদরগণ সদর মজলিসের সফর সঙ্গী হিসাবে বৈঠকে যোগদান করেন। সভার শুরুতেই পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন স্থানীয় মোয়াল্লেম মৌ. হাফেজ আবুল খায়ের। এরপর পরিচিতি পর্বে বৈঠকে উপস্থিত স্থানীয় আমেলার সদস্যবৃন্দ, হালকা যয়ীমগণ ও হালকা সায়েকগণ তাদের পরিচয় পেশ করেন। স্থানীয় যয়ীম আলা জনাব আবু জাকির আহমদ চলতি ২০১৬ সালের জন্য গৃহীত মিরপুর মজলিসের বার্ষিক পরিকল্পনা এবং জানুয়ারী থেকে মে পর্যন্ত গত ৫ মাসের বিভিন্ন বিভাগীয় কার্যক্রম ও বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের একটি লিখিত রিপোর্ট পেশ করেন। সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ্ তার বক্তব্যে মিরপুর মজলিসের গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি নও-মোবাইনদের এবং জামাতের/ মজলিসের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্নদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাদের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তোলার আহবান জানান। তিনি সকলকে মসজিদমুখী করার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়নেরও আহবান জানান। এছাড়াও সদর সাহেব বিভিন্ন বিষয়ে সদস্যদের সাথে মত বিনিময় করেন। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম

মরহুম আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব এর একক পুস্তক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ঢাকার উদ্যোগে গত ৩ জুন ২০১৬ শুক্রবার, বাদ জুমুআ মরহুম আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব এর একক পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রদর্শনীতে মরহুমের প্রায় শতাধিক লিখিত পুস্তক ও পুস্তিকার মাঝে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ঢাকা সার্বিক প্রচেষ্টায় ৭৪ টি পুস্তক প্রদর্শিত হয়।

মোহতরম মোবাশ্বের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ দোয়ার মাধ্যমে উক্ত প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন এবং পরিদর্শন শেষে মন্তব্য বইতে তাঁর মূল্যবান মন্তব্য ব্যক্ত করেন। উল্লেখ্য যে, উক্ত প্রদর্শনী বাদ জুমুআ থেকে শুরু হয়ে বিকাল ৫-৩০ মিনিট পর্যন্ত চলে। আশা করি উক্ত প্রদর্শনীর মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের মধ্যে জ্ঞান অন্বেষণ ও চর্চার অভ্যাস সৃষ্টি হবে, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা।

মোহাম্মদ সাইদুর রহমান

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শিক্ষা সফর ও বনভোজন

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে গত ১১ই মার্চ ২০১৬ইং তারিখ রোজ শুক্রবার শিক্ষা সফর ও বনভোজন সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ জলপ্রপাত ও ইকুপার্ক 'মাধবকুন্ড ইকুপার্কে' শিক্ষা সফর ও বনভোজন করা হয়। সকাল ৭.২০মি.-এ মোহতরম আমীর সাহেব-আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দোয়া পরিচালনার পর শহরের টি.এ রোডস্থ কালিবাড়ি মোড় হতে বাস যোগে যাত্রা আরম্ভ হয়। বেলা ১২.০৫মি.-এ আমরা মাধবকুন্ড ইকু পার্কে পৌঁছাই। এরপর ক্ষণিক বিশ্রাম এবং ওযু করার পর চা বাগানের মাঝে জুমুআ নামায এবং আসর নামায বাজামাআত আদায় করা হয়। নামাযের পর দুপুরের খাবার এরপর সরকারি ব্যবস্থায় টিকেট সংগ্রহ করে প্রবেশ করা হয় মাধবকুন্ড ইকু পার্কে। অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ এবং সাফল্যের সাথে শিক্ষা সফর সমাপ্ত হয়। শিক্ষা সফরে ৬জন আনসারসহ মোট ৫৬জন অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া বাংলা নববর্ষ ১৪২৩ পদার্পণ উপলক্ষে গত ১লা বৈশাখ-১৪২৩ বঙ্গাব্দ (১৪ই এপ্রিল ২০১৬) তারিখ মোতাবেক রোজ বৃহস্পতিবার বাদ ফজর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে এক বিরাট ওয়াকারে আমল প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়।

হেদায়তুর রহমান বন্ধন

* শুভ বিবাহ *

গত ২০/১২/২০১৫ তারিখ মোসাম্মৎ তাসলিমা, পিতা- মোহাম্মদ আলী আকবর, সরকার পাড়া, ফুলতলা, জেলা-পঞ্চগড়-এর সাথে মোহাম্মদ আরিখ শেখ, পিতা মৃত ঃ মোহাম্মদ বাহার শেখ, সাগর পাড়া, ঘোড়া মারার বিবাহ ১,০০,০০০/- (একলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর- ১৩৩২/১৬

গত ১১/১২/২০১৫ তারিখ তাবাসসুম রাহাত, পিতা-মাহবুবুর রহমান, ৬০/৩, ব্লক/বি, মিরপুর, পল্লবী, ঢাকার সাথে আবুল খায়ের, পিতা- মরহুম নজরুল ইসলাম, ৮৮/১, সানকি পাড়া, জেলা-ময়মনসিংহ-এর বিবাহ ৩,০০,০০০/- (তিনলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর- ১৩৩৩/১৬

গত ১৩/০১/২০১৬ তারিখ মোসাম্মৎ সাহিদা আক্তার, পিতা- মোহাম্মদ শাহ আলী, গ্রাম-সাতপোয়া, পোষ্ট ও থানা-সরিষাবাড়ী, জেলা-জামালপুর-এর সাথে মোহাম্মদ সালেহ আহমদ, পিতা-মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম, গ্রাম-পুরুলিয়া, পোষ্ট-পুরুলিয়া, থানা-গুরুদাসপুর, জেলা-নাটোর-এর বিবাহ ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর- ১৩৩৪/১৬

গত ০৭/০২/২০১৬ তারিখ মোসাম্মৎ সিমা আক্তার, পিতা- মরহুম নূরুল হোসেন, গ্রাম+ডাকঘর-বাগাবাড়ী, থানা-গাবতলী, জেলা-বগুড়ার সাথে মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম ভুইয়া, পিতা-মরহুম মফিজুল ইসলাম ভুইয়া, গ্রাম-বাসুদেব, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার বিবাহ ১,৫০,০০০/- (একলক্ষ পঞ্চাশ) হাজার টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর- ১৩৩৫/১৬

গত ০৬/০২/২০১৬ তারিখ ফাহাত সুলতানা ইকরা, পিতা-রফিক আহমদ পাটওয়ারী, গ্রাম-চরদুখিয়া, পোঃ গন্ডামারা, থানা-ফরিদগঞ্জ, জেলা-চাঁদপুর-এর সাথে মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন, পিতা- মোহাম্মদ আবদুল জলিল, গ্রাম-শ্রীধরপুর, পোঃ হালিমানগর, কোতয়ালী, জেলা-কুমিল্লার বিবাহ ২,৫০,০০১/- (দুইলক্ষ পঞ্চাশ হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর- ১৩৩৬/১৬

গত ০৬/০২/২০১৬ তারিখ লাকী আক্তার (আমাতুল করীম), পিতা- মরহুম আবদুল খালেক, গ্রাম-উত্তর বাহেরচর, তারা নগর, কেরানীগঞ্জ, জেলা-ঢাকা ১৩১২-এর সাথে আহমদুর রহমান (সুমন), পিতা- মোহাম্মদ আবদুর রব, ১২৩/৫ পশ্চিম দেওভোগ, জেলা- নারায়ণগঞ্জ-এর বিবাহ ২,৫০,০০০/- (দুই পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর- ১৩৩৭/১৬

গত ০৬/০২/২০১৬ তারিখ সিনথিয়া খান প্রিয়া, পিতা-মাহবুব খান, গ্রাম-আহমদনগর, পোঃ ধাক্কামারা, জেলা-পঞ্চগড়-এর সাথে কামরুজ্জামান আকন্দ, পিতা-সামসুজ্জামান আকন্দ, গ্রাম-ডাংগাপড়া, নতুন বন্দর, জেলা-পঞ্চগড়-এর বিবাহ ৮০,০০০/- (আশি হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর- ১৩৩৮/১৬

গত ০৬/০২/২০১৬ তারিখ স্নিগ্ধা রহমান, পিতা-মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, গ্রাম-আহমদনগর, পোঃ ধাক্কামারা, জেলা-পঞ্চগড়-এর সাথে তানভীর আহমদ তারেক, পিতা-মোহাম্মদ মেহেরুল ইসলাম, আশুলিয়া, ঢাকার বিবাহ ১,৫০,০০০/- (একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর- ১৩৩৯/১৬

গত ২৫/০২/২০১৬ তারিখ ফারজানা ইয়াহিয়া, পিতা-ইয়াহিয়া আহমদ, আবেদ টাওয়ার, আশকোনা, ঢাকার সাথে তানভীর হাসান, পিতা- আবদুল কুদ্দুস, ২১৩/৩২ মধ্য বুরোলিয়া, জেলা-গাজীপুর-এর বিবাহ ২,৪০,০০০/- (দুইলক্ষ চাল্লিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর- ১৩৪০/১৬

গত ২৯/০৮/২০১৫ তারিখ ফারজানা আহমদ মুন, পিতা-শরীফ আহমদ পাটওয়ারী, দক্ষিণ মুড়াইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাথে মোহাম্মদ বদরুল ইসলাম, পিতা-মৃত: আবদুল রাজ্জাক, গ্রাম+পোঃ+থানা তাহেরপুর, জেলা সুনামগঞ্জ-এর বিবাহ ২০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর- ১৩৪১/১৬

গত ২৮/০১/২০১৬ তারিখ খাদিজা বেগম তুষ্টি, পিতা-মরহুম তাহের আহমদ প্রধান, ৯/৩ নবাব সলিমুল্লাহ্ রোড, মিশনপাড়া, নারায়ণগঞ্জ-এর সাথে মওলানা নাভিদুর রহমান, মুরব্বী সিলসিলা, পিতা-মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, মুরব্বী সিলসিলা, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ এর বিবাহ ৮৫,০০০/- (পচাশি হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর- ১৩৪২/১৬

গত ১৭/১২/২০১৫ তারিখ সাদিয়া সুলতানা, পিতা-আলী আহমদ, হালুয়া পাড়া, কটিয়াদী, জেলা-কিশোরগঞ্জ-এর সাথে মাহমুদ বিন কাশিম, পিতা- জি, এম, আবুল কাশেম, ১৫/১ দারুল ফজল, নিরালা আবাসিক এলাকা, খুলনার বিবাহ ৩,০০,০০০/- (তিনলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর- ১৩৪৩/১৬

গত ১২/১০/২০১৫ তারিখ মিনা পারভীন, পিতা- ইসহাক সরদার, গ্রাম-মীরগাং, পোঃ যতীন্দ্রনগর, উপজেলা- শ্যামনগর, জেলা সাতক্ষীরার সাথে আবদুল আলীম শেখ, পিতা- ছাকাত শেখ, গ্রাম-মীরগাং, পোঃ যতীন্দ্রনগর, উপজেলা- শ্যামনগর, জেলা সাতক্ষীরার বিবাহ ৩৮, ০০০/ (আটত্রিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর- ১৩৪৪/১৬

গত ০৩/০৪/২০১৬ তারিখ রাবেয়া বশরী (নুপুর), পিতা- মোহাম্মদ মোতালেব শেখ, ডুমরিতলা, পোঃ শারিকতলা, উপজেল+জেলা-পিরোজপুর-এর সাথে জি, এম, রাকিবুল হাসান, পিতা- জি, এম, ফজলুল হক, গ্রাম+পোঃ যতীন্দ্রনগর, উপজেলা- শ্যামনগর, জেলা-সাতক্ষীরার বিবাহ ৯৯,৯৯৯/- (নিরানব্বই হাজার নয়শত নিরানব্বই) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর- ১৩৪৫/১৬

গত ২৬/০২/২০১৬ তারিখ তনিমা পারভীন, পিতা-মোহাম্মদ আবদুল লতিফ সরকার, স্টেডিয়াম রোড, জেলা-সিরাজগঞ্জ-এর সাথে মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ, পিতা-মৃত মোহাম্মদ নিযামুল হক, পেস্তক কুড়া, কামারখন্দ, জেলা-সিরাজগঞ্জ এর বিবাহ ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর- ১৩৪৬/১৬

গত ০৫/০৩/২০১৫ তারিখ শাহানা পারভীন, পিতা-জি, এম খতিবউদ্দিন, গ্রাম ও পোঃ যতীন্দ্রনগর, উপজেলা-শ্যামনগর, জেলা-সাতক্ষীরার সাথে মোহাম্মদ সোহেল মিয়া, পিতা- আলহাজ্জ মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন, গ্রাম-ইস্পিদারপুর, থানা-বারহাট্টা, জেলা-নেত্রকোনার বিবাহ ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর- ১৩৪৭/১৬

গত ১০/০৪/২০১৬ তারিখ মোসাম্মৎ খায়রুননেছা, পিতা-খলিলুর রহমান ফকির, গ্রাম-পার্শেখালী, পোঃ যতীন্দ্রনগর, উপজেলা-শ্যামানগর, জেলা-সাতক্ষীরার সাথে জি, এম, ফরহাদ হোসেন, পিতা-জি, এম, আতাউর রহমান, গ্রাম ও পোঃ যতীন্দ্রনগর, উপজেলা-শ্যামনগর, জেলা-সাতক্ষীরার বিবাহ ১,৯৯,৯৯৯/- (এক লক্ষ নয় হাজার নয়শত নিরানব্বই) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর- ১৩৪৮/১৬

গত ২২/০৪/২০১৬ তারিখ সাদিয়া আহমদ (শ্রাবনী), পিতা-আলী আহমদ, গ্রাম-সুলতানপুর, পোঃ চরসিন্দুর, থানা-পলাশ, জেলা-নরসিংদীর সাথে কামরুল হাসান, পিতা-মোহাম্মদ লাল মিয়া, গ্রাম ও পোঃ তারুয়া, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিবাহ ৬,০০,০০০/- (ছয়লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর- ১৩৪৯/১৬

গত ২৫/০৩/২০১৬ তারিখ তামান্না, পিতা-হাফেজ মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান, গ্রাম-ও পোঃ কাটাখালী, থানা-নলছিটি, জেলা-ঝালকাঠির সাথে নাসের আহমদ, পিতা-বাহাউদ্দিন আহমদ, বি.এ.ডি.সি. কোয়ার্টার, বরিশাল সদর এর বিবাহ ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর- ১৩৫০/১৬

গত ০১/০৪/২০১৬ তারিখ আতিকা মাহমুদ (শারমিন), পিতা-মুহাম্মদ হাসান, ৪৬ কাটা পাহাড়, টেরি বাজার, চট্টগ্রাম-এর সাথে জাভেদ আহমদ (নয়ন), পিতা-নাসির আহমদ, উত্তর আহমদীপাড়া (কান্দিপাড়া), ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিবাহ ২,৮০,০০০/- (দুইলক্ষ আশি হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর- ১৩৫১/১৬

গত ০৮/০৪/২০১৬ তারিখ সানিয়া আমান (তিশা), পিতা- আমানুল্লাহ্ মামুন, তেবাড়িয়া, নাটোর-এর সাথে মোহাম্মদ আবদুল হাফিজ আনছারুজ্জামান (টিটু), পিতা-মোহাম্মদ আব্দুস সামাদ, ছোট কুপট, পোঃ নওবেকী, জেলা-সাতক্ষীরার বিবাহ ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর- ১৩৫২/১৬

গত ১৪/০৪/২০১৬ তারিখ জান্নাতুল ফেরদৌস সীমা, পিতা-মোহাম্মদ মজনু মিয়া, গ্রাম-কামার্থী, পোঃ কালীহাতী, জেলা-টাঙ্গাইল-এর সাথে মোহাম্মদ খুরশীদ আলম, পিতা-ইসমাইল হোসেন, চাঁনতারা, ঘাটাইল, জেলা-টাঙ্গাইল-এর বিবাহ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর- ১৩৫৩/১৬

গত ১/০৪/২০১৬ তারিখ জেসমিন আক্তার, পিতা-মরহুম ফিরোজ আহমদ, উত্তর আহমদীপাড়া, পোঃ+জেলা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাথে মুহাম্মদ পারভেজ, পিতা- মুহাম্মদ আলী, বাইতুল বাসেত, চকবাজার, চট্টগ্রাম এর বিবাহ ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর- ১৩৫৪/১৬

গত ৪/০৩/২০১৬ তারিখ ইশরাত জাহান ইভা, পিতা-এস.এম. জামান, ঘাটুরা, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাথে পাপেল আহমদ, পিতা-মরহুম মিজান মিয়া, ৪৫৪, কান্দিপাড়া, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিবাহ ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর- ১৩৫৫/১৬

গত ২৯/০৪/২০১৬ তারিখ রিপা খাতুন, পিতা- শফিকুল হোসেন মুকুল, কাফুরিয়া, জোলার পাড়া, জেলা নাটোর-এর সাথে এনামুল হক, পিতা-মৃত আজিজুল হক, গ্রাম-নল দাইর, সরিষাবাড়ী, জেলা-জামালপুর এর বিবাহ ১,২০,০০০/- (এক লক্ষ বিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর- ১৩৫৬/১৬

গত ২০/০৫/২০১৬ইং তারিখ রোজ শুক্রবার আমাদের কন্যা মোছাঃ খাদিজা সুলতানা, পিতা-মনিরুজ্জামান খন্দকার, মাতা-শামীমা সুলতানা, ৮২০, দক্ষিণ মৌড়াইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাথে জনাব হাসিব রহমান পিতা- মোহাম্মদ হেলালুল হক, ১০২ তেজতুরী বাজার, ঢাকা-১২১৫-এর বিবাহ ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা মোহরানায় দারুত তবলীগ মসজিদ কমপ্লেক্সে সুসম্পন্ন হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত বিয়ের এলান করান, শেখ মোস্তাফিজুর রহমান, মুরব্বী সিলসিলাহ্।

নবদম্পতি এবং দুই পরিবারের সুসম্পর্কের জন্য জামা'তের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট খাসভাবে দোয়ার আবেদন করছি।

মিনিরুজ্জামান খন্দকার ও
শামীমা সুলতানা
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

একজন একনিষ্ঠ ধর্মসেবকের প্রয়াণ

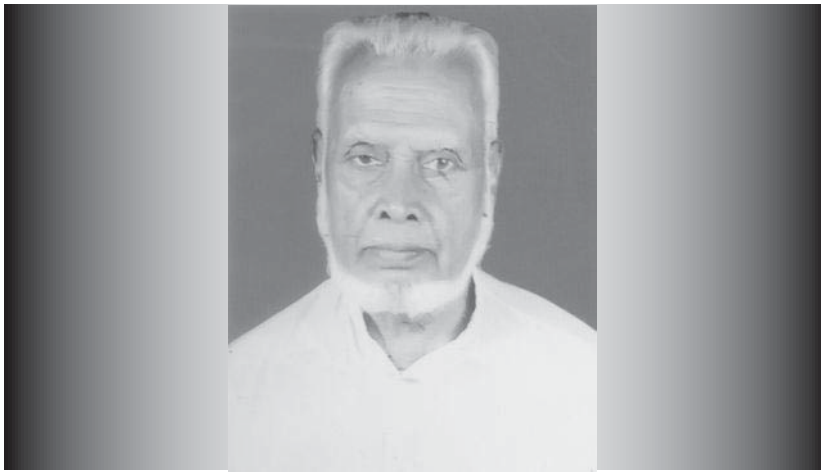

ঢাকা জামাতের মতিঝিল হালকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জনাব আবদুল কাদির ভূঁইয়া বিগত ১৫ মে ২০১৬ ইসাব্দ রোজ রবিবার ভোর ৪ঃ০০ টায় ঢাকা মহানগরীর শাহজাহানপুরস্থ নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন জটিলতায় ভুগছিলেন। সেই দিনই অপরাহ্ন ১টা ৩০ মিনিটে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের কেন্দ্র দারুত তবলীগে মরহুমের জানাযার নামায মুফতি সিলসিলাহ্ মোহতরম মাওলানা মুবাশ্বের আহমদ কাহলুন সাহেব পড়িয়েছেন। উক্ত জানাযায় কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত শূরার প্রোগ্রামে যোগদানকারী সকল স্থানীয় জামাতের প্রতিনিধিবৃন্দও শামিল ছিলেন।

মরহুম পবিত্র কুরআনের একজন আশেক এবং নামায আদায়ে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী সাহেবের প্রণীত তফসীরের অনুবাদ পাঠকালে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ইসলাম সেবার অবদান সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত হন আর পরবর্তিতে সেই জানার ধারাবাহিকতায় সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে বয়আ'ত গ্রহণ করে আহমদীয়া মুসলিম জামাতে অন্তর্ভুক্ত হন।

মরহুম অত্যন্ত নেক এবং সর্বজন প্রশংসিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি যুগখলিফা ও নেযামের আনুগত্যকারী একজন সেবক ছিলেন। জামাতের যে কোন নির্দেশনা তিনি হাসিমুখে আমল করতেন। ইবাদতে তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ। নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তেন। দুই বার হজ্জ পালন করার সৌভাগ্য লাভ করেন, আর একবার তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর রওজা মুবারক জিয়ারতের উদ্দেশ্যে কাদিয়ান গমন করে জলসায়ও যোগদান করেন। আহমদীয়া জামাতে দাখিল হওয়ার পর থেকে অসুস্থ হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি প্রতি রমজানে বিনা ব্যতিক্রমে নিয়মিতভাবে ই'তিকাফে বসতেন।

তিনি ঢাকা জামাতের মতিঝিল হালকা প্রতিষ্ঠার পর থেকে একটানা প্রায় দুই দশক ধরে উক্ত হালকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা আদায়সহ উক্ত হালকার আহমদী পরিবারের প্রতিটি সদস্যের সাথে ব্যক্তিগত ভাবে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমে সকলের সাথে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং বিভিন্ন জামাতী প্রোগ্রামে সকলের অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে হালকাকে একটি আদর্শ হালকায় উন্নীত করেন।

উক্ত দায়িত্বের পাশাপাশি তিনি জামাতের স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিভিন্ন দায়িত্বাবলী অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। তিনি ১৯৭৭ থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত এবং ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত মজলিস আনসারুল্লাহ, ঢাকা-এর জয়ীম-এ-আলা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া, তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর এডিশনাল সেক্রেটারী, ইশলাহ ও ইরশাদ; ন্যাশনাল সেক্রেটারী, রিশতানাতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়াও তিনি দীর্ঘদিন বাংলাদেশ মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র কায়েদ উমুমীর দায়িত্বও পালন করেছেন।

মৃত্যুকালে মরহুম ৪ মেয়ে, ১ ছেলে এবং ১০ জন নাতি-নাতনীসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে যান। ব্যক্তিজীবনে তিনি অতিথিপরায়ণ, প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার, পরোপকারী, নেক ও সাদা মনের একজন মানুষ ছিলেন।

তিনি একজন ওসীয়্যতকারী ছিলেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে অবস্থিত জামাতের নিজস্ব কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

মহান আল্লাহ তা'লা তাঁর সকল নেক কাজ কবুল করুন এবং জান্নাতের সুশীতল ছায়াতলে স্থান দান করুন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদেরকে ধৈর্য ধারণ করার শক্তি দান করুন এবং তাঁর প্রজন্মধারায় নেক আমলগুলোর প্রজ্ঞা যেন জারি থাকে সেজন্য আল্লাহ্ তা'লার আশিস কামনা করে সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

দোয়াপ্রার্থী
ইব্রাহীম খলীল ভুঁইয়া (মরহুমের পুত্র)
৩৬১, উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা

দৈনন্দিন জীবনের টুকিটাকী

সুস্থ থাকার সহজ উপায়

রোযার মাসে সুস্থ থাকার জন্য খুব বেশি তৎপরতার প্রয়োজন নেই। সাধারণ কিছু বিষয় খেয়াল রাখলেই শারীরিকভাবে সুস্থ থাকা যায়।

এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের 'খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান' বিভাগের প্রধান ফারাহ মাসুদা বলেন, "রমযানে কেবল মাত্র খাবারের বিষয়েই সচেতন থাকলে হয় না, পাশাপাশি শরীরের প্রতি যত্নবান ও যথেষ্ট বিশ্রাম নিতে হয়।"

তিনি আরও বলেন, "রমযান মাসে ভালো ডায়েট চার্টের পাশাপাশি বিশ্রাম একান্ত প্রয়োজন। আর মানতে হবে কিছু নিয়ম।"

* রোযা রেখে কোনোভাবেই অধিক শারীরিক পরিশ্রম করা যাবে না।

* যারা নিয়মিত শরীরচর্চা করেন, তাদেরকে এই সময়ে তা বাদ দিতে হবে। এর পরিবর্তে হালকা যোগ ব্যায়াম করা ভালো।

* ইফতারের পর থেকে প্রচুর পানি ও ফল খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

* যথেষ্ট বিশ্রাম নিতে হবে। তাই বলে শুয়েবসে দিন কাটানো যাবে না। হালকা চলাফেরা ও ঘরের কাজ নিজ থেকেই করা উচিত। তা না হলে ওজন বাড়ার সম্ভাবনা থাকে।

* ইফতারের সময় তাড়াহুড়া করে বেশি খাওয়া যাবে না।

* সম্ভব হলে ইফতারের পরে কমপক্ষে ৩০ মিনিট হাঁটাহাঁটির অভ্যাস গড়ে তোলা।

* সেহেরি ও ইফতারে সুষম খাবার খাওয়া।

* রোযা রেখে যারা কেনাকাটা করতে যাবেন তাদের বিশেষভাবে নিজের শরীরের প্রতি যত্নবান হওয়া দরকার। একদিনে অনেক ঘুরে কেনাকাটা না করে সম্ভব হলে দু'তিন দিনে কেনাকাটা করা ভালো। এতে শরীরের উপর চাপ কম পড়বে।

* রোযার মাসে অনেকেরেই ঘুমে সমস্যা হয়ে থাকে। ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়। এক্ষেত্রে প্রচুর পানি পান, হালকা ব্যায়াম ও তেলমুক্ত খাবার সবচেয়ে ভালো পথ্য।

* সুস্থ থাকার আরেকটি সহজ উপায় হল হাসিখুশি থাকা। এতে মন ভালো থাকে ফলে শরীরও ভালো থাকে। পরনিন্দা, পরচর্চা থেকে দূরে থাকলে মানুষের মন ও শরীর দুটোই ভালো থাকে।

সুস্থ থাকার আরেকটি সহজ উপায় হল হাসিখুশি থাকা। এতে মন ভালো থাকে ফলে শরীরও ভালো থাকে। পরনিন্দা, পরচর্চা থেকে দূরে থাকলে মানুষের মন ও শরীর দুটোই ভালো থাকে।

* সুস্থ্যতার জন্য ধূমপান করা থেকে বিরত থাকাটা খুব প্রয়োজন।

এছাড়াও নিজের ঘরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে, অন্যের প্রতি কোনো রকম রাগ পোষণ না করে। মোটকথা আত্মসংযমের মাধ্যমে মানসিক ও শারীরিক দুভাবেই সুস্থ থাকা যায়।

(সূত্র: বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম)

অতিরিক্ত লবণ খেলে হতে পারে ভয়ঙ্কর ২টি রোগ

অতিরিক্ত পরিমাণ লবণ খেয়ে সারা পৃথিবীতে হৃদ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন বহু মানুষ। নতুন এক গবেষণার রিপোর্ট অনুযায়ী পৃথিবীতে প্রত্যেক বছর ১৬ লক্ষেরও বেশি মানুষ মারা যান অতিরিক্ত শরীরে অতিরিক্ত সোডিয়াম জমা হওয়ায়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্ধারিত পরিমাণ অনুযায়ী দিনে ২ গ্রামের বেশি লবণ খাওয়া উচিৎ নয়। গবেষকরা ১৮৭টি দেশের সাধারণ মানুষের উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন বহু ক্ষেত্রেই দিনে এর থেকে বেশি পরিমাণ লবণ খেয়ে থাকেন তারা।

অতিরিক্ত পরিমাণ লবণ উচ্চ-রক্তচাপের অন্যতম কারণ। উচ্চ-রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয় স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা।

গবেষক সারা পৃথিবী জুড়ে ২০৫টি সমীক্ষা করে দেখেছেন একজন মানুষ গড়ে প্রতিদিন প্রায় ৩.৯৫ গ্রাম লবণ খেয়ে থাকেন। অর্থাৎ যা নির্ধারিত পরিমাণের প্রায় দ্বিগুণ।

মধ্য এশিয়ায় লবণ খাওয়ার প্রবণতা সবথেকে বেশি। এই অঞ্চলের কোনও ব্যক্তি দিনে গড়ে প্রায় ৫.৫১ গ্রাম লবণ খেয়ে থাকেন।

(তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট)

খালি পেটে যে খাবারগুলো ভুলেও খাবেন না

সকালে পেট ভরে খাওয়া উচিত। কিন্তু খালি পেটে সব ধরনের খাবার খাওয়া উচিত নয়।

এমনই কিছু খাবার আছে যা খুব উপকারী হলেও খালি পেটে খাওয়া শরীরের জন্য ক্ষতিকর। জেনে নিন এমন কিছু খাবার যেগুলো ভুলেও খালি পেটে খাওয়া উচিত না-

কলা: তাৎক্ষণিক শক্তি জোগান দেয়ার জন্য কলার জুড়ি মেলা ভার। কলার অনেক পুষ্টিগুনও রয়েছে। কিন্তু খালি পেটে কখনো কলা খাবেন না। খালি পেটে কলা খেলে শরীরে ম্যাগেনসিয়ামের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে রক্তে ম্যাগনেসিয়াম এবং ক্যালসিয়ামের মাত্রায় অস্বাভাবিক তারতম্য ঘটে, যার ফলে শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়ার সম্ভাবনা থাকে।

দুধ এবং সোয়াবিন মিল্ক: দুধ হোক অথবা সোয়াবিন মিল্ক। এতে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন থাকে। কিন্তু খালি পেটে খেলে দুধে থাকা প্রোটিন আমাদের শরীর পুরোমাত্রায় গ্রহণ করতে পারে না। ফলে, খালি পেটে দুধ খেলে সবসময়ে পাউরুটি, বিস্কুটের সঙ্গে খাবেন।

চা এবং কফি: সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পরে এক কাপ চা অথবা কফি না খেলেই নয়। কিন্তু কখনো খালি পেটে এই চা-কফি খাবেন না। কারণ, চা-এর মধ্যে অ্যাসিডের উপস্থিতি যথেষ্ট বেশি পরিমাণে থাকে। আর কফিতে থাকে ক্যাফেইন। খালি পেটে খেলে এই অ্যাসিড এবং ক্যাফেইন পাকস্থলীর আস্তরণের ক্ষতি করে দেয়। ফলে আর কিছু না হোক, খালি পেটে চা অথবা কফি খাওয়ার আগে অন্তত এক গ্লাস পানি খেয়ে নেবেন।

মশলাদার খাবার: হয়তো আপনি জানেন। কিন্তু তাও আপনাকে আমরা মনে করিয়ে দিচ্ছি। খালি পেটে মশলাদার খাবার শরীরের পক্ষে অনেক ক্ষতিকর। আর মশলাদার খাবারের পরিণতি অনেক ভয়ঙ্কর হতে পারে। খালি পেটে মশলাদার খাবার খেলে পাকস্থলীর স্বাভাবিক অ্যাসিডগুলির উপর প্রভাব পড়ে। এমনকী পাকস্থলীতে অ্যাসিডিক প্রতিক্রিয়াও হতে পারে। যার কারণে পেটে টান ধরা বা ব্যথা হতে পারে।

সোডা বা কোল্ড-ড্রিংক: সোডা বা কোল্ড-ড্রিংকে যে চিনি বা আর্টিফিশিয়াল সুইটনার থাকে, খালি পেটে খেলে সেগুলি শরীরের পক্ষে যথেষ্টই ক্ষতিকারক হতে পারে। কারণ, এই আর্টিফিশিয়াল সুইটনারের মধ্যে বিভিন্ন কার্বোনেটেড অ্যাসিডস থাকে, যেগুলি পাকস্থলীর অ্যাসিডের সঙ্গে মিশে গিয়ে পেট গোলানো অথবা বমি, বমি ভাব এবং বুক-জ্বালাও শুরু হতে পারে।

টমেটো: টমোটো খালি পেটে খাওয়া হলে এর মধ্যে বিদ্যমান এসিড গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল এসিডের সাথে মিশে পাকস্থলির মধ্যে বিক্রিয়া করে এক ধরনের অদ্রবণীয় জেল তৈরি করে, যা পাকস্থলিতে পাথর হওয়ার কারণ হতে পারে।

ঔষধ: কিছু কিছু গ্যাসট্রিকের ঔষধ খাওয়ার আগে খেতে বলা হয়। তবে অধিকাংশ ঔষধ ভরা পেটে খাওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। খালি পেটে ঔষধ খাওয়া পাকস্থলির জন্য খুব ক্ষতিকর। তাই খালি পেটে ঔষধ খাবেন না।

মদ্যপান: মদ্যপান শরীরের জন্য ক্ষতিকর। আর খালি পেটে মদ্যপান আরো ক্ষতিকর। মদের মধ্যে যেসব উপাদান রয়েছে সেগুলো অন্ত্রের জ্বালাভাব তৈরি করে।

ঝাল জাতীয় খাবার: আমরা অনেকেই ঝাল জাতীয় খাবার খেতে ভালোবাসি, তবে খালি পেটে ঝাল জাতীয় খাবার খাওয়া ঠিক নয়। এর ফলে এসিডিক বিক্রিয়া হয়ে পেট জ্বালাভাব তৈরি হয়।

দই: দইয়ের প্রোবায়োটিক উপাদান স্বাস্থ্যকর। তবে যদি এটা খালি পেটে খাওয়া হয় তবে স্বাস্থ্যকর নয়। দইয়ে থাকা ভালো ব্যাকটেরিয়া পাকস্থলির আবরণের রসের সাথে মিশে পেটকে খারাপ করতে পারে।

কলা: খালি পেটে কলা খাওয়া হঠাৎ করে শরীরে ম্যাগনেসিয়াম বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে রক্তে ম্যাগনেসিয়াম এবং ক্যালসিয়ামের ভারস্যাম্য নষ্ট করে। তাই কলা খালি পেটে না খাওয়ার পরামর্শই দেন বিশেষজ্ঞরা।

মিষ্টি আলু: আপনি কি জানেন মিষ্টি আলুর মধ্যে রয়েছে ট্যানিন এবং পেকটিন? এটা বেশি পরিমাণে এসিড নিঃসরণ করে পাকস্থলির দেয়ালকে সংকুচিত করে। এর ফলে বুক জ্বালাপোড়া হয়।

(তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট)

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ

হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত গত ১৭ জুন ২০১৬ জুমুআর খুতবার সংক্ষিপ্তরূপ।

গত ১৭ই জুন, ২০১৬ রোজ শুক্রবার হুযূর আনোয়ার (আই.) লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত জুমুআর খুতবার শুরুতে হুযূর (আই.) সূরা বাকারার ১৮৭ নাম্বার আয়াত পাঠ করেন।

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٧﴾

অর্থাৎ, আর আমার বান্দারা যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তখন (বল), 'নিশ্চয় আমি (তাদের) নিকটেই আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেই যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে। সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে যাতে তারা সুপথ প্রাপ্ত হয়।'

হুযূর বলেন, রোযা এবং রোযার বিধি-বিধান সম্পর্কিত আয়াতগুলোর মাঝখানে এ আয়াতটি রেখে আল্লাহ্ তা'লা রমযান এবং দোয়া গৃহীত হওয়ার মাঝের গভীর সম্পর্কের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এ সম্পর্কের ব্যাপারে বলেন, 'এ আয়াতটিকে এখানে রেখে আল্লাহ্ এ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, রোযার মাস তাক্বওয়া শেখা এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাস'।

হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, এ মাসে শয়তানকে শৃংখলাবদ্ধ করা হয় এবং আল্লাহ্ মানুষের আরও নিকটবর্তী হয়ে যান। কিন্তু মনে রাখা উচিত, শয়তান শুধুমাত্র তাদের জন্য শৃংখলাবদ্ধ হয় যারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে এবং তাঁর ডাকে সাড়া দেওয়ার চেষ্টা করে। আল্লাহ্ বলেছেন, তিনি আমাদের প্রার্থনার উত্তর দেন এবং তিনি আমাদের নিকটেই রয়েছেন কিন্তু শর্ত হল, 'বান্দাও যেন তাঁর ডাকে সাড়া দেয় এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনে'।

হুযূর (আই.) বলেন, যারা বলে, আমরা দোয়া করি কিন্তু তাকবুল হয় না তাদের উচিত আত্মজিজ্ঞাসা করা, তারা সত্যিতার অর্থেই আল্লাহ্‌র ডাকে সাড়া দিচ্ছে কি-না? আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনে তারা কতটা সচেষ্ট।

দোয়া গৃহীত হওয়ার লক্ষ্যে যেসব শর্ত রয়েছে সে সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, 'প্রথমতঃমানুষ যদি নিজেদের মাঝে তাক্বওয়া এবং খোদাভীতি সৃষ্টি করতে পারে তাহলে আল্লাহ্ তাদের দোয়া শোনেন। দ্বিতীয়তঃ এ বিষয়ের ওপর বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ্ তা'লা মওজুদ আছেন এবং তাঁর সব শক্তির ওপর ঈমান রাখে। সে আল্লাহ্‌র শক্তির প্রমাণ পাক বা না পাক উভয় অবস্থাতেই তাঁর সত্তায় ঈমান রাখতে হবে। অর্থাৎ, অদৃশ্যের ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে। যদি মানুষের ঈমান এরূপ হয় তাহলে সে তার প্রার্থনার উত্তর পাওয়ার অভিজ্ঞতাও লাভ করবে।

এরপর হুযূর (আই.) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বেশ কিছু উক্তি তুলে ধরে দোয়ার দর্শন এবং দোয়া গৃহীত হওয়ার বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে, অনেকে মনে করে তারা যা দোয়া করে তাই গৃহীত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু এক্ষেত্রে খোদার বিধান হল, আল্লাহ্ আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার অধীন নন। অনেক সময় মানুষ এমন কিছু চায় যা তার জন্য ক্ষতিকারক। মানুষের জ্ঞান সীমিত, সে তার পরিণাম সম্পর্কে অনবহিত, সে জানে না সে কি চাচ্ছে কিন্তু আল্লাহ্‌র জ্ঞান পরিপূর্ণ এবং আল্লাহ্ আমাদের পরিণাম সম্পর্কেও জ্ঞাত। যখন কোন দোয়া গ্রহণ করা মানুষের জন্য ক্ষতির কারণ হয় তখন আল্লাহ্ সে দোয়াতিনি শোনেন না। আর এটি দোয়া গৃহীত হওয়ারই অপর নাম। উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, যদি কোন সন্তান মায়ের কাছে ধারালো ছুড়ি হাতে নেওয়ার বায়না ধরে বা জ্বলন্ত অঙ্গারে হাত দিতে চায় আর এজন্য সে কান্নাকাটিও করতে থাকে তারপরও কোন মা কি নিজ সন্তানকে এমনটি করতে দিবেন? দোয়ার ফলেও যা মানুষের জন্য কল্যাণকর তাই আল্লাহ্ দেন এবং অকল্যাণকে দূরে সরিয়ে রাখেন।

এরপর হুযূর বলেন, প্রত্যেকের উচিত সে যেন আল্লাহ্‌র ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে এবং দোয়ার পাশাপাশি বাহ্যিক উপায় উপকরণ এবং শক্তি-সামর্থ্য কাজে লাগানোরও চেষ্টা করে। যদি কেউ কোন কাজ করার চেষ্টা না করে শুধু দোয়াই করতে থাকে তাহলে সে আল্লাহ্‌র পরীক্ষা নেয়। এ কারণে প্রথমে নিজের চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং বিশ্বাসকে সঠিক করা আবশ্যক। অনেকে বলে, দোয়া করলে অন্যান্য উপায়-উপকরণ বা চেষ্টা-প্রচেষ্টারপ্রয়োজন কি? প্রকৃতপক্ষে দোয়াও এক প্রকার উপকরণ। দোয়ার ফলে আল্লাহ্ এমন উপায়-উপকরণ সৃষ্টি করেন যা দোয়া গৃহীত হওয়ার কারণ হয়।

দোয়ার দর্শনতিনি বলেন, একটি শিশু ক্ষুধার তাড়নায় যখন চিৎকার করে তখনআপনা-আপনি মায়ের বুকে দুধ এসে যায়। দোয়া সম্পর্কে শিশুটি কোন জ্ঞান না রাখলেও সে মূলতঃ দোয়াই

করে। কেননা সে খোদা প্রদত্ত গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগায়। চাওয়া মানুষের বৈশিষ্ট্য আর দেয়া আল্লাহ্‌র বৈশিষ্ট্য। রহমানিয়্যত ও রহীমিয়্যত পৃথক কিছু নয়। অর্থাৎ, রহমান খোদা আমাদেরকে কাজ এবং চেষ্টা করার শক্তি দিয়েছেন। যখন মানুষ রহমান খোদা প্রদত্ত শক্তির মাধ্যমে চেষ্টা করে তখন খোদার রহীম বৈশিষ্ট্য তাকে তার চেষ্টার ফল দেন। যে রহমানীয়্যতকে বাদ দিয়ে রহীমিয়্যত থেকে অংশ পাওয়ার চেষ্টা করবে সে কখনও সফল হবে না।

হুযূর বলেন, প্রকৃতির মাঝেও দোয়া কবুলের নিদর্শন রয়েছে। এ কারণে আল্লাহ্ আমাদের দোয়া শিখিয়েছেন, আমাদের সরল সোজা পথে পরিচালিত কর। কিন্তু এর আগে এই স্বীকারোক্তি, অর্থাৎ আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি রেখে এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, সরল ও সুদৃঢ় পথে পরিচালিত হওয়ার জন্য নিজের সব শক্তি-সামর্থ্যকে কাজে লাগাও, এরপর সাহায্য যাচনা করো।

অনেকে বলে, দোয়া করে কোন লাভ হয় না, তারা একেবারেই ভুল কথা বলে। যদি আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে এবং তাঁর শক্তির ওপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকত তবে একথা তারা কখনও বলত না। হুযূর এখানে একটি ফার্সীপঙতি পাঠ করেন যার অর্থ হল, 'যদি ভালোবাসার মানুষ তার দিকে ফিরেও না তাকায় তাহলে সে আবার কেমন প্রেমিক'। খোদা তা'লা চান, তোমরা যেন তাঁর কাছে যাও। তবে, শর্ত হল তোমাদেরকে নিষ্ঠার সাথে যেতে হবে।

খোদার প্রতি যদি সত্যিকার ভালোবাসা থাকে তবে তিনি অবশ্যই দোয়া শুনবেন। সত্যিকার ভালোবাসা সৃষ্টির পদ্ধতি সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,একথা সত্যি যে,'খুলিকাল ইনসানু যাঈফা' অর্থাৎ, মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষের সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্যকে পরিপূর্ণতা দেয়ার জন্য আল্লাহ্‌র কৃপা ও দয়ার প্রয়োজন। মানুষ যত বেশি নিজের দুর্বলতা, অপূর্ণতা ও ঘাটতিকে অনুধাবন করতে পারবে তত বেশি তার মধ্যে দোয়া করার অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হবে। মানুষ বিপদের সময় তার অসহায়ত্বের কারণে যেভাবে আল্লাহ্‌র দরবারে কেঁদে কেঁদে দোয়া করে তেমনি ভাবে সে যদি তার দুর্বলতা ও ঔদাসীন্যের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে কেঁদে কেঁদে দোয়া করে তবে আল্লাহ্ তার সব দুর্বলতা দুর করে দিবেন।

সবচেয়ে প্রথম মানুষের নিজের ধর্ম রক্ষা ও ধর্মের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য দোয়া করা উচিত। মানুষ যদি সত্যিকার অর্থেই তওবা করে তাহলে আল্লাহ্‌ও সেসব অঙ্গীকার পূর্ণ করেন যেসব অঙ্গীকার তিনি তওবাকারীদের সাথে করেছেন।

এরপর হুযূর বলেন, সবচেয়ে প্রথম মানুষের নিজের ধর্ম রক্ষা ও ধর্মের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য দোয়া করা উচিত। মানুষ যদি সত্যিকার অর্থেই তওবা করে তাহলে আল্লাহ্‌ও সেসব অঙ্গীকার পূর্ণ করেন যেসব অঙ্গীকার তিনি তওবাকারীদের সাথে করেছেন।

খুতবার শেষে হুযুর (আই.) আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের জন্য হযরত মসিহ্ মাওউদ (আ.) একটি দোয়া উল্লেখ করেন। রোযার মাসের দিনগুলোতে বিশেষ ভাবে এ দোয়াটি করা উচিত। দোয়াটি হল;

হে বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক! আমি তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা জানি না। তুমি পরম দয়ালু ও কৃপালু আর আমার প্রতি তোমার সীমাহীন অনুগ্রহ রয়েছে। আমার অপরাধ ক্ষমা কর যাতে আমি ধ্বংস হয়ে না যাই। আমাদের হৃদয়ে তোমার বিশুদ্ধ ভালোবাসা সৃষ্টি করো যাতে আমি জীবন লাভ করি। আমার দুর্বলতা ঢেকে রাখ। আমাকে দিয়ে এমন কাজ করাও যদ্বারা তুমি সন্তুষ্ট হবে। আমি তোমার দয়ার দোহাই দিয়ে সেই বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি যাতে তোমার ক্রোধ আমার ওপর বর্ষিত না হয়। করুণা কর আর ইহ ও পরকালের বিপদাপদ থেকে আমাকে রক্ষা কর। সব ধরনের কৃপা ও দয়া তোমারই হাতে রয়েছে। আমীন সুম্মা আমীন।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দোয়ার দর্শন বুঝে এই পবিত্র রমযানে বেশি বেশি তাঁর ইবাদত ও দোয়া করার তৌফিক দিন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ভারতের উদ্যোগে হিমাচল প্রদেশে আয়োজিত আন্তঃধর্মীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ২৪ এপ্রিল ২০১৬ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ভারতের উদ্যোগে হিমাচল প্রদেশে একটি আন্তঃধর্মীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন ধর্মের চিন্তাবিদগণ এতে বক্তব্য রাখেন। সমাজে শান্তি বজায় রাখার জন্য প্রত্যেক ধর্ম কি শিক্ষা দেয়, সে সম্পর্কে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিজ্ঞ আলেম মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর জীবন চরিত তুলে ধরেন। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে আমরা আমাদের দায়িত্ব কতটুকু পালন করতে পারছি তাও তার আলোচনায় উঠে আসে। চলমান সংকট ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সত্যিকার ইসলাম আমাদের কি শিক্ষা দেয় এ প্রসঙ্গে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) ও তাঁর খলীফা কি বলেছেন তা পড়ে শুনানো হয়। এ সময় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পক্ষ থেকে এ উপলক্ষে একটি পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন করে। ইসলাম যে শান্তির ধর্ম এ সম্পর্কিত বিভিন্ন বই-পুস্তক এতে প্রদর্শিত হয়। এ অনুষ্ঠান উপলক্ষে আহমদীয়া যুব সংগঠনের সদস্যরা সাইকেল চালিয়ে সুদূর কাদিয়ান থেকে সভাস্থলে উপস্থিত হন ও অনুষ্ঠানটিকে সফল করার জন্য সার্বিক সহযোগিতা করেন। খ্রিষ্টান, হিন্দু, মুসলিম ও শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবৃন্দ এই আন্তঃধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদান এবং এই ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য জামা'তে আহমদীয়ার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

আফ্রিকার দেশ কেনিয়ার কিসুমু অঞ্চলে একটি নবনির্মিত আহমদীয়া মসজিদের শুভ উদ্বোধন

আল্লাহ্‌র অশেষ কৃপায় গত ২৭ মে, রোজ শুক্রবার কেনিয়ার কিসুমু (Kisumu) অঞ্চলে নবনির্মিত 'মসজিদ মসরূর' এর উদ্বোধন করা হয়। কম্বোওয়া (Kombewa), কিসুমু শহর থেকে বোন্ডো (Bondo) যাওয়ার পথে ছোট একটি জনপদ যা একটি সুন্দর গোলাকার আকৃতির সবুজে ঘেরা উপত্যকায় অবস্থিত। কম্বোওয়া একটি খ্রিষ্টান অধ্যুষিত এলাকা। এখানে ২০০০ সালে আহমদিয়াতের বাণী পৌঁছে এবং কিছু সংখ্যক লোক আহমাদীয়াত গ্রহণ করেন।

ফলক উন্মোচন, দোয়া ও জুমুআর নামাযের মাধ্যমে মসজিদের উদ্বোধন করা হয়। নামাযের পর উদ্বোধনী অধিবেশন পবিত্র কোরআন পাঠ ও সওয়াহিলি ভাষায় পঠিত নযমের মাধ্যমে আরম্ভ হয়। পকনিয়ার মাননীয় ন্যাশনাল আমীর সাহেব অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। এরপর উক্ত এলাকার ইনচার্জ মওলানা ফাহিম আহমদ লক্ষণ সাহেব মসজিদের নির্মাণ কাজের বিস্তারিত রিপোর্ট প্রদান করেন। এরপর CDF Holo এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান মিস্টার এডভীন আচোতীন সাহেব নিজের মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, 'আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি, আহমদীয়া জামা'ত দল-মত নির্বিশেষে সব মানুষের সেবা করে।

এরপর ন্যাশনাল আমীর, মোহতরম তারেক মাহমুদ জাফর সাহেব উপস্থিত অতিথিদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করেন। প্রথমে তিনি আল্লাহ্‌ প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এরপর মসজিদের নির্মাণ কাজে আর্থিক ও অন্যান্য ভাবে সহায়তা প্রদানকারী সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এছাড়া ইসলামে ইবাদতের তাৎপর্য ও গুরুত্ব, মসজিদের ভুমিকা, মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কেও তিনি আলোচনা করেন। আমীর সাহেব জামাতের সদস্যদের পাঁচবেলা মসজিদে এসে নামায পড়ার আহবান জানান। এরপর দোয়ার মাধ্যমে অধিবেশনের সমাপ্তি হয়।

অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত অতিথিদের জন্য সুস্বাদু খাবারের আয়োজন করা হয় এবং উপস্থিত সবাই ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শোনেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, হল্যান্ডের বার্ষিক জলসা সফলভাবে অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে জামা'তে আহমাদীয়া হল্যান্ড, তাদের ৩৬তম জলসা সালানা গত ৬, ৭ ও ৮ মে তারিখে নুন্সপীট শহরে জামা'তের মিশন হাউস প্রাঙ্গনে অত্যান্ত সফলতার সাথে সম্পন্ন করার তৌফিক পায়, আলহামদুলিল্লাহ।

এবছরের জলসার মূল বিষয়বস্তু ছিল "দেশের প্রতি ভালোবাসা ঈমানের অঙ্গ"। জলসার দিনগুলোতে আবহাওয়া খুবই সুন্দর ছিল। শুক্রবার হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা সরাসরি সম্প্রচার শ্রবণ, দুপুরের খাওয়া এবং নামায যোহর ও আসরের পর জামা'তের ও হল্যান্ড এর জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। উদ্বোধনী অধিবেশনে মোহতারাম ন্যাশনাল আমীর জনাব হিবাতুন নূর ফার্হাগেন সাহেব তার অত্যান্ত ঈমান উদ্দীপক ও জ্ঞানগর্ব ভাষণ প্রদান করেন।

২য় দিনের বিশেষ আকর্ষণ ছিল ডাচ মেহমানদের নিয়ে একটি অত্যন্ত সফল তাবলিগী অধিবেশন যার মূল বিষয়বস্তুও ছিল "দেশের প্রতি ভালোবাসা ঈমানের অঙ্গ"।

এ অধিবেশনের প্রধান মেহমান ছিলেন নুন্সপীট শহরের মেয়র মিস্টার ডিক ফান হেমেন যিনি এবছরই তার এই কর্মব্যস্ততা পূর্ণ দায়িত্ব থেকে অবসর নিতে যাচ্ছেন। স্থানীয় কাউন্সিল অফিস এর কাউন্সিলর, মেম্বারস ও জ্ঞানী গুণীজন সহ অনেক ডাচ মেহমান এতে উপস্থিত ছিলেন। অনেকে তাদের শুভেচ্ছা বক্তব্যও প্রদান করেন। মেহমানগণ জামা'তে আহমদীয়ার চিন্তাধারা, মানবসেবা ও বিশ্বময় শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জামা'তের বিভিন্ন কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মিডিয়া ও সংবাদপত্র গুলো ফলাও করে এই সংবাদ প্রচার করে।

ঐদিন আরো একটি তাবলিগী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় আরবী ভাষা ভাষী মেহমানদের নিয়ে যাতে আরবীতে বক্তব্য প্রদান করেন জনাব আইমান ওদে সাহেব ও জনাব খালিদ আল খার্বাচি সাহেব।

সবশেষে মেহমানদের বিভিন্ন প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করেন মিশনারি ইনচার্জ মোহতরম নায়ীম আহমদ ওয়ারায়চ সাহেব। প্রতিটি অধিবেশনের সবগুলো ভাষণ ইংরেজি, ডাচ ও আরবী ভাষায় অনুবাদের সুব্যবস্থা ছিল। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এই জলসায় আগমনকারী সমস্ত নারী-পুরুষ অনেক বরকত সাথে নিয়ে ঘরে ফিরে যান। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ঈমানকে উত্তরোত্তর আরো মজবুত ও উন্নতির পর উন্নতি দান করুন, আমিন সুম্মা আমিন।

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হুযূর (আই.)-এর বিশেষ দোয়ার তাহরীক

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) গত ২ অক্টোবর, ২০১৫ ইং, রোজ শুক্রবার লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে জুমুআর খুতবায় নিম্নোক্ত তিনটি দোয়া বেশি বেশি পড়ার প্রতি জামা'তের সকল সদস্যকে নসীহত প্রদান করেন।

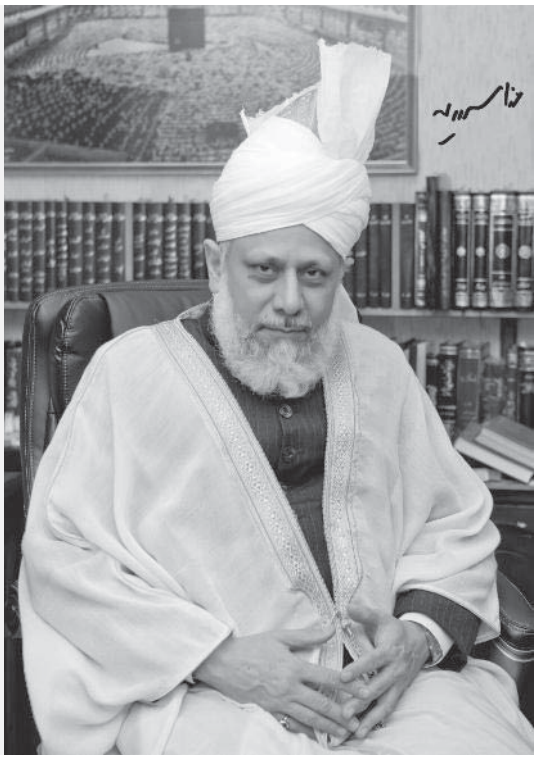

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ
رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ

"রাব্বি কুল্লু শায়ইন খাদিমুকা রাব্বি ফা'হফায্নী ওয়ানসুরনী ওয়ারহামনী।"

অর্থ : হে আল্লাহ্! সবকিছুই তোমার সেবায় নিয়োজিত। অতএব, হে আমার প্রভু! তুমি আমার নিরাপত্তা বিধান কর আর আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি দয়া কর।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ
وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

"আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম।"

অর্থ : হে আমার আল্লাহ্! আমরা তোমাকে তাদের বক্ষদেশে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ
حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۲۰۲﴾

"রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াকিনা আযাবান্নার।"

অর্থ : হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে এ দুনিয়াতে এবং পরকালে যাবতীয় মঙ্গল দান কর এবং আগুনের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর।

*** এছাড়া হুযূর (আই.) ইস্তেগফার করার প্রতিও গুরুত্বারোপ করেন।**

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ
ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

"আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি যামবিওঁ ওয়া আতূবু ইলাইহি।"

অর্থ : আমি আমার প্রভুর নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করছি।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

মানব জাতির সুরক্ষায় এক সতর্কবাণী

হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)
১৯০৬ সালে জগদ্বাসীকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে
সতর্ক করে ভবিষ্যদ্বাণী
করেছেন-

তোমরা কি এসব ভূমিকম্প এবং বিপদাবলীর কবল থেকে নিজেদের নিরাপদ ভাবছ ? কখনো না ! সেদিন সকল মানবীয় কার্যকলাপ নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে প্রচন্ড ভূমিকম্প হয়েছে আর তোমাদের এদেশ এসব থেকে নিরাপদ একথা মনে করোনা ! আমি লক্ষ্য করছি, তোমরা সম্ভবত এর চেয়ে বেশী বিপদের সম্মুখীন হবে।

হে ইউরোপ ! তুমিও নিরাপদ নও। হে এশিয়া ! তুমিও সুরক্ষিত নও। হে দ্বীপবাসীরা ! কোন কৃত্রিম খোদা তোমাদের সাহায্য করবেনা। আমি শহরগুলোকে ধ্বংস হতে দেখছি, জনপদগুলোকে জনমানবশূন্য প্রত্যক্ষ করছি।

সেই এক অদ্বিতীয় খোদা দীর্ঘকাল যাবত নীরব ছিলেন এবং তাঁর সামনে অনেক জঘন্য অন্যায় সংঘটিত হয়েছে আর তিনি নীরবে সব সহ্য করেছেন। কিন্তু এখন তিনি রুদ্রমূর্তিতে স্বরূপ প্রকাশ করবেন। যার শোনার মত কান আছে সে শুনে নিক, সে সময় দূরে নয়। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্র করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়াও অবশ্যম্ভাবী।

আমি সত্য সত্যই বলছি, এদেশের পালাও ঘনিয়ে আসছে। নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভাসবে আর লুতের দেশের ঘটনা তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করবে। তবে খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর; অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হবে। যে খোদাকে পরিত্যাগ করে, সে মানুষ নয়, কীট। যে তাঁকে ভয় করেনা, সে জীবিত নয়, মৃত।”

(হাকীকাতুল ওহী, বাংলা সংস্করণ, পৃষ্ঠা : ২১৫)

পর্দা সম্পর্কে খলীফাতুল মসীহ্-র দিক নির্দেশনা

পর্দা সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, "বোরকা সম্বন্ধে সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, বোরকা যেন জাকজমক ও আরম্বড়পূর্ণ না হয়। বোরকার কাপড় যেন এমন না হয় যা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আর এর কাপড় কাটা ও শেলাইয়ের সময় যেন লৌকিকতা অবলম্বন না করা হয়। বরং বোরকা যেন সাদামাটা কাপড় দিয়ে সাধারণভাবে শেলাই করে ঢিলে ঢালা করে তৈরী করা হয়, যাতে শরীরের গঠন বা কাঠামো গোপন থাকে। বোরকা এমনভাবে বানাতে হবে যাতে পর্দার প্রকৃত উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় এবং সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে বোরকাই যেন লৌকিকতার কারণ না হয়ে দাঁড়ায়, আর দেহের গঠন যেন প্রকাশ না পায়।"

"আমি এ খুতবার মাধ্যমে ঐ সকল লোকদের– যারা নিজেদের স্ত্রীকে বেপর্দায় রাখেন তাদের তাকিদ দিচ্ছি এবং তাদেরকে স্বীয় ইসলামের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করছি। ...মিশ্র মজলিসে মেয়েদের যাওয়া এবং পুরুষদের সামনে নিজেদের মুখ অনাবৃত করা এবং তাদের সঙ্গে হেসে-হেসে কথা বলা ...এই সমস্তই নাজায়েজ কাজ। প্রয়োজনের সময় শরিয়ত তাদের কোন-কোন কাজের স্বাধীনতাও দান করেছে।

...কোন জটিলতাই এমন নয় যে, এর প্রতিকার শরিয়তে রাখেনি। কিন্তু এত বড় পুরস্কার দেয়া সত্ত্বেও যে খোদা তা'লা মানুষের সুবিধার জন্য সর্ব প্রকারের বিধান দিয়েছেন। যদি কোন ব্যক্তি পর্দা পরিত্যাগ করে তাহলে এর অর্থ সে কুরআনের অবমাননা করে। এরূপ মানুষের সাথে আমাদের কী সম্পর্ক থাকতে পারে? আমাদের জামা'তের মহিলা ও পুরুষদের জন্য এটা ফরজ যে, তারা যেন এরূপ আহমদী পুরুষ ও আহমদী নারীদের সাথে কোন সম্পর্ক না রাখেন।" (খুতবা জুমুআ, ৬ জুন ১৯৫৮)

"হয় পর্দা করতে হবে নয়তো জামা'ত ছেড়ে চলে যেতে হবে। কেননা আমাদের জামা'তের নিয়ম, কুরআন করীমের কোন আদেশ অমান্য করা যাবে না, হোক সেটা মৌখিক অথবা কার্যত, এরই মাঝে দুনিয়ার হেদায়াত ও নিরাপত্তা নির্ভরশীল।"

পর্দা সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) বলেন- "কুরআন তাদেরকে (আহমদী মহিলাদের) এই বলে পর্দার হুকুম দিয়েছে, হয় পর্দা করতে হবে নয়তো জামা'ত ছেড়ে চলে যেতে হবে। কেননা আমাদের জামা'তের নিয়ম, কুরআন করীমের কোন আদেশ অমান্য করা যাবে না, হোক সেটা মৌখিক অথবা কার্যত, এরই মাঝে দুনিয়ার হেদায়াত ও নিরাপত্তা নির্ভরশীল।" (আল ফযল, ২৫ নভেম্বর, ১৯৭৮)

তিনি নরওয়ের রাজধানী অসলোতে এক অনুষ্ঠানে বলেন- "যে মহিলারা পর্দা করা জরুরী মনে করে না তাদের কাছে আমার প্রশ্ন তারা পর্দা ত্যাগ করে ধর্মের কি সেবা করেছে? এখন কেউ কেউ বলে থাকে আমাদেরকে এখানে পর্দা না করার অনুমতি দেওয়া হোক, এরপর তারা বলবে আমাদেরকে অর্ধ উলঙ্গ হয়ে সমুদ্রে গোসল করার ও বালুতে শুয়ে থাকার অনুমতি দেয়া হোক। আমি বলবো এরপর তারা যেন দোযখে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে, তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে শাস্তি নাযেলের পূর্বে যেন তারা নিজে নিজেই ভাল হয়ে যায়।" (পর্দা প্রগতির দিশারী)

পর্দা সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) নসিহত করে বলেন, "বোরকার মাঝেও যেন কোন সীমাতিরিক্ত ফ্যাশন না করা হয়। প্রত্যেক সভায় আহমদী বাচ্চাদের মর্যাদা সম্পর্কে অবগত করুন, আমার বেশি বড় বড় কাজের দরকার নেই, শুধু এই কথাগুলোর উপর দৃষ্টি রাখুন–নামাযের অভ্যাস, পর্দার পাবন্দী, সন্তানদের তরবিয়ত ও বেপরোয়া ফ্যাশন থেকে বাঁচা, এ সকল বিষয়ের তদারকী করবেন। আপনাদের সততা থাকা উচিত। বাইরের পরিবেশের ক্ষেত্রে সন্তানদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন।" (পাক্ষিক আহমদী, ১৫-৩১ ডিসেম্বর, ২০০৪)

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহযোগী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536
H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

New Vol. No. 78 | 24th & 1st Issue

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

15th July, 2016
Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

জলই জীবন/ WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয় :

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্বপ্রথম ফল পাবেন, (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems)- ১০ দিন, (৩) উচ্চ রক্তচাপ (Hipertension)-১ মাস, (৪) বহুমুত্র (Diabetes)-১ মাস, (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis)-৩ মাস, (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases)-৩ মাস, (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland)-৩ মাস, (৮) কর্কট রোগ (Cancer)-প্রথম থেকে রোগ ধরা পরলে ৬ মাস, (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ-১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম :

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাতঃরাশ, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমাণ জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছেমত জল পান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ হলে চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭ দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্তত: আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি রেস্তোরাঁ

ধানসিড়ি রেষ্টুরেন্ট
দোতলা
রোড নং-৪৫, প্লট-৩৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫
মোবাইল: ০১৭০০৮৩৩২৫২, ০১৯৩০২১৪২৮৪

ধানসিড়ি রেস্তোরা
অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)
(রাপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

"দিল মেঁ য়্যাহী হ্যা হার্‌দাম তেরা সাহীফা চুমুঁ
কুরআঁ কে গিরদ্‌ ঘুমুঁ কা'বা মেরা য়্যাহী হ্যা"

আমার আন্তরিক বাসনা হলো, সর্বদা যেন তোমার কিতাব চুম্বন করি আর কুরআনের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করি; বস্তুত আমার কা'বা এটাই।

–হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.)

mta INTERNATIONAL

এমটিএ দেখুন
অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
০১৭১৬-২৫৩২১৬

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময় সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com